অনেক রক্ত অনেক নাম

ANEK RAKTA ANEK NAM 20·00

by

Priyaranjan Dasmunshi

Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street

Calcutta-700073

অনেক রক্ত অনেক নাম

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—জানুয়ারী, ১৯৫৯
—পৌষ, ১৩৬৬

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—এপ্রিল, ১৯৬০
—বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী :
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর :
শ্রীমণীন্দ্র নাথ মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ২০ টাকা

উৎসর্গ

আমার মা

শ্রীযুক্তা রেণুকণা দাসমুন্সী

আমায় জুগিয়েছেন প্রেরণা,

দিয়েছেন উৎসাহ, এনেছেন

রাজনীতিতে—

তাঁকেই দিলাম।

কৃতজ্ঞতা

প্রসাদের কর্ণধার প্রণব বসুর তাগাদায় ধারাবাহিক লেখা, অজয় বিশ্বাসের উৎসাহ, আর বাড়ির রাণু, ঝণ্টুর অক্লান্ত পরিশ্রমে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে।

এই লেখকের আরেকখানি উপন্যাস

টেক ওভার

কবিতার বই : ভোরের সানাই

ভূমিকা

'অনেক রক্ত অনেক নাম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়েছিল মাসিক প্রসাদ পত্রিকায়।

স্বীকার করতে বাধা নেই যে, প্রথম দু-একটি সংখ্যা ততটা আগ্রহ সহকারে আমি পড়িনি। কারণ, লেখক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী সারাদেশে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ সর্বজনবিদিত। স্বভাবতই মনে হয়েছিল,—হয়তো লেখনীর মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে দলীয় প্রচারকার্য করাটাই তাঁর সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। বেশ মনে আছে, পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলাম সেদিন। এ যে এক নতুন প্রিয়রঞ্জন, যিনি রাজনীতির জটিল আবর্তে বাস করেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

তখন থেকে সাগ্রহে দিন গুণতাম,—কবে আমার হাতে আসবে পরবর্তী সংখ্যাটি। মনে মনে ভয়ও ছিল কিছুটা। সারাদেশে তখন জরুরী অবস্থা চলছে। লেখক এবং লেখনী দুইই তখন স্তব্ধ। মাঝপথে আবার বন্ধ হয়ে যাবে নাতো প্রিয়রঞ্জনের এই অপ্রিয় স্বীকারোক্তি? তা অবশ্য হয়নি, তবে একথা কে না জানে যে, এই স্পষ্ট ভাষণের জন্য সেদিন কতখানি মূল্য দিতে হয়েছিল প্রিয়রঞ্জনকে।

এ এক অসাধ্য সাধন বললেও চলে। কারণ, দলীয় প্রভাব এড়ান খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায় হোক, কিছু না কিছু দলীয় ছাপ লেখনীর মধ্যে আসবেই। এইখানেই প্রিয়রঞ্জন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তাই সত্তর দশকের সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ে নকশাল, সি. পি. এম. বা অন্যান্য দলগুলির মধ্যে কে কতটা ভুল করেছে, সেটাই বড় হয়ে দেখা দেয়নি তাঁর কাছে, সেই সঙ্গে 'আমরা কোথায় ভুল করেছি' সেটাও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন দেশবাসীর কাছে। শুধুমাত্র অন্যকে আসামীর কাঠগড়ায় না তুলে নিজে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে ভাবে তিনি আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, এমন প্রশংসনীয় নজীর সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না আজকের দিনে।

আগামীদিনের মানুষের কাছে প্রিয়রঞ্জনের 'অনেক রক্ত অনেক নাম' সত্তর দশকের অস্থিরতার একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি।

২১বি, ফার্ণ রোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীশৈলেশ দে

ভূমিকা

হায়রে আমার বাঙলা দেশ। সাধক কবির গান থেকে সংগ্রামের পদধ্বনিতে কুলু কুলু স্রোতস্বিনী হয়েছে আরও উতলা, বাতাস উদাস, কিন্তু পাথর চাপা কান্নার মত সহস্র সহস্র নাম কিভাবে যে উজাড় হয়ে গেল, ফুরিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুর মত পথে ঘাটে জ্ঞানে অজ্ঞানে শেষ হয়েছে যে কত তার কোন খাতা নেই। বঙ্গভঙ্গের অনেক আগেই যার শুরু সত্তরের দশকেও তার বিরাম নেই। এত যৌবন পৃথিবীর আর কোন প্রান্তে এতদিন ধরে উৎসর্গ হয়েছে কিনা জানিনা। যে জানে তার স্মৃতি হাজার বছরের বেদনায় নিশ্চয়ই ভারাক্রান্ত। "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা রবে" এই কবি কথন ত জীবনের স্বাভাবিক ভাবকেই তুলে ধরে, কিন্তু "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" এই আকুতি কি সম্পূর্ণ নিরর্থক? ইদানিংকালে একটা সুন্দর শ্লোগানে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত একসঙ্গে হারিয়ে যাওয়া জীবনের হতাশার গ্লানি ভুলে থাকতে মাঝে মাঝে নেচে ওঠে। শ্লোগানটির একটা মাদকতা আছে। মদ যেমন কোন বিশেষ জাতের জন্য সীমাবদ্ধ নয়—যে কোন মানুষকে সাময়িক ভাবে ভুলিয়ে রাখতে সমানে কাজ করে যায় এবং মাতাল করে তোলে তেমনি এই শ্লোগানটা। এর মানে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, দলমত নির্বিশেষে একটা কেমন ঝাঁকুনি দিয়ে যায়।

"এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।"—তার পরের যে কথাটা সেটা আর কোনকালেও করা হবে না বলেই লড়াই-এ জেতা হলো না সেটা ছিল "লড়তে গেলে ঐক্য চাই—জোট বাঁধো তৈরী হও।"

জব চার্নকের কোলকাতায় রক্ত ঝরেছে কোম্পানীর আঙ্গিনায়। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীর দুই তীরে রক্ত ঝরেছে জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপে, কুঠিবাড়ির চৌহদ্দীতে।

পলাশীর আম্রকাননে মীরমদনের রক্ত থেকে ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডের রক্তে একশ বছরের যজ্ঞাহুতি পূর্ণ হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত শেষে সাধনার মঙ্গলঘট রক্ত দিয়ে ভরতে।

তারপর ডাইনে বাঁয়ে পালকি চলে দুলকি চালের মত আমাদের সমাজটি হিন্দু-মুসলমানের খাতির আর ঝগড়ার নিত্যনৈমিত্তিক গাজনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজকে বুঝে এবং ইংরেজের পদলেহন করে দু' কায়দায় দু'দিক থেকে রক্ত দিতে ও

নিতে একাধিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে রক্ত দেবার ইতিহাসটা স্বাধীনতার সাহিত্য। রক্ত নেবারটা নাকি আভিজাত্য আর সামাজিক মর্যাদার বংশ গৌরবের কৌলিন্য হয়ে রায়বাহাদুর খানবাহাদুর সাইজের বিলিতি বেলোয়াড়ী ঝাড়ের কাহিনী। বাইজীবাড়ির পেয়ালার আওয়াজ হয়ে মালিক আর অত্যাচারী জমিদারদের চোরাকুঠরী, বাগানবাড়িতে এখনো আটকে আছে সে ব্যথা। খুঁজে পেতে যারা দু' একটু করে উদ্ধার করে সেগুলোকে আবার পালিশ দিয়ে রংমশালের বাহারে সাজিয়ে জামদানি জড়িয়ে ঠাট বজায় রাখা কাহিনী বানিয়ে বিংশ শতকের রঙ্গমঞ্চে আর পর্দায় উপজীব্য করে তোলে বাণিজ্যিক স্বার্থে। আসল কথা তো বিচার। সবাই বিচার চায়। আমরা বিচার চেয়েছিলাম মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে। মহারানীদের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার কায়দা অনুযায়ী বিচার চেয়েছিল মোগল দরবারে।

বিচারের প্রথা আর চাইবার নমুনার ফারাকে এক এক রকম ভাবে রক্ত ঝরেছে এক এক দশকে।

সুবে বাংলায় ঘোড়া ছুটিয়ে বর্গী এসেছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের কামানের সামনে রক্ত দিয়েছি, আবার জন্মেছি পলাশীতে রক্ত দিয়েছি, আবার জন্মেছি। নীলকরের বিরুদ্ধে রক্ত দিয়েছি। ইংরেজের সৃষ্ট মন্বন্তরে শকুনের খাদ্য হয়েছি, আবার জন্মেছি।

দাঙ্গায় ঢাকা-কোলকাতা লাল করেছি—রক্ত দিয়ে, আবার জন্মেছি। সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে বিয়াল্লিশের বিপ্লবে রক্ত দিয়েছি—আবার জন্মেছি। স্বাধীনতার পরও তেভাগা আন্দোলনে রক্ত দিয়েছি—আবার জন্মেছি। এবং আবার রক্ত ঝরছে, অথচ কোলকাতার ফুটপাত থেকে শুরু করে চাষা বৌ-এর আঁতুরে আবার জন্মাব। যারা শাক্ত তারা বলি এত রক্তেও মা প্রসন্ন হল না কেন? তবে কি জবার রং এর থেকেও লাল? রাজনীতিকরা বলি—এত রক্ত কি কোন বিপ্লব দেখেছে? তবুও বিপ্লব হলো না কেন? গণতন্ত্রের বনেদী বাড়ির গিন্নী মুখে পান সাজিয়ে হাসছে আর হাসছে—মাঝে মধ্যে লাল ঠোঁট আয়নায় দেখছে, রক্তের মত পিক্ মাটিতে ফেলছে আর বলছে, এ সব আমার ঠোঁট লাল রাখতে দরকার। এবং আমরা তার যোগান দিয়েই চলেছি। আমরা ছিন্নমূল, ছন্নছাড়া, নিপীড়িত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত এবং বঙ্গ সন্তানের স্রোত এই রক্তের হোলিতে আমাদের সবকিছু এত ভিজিয়েছি যে সাদা রং-এর একটা জামা নেই আমাদের যে প্রায়শ্চিত্তের দিন পড়ব।

দলের ছাপ আলাদা করে হলেও বোমা আর বন্দুকে সেই রক্তই ঝরছে।

পলাশীর আম্রকাননের স্রোত থেকে সিপাহী বিদ্রোহ—তার থেকে স্বাধীনতা হয়ে গেছে রক্তনদীর ধারায়। ভাগীরথী মুর্শিদাবাদে গতি পরিবর্তন করেছে, আদি গঙ্গা মজে গেছে কিন্তু আমাদের রক্তঝরা সকালের বিরাম নেই—চলছেই —ভাইয়ের রক্তে ভাই, বোনের রক্তে বোন, সন্তানের রক্তে মা আমরা নিজেদের রাঙ্গিয়েই চলেছি।

"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।" পণ্ডিত মশাই শৈশবে গ্রামের স্কুলের আমতলায় এই পাঠ দিয়েছিল। এখন গরু ছাগলের পালের মত ঠাসা ছোট কামরায় কিলবিল করা দলে অধ্যয়ন ত দূরের কথা অধঃপতনের চেষ্টায় উন্মত্ত আগ্রহে আমরা। এবং সেটাই তপস্যা।"

অনেক মাষ্টারের এখন মাষ্টারনীর আর তার কাচ্চা-বাচ্চার যোগান চালু রাখতে ডজনখানেক ট্যুইশানি আর নোটবুক সাপ্লাই-এর কারখানায় শ্রমিক হয়ে কাজ করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। বলতে গেলেই সাবিক কারণ দেখিয়ে সেই এক গেলাস শ্লোগানে চুমুক দিয়ে বলব—'এ লড়াই বাঁচার লড়াই—এ লড়াই জিততে হবে'।

তার পর গান্ধীবাদীর জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য মন্ত্রীর সুপারিশে চৌরঙ্গীর সবচেয়ে বড় মদের দোকান এবং রাত্রে নিষিদ্ধ কারবার, মার্কসবাদীর কন্যার নামে ফারপোর শেয়ার আর বেনামীতে তিনখানা বাড়ি এবং নকশালবাদীর অকস্মাৎ লাটসাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে মুচলেকায় সই করে নূতন যাত্রীর ইতিহাসের জীবন্ত উদাহরণগুলো আদৌ আমাদের বিচলিত করে না—কারণ সাংবাদিক, ভাষ্যকার ও বুদ্ধিজীবিরা আমাদের জানিয়ে যায় ওরা পথভ্রষ্ট বা শোধনবাদী। আমরা 'গ্যাস' খেয়ে নিজেদের প্রচণ্ড খাঁটি ভেবে আবার বারুদ, পাইপগান আর বোমার জন্য তৈরী হই। অথচ তার পরেও সেই সব পথভ্রষ্টদের সঙ্গে মাখামাখি। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আমাদের সেই সব ইডিয়ট মার্কা নেতাদের মহাসহাবস্থান চলে। আমরা তা ঢোক গিলে মেনে নিয়ে একটু আধটু 'ডিসিডেন্ট' পলিটিক্সের আনন্দে সবটাই এ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি। একেবারে যখন রাজনৈতিক পতিতা হয়ে যাই তখন তার আগে একটা প্রগতিশীল শব্দ জুড়ে "প্রগ্রেসিভ পতিতা" হয়ে থাকি। তাহলে জিনিসটা যা দাঁড়াবে তাতে গণতন্ত্রের বৌঠানের ফরমায়েসী চাকর হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। গ্রামের মানুষের গায়ে জামা ওঠে না, বাচ্চার চিকিৎসার ওষুধ নেই, বাপটা ক্যান্সারে বিনা চিকিৎসায় মরে, ছোট ভাইকে পড়াতে না পেরে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করাই, কাজের লোককে ঝি বা চাকর বলি, মালিকের দালালি করা ট্রেড

ইউনিয়নে শ্রমিক নেতা হই, রবীন্দ্রনাথের নামে নজরুলের নামে ব্যবসা ফাঁদি, গান্ধীর নামে শপথ নিয়ে পিঁপে পিঁপে হুইস্কি দিয়ে ভোজসভার কারবার সারি। তার পরেও আমাদের কাকদ্বীপের কৃষকের রক্ত থেকে সাঁইবাড়ির রক্ত নিয়ে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, নকশাল, পুলিশ, কৃষক, শ্রমিক থেকে, হরিজনের 'দাঙ্গার' রক্ত নিয়ে আল্পনা দিয়েই চলছি একের পর এক, আর বৌঠান হাসছে আর পিক ফেলছে।

বাংলার কত গেল? ধন সম্পদের কথা বলছি না—সে তো আমাদের কিছুই নেই—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে এখন দেশীয় নর্থ ইণ্ডিয়া, সাউথ ইণ্ডিয়া আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এমন জাঁকিয়ে বসেছে যে আমরা নিছক ভারতীয় এই ট্যাবলেটের জোরে দাসত্বকে মরদের সম্মান বলে মেনে নিয়েছি, কিন্তু রক্ত? কত রক্ত গেল? দেশের যতগুলো ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত জমা আছে তার দশগুণ রক্ত চলে গেছে আমাদের নিজেদের গণতন্ত্রের এই চড়ুইভাতির খেলায়। না হয় আমরা রক্তহীন হলাম কিন্তু আমরা যেন নির্বীর্য না হই। এটাই বোধহয় আমাদের শেষ অহংকার। তাই গাঙ্গেয় পশ্চিমবাঙলায় বাঙলাদেশের কোল ঘেঁষে যারা শেষ নিদ্রায় রক্ত দেবার পর, তাদেরকে আমার প্রণাম। তোমরা যে দলেরই হও না কেন—তোমরা যত ভুলই কর না কেন—তোমরা যে আমাদের। আমাদেরই একান্ত নিজের আঙ্গিনার ফুল। পাপ যা করেছি প্রায়শ্চিত্ত করব তার জন্য,—পুণ্য যা করেছি ফসল হোক তার সারা বাংলায়।

কিন্তু অন্যায় আর অত্যাচারে আমরা যেন নির্বীর্য না হই—এর থেকে বেশী আর কোন প্রার্থনা নেই।

বাংলার অপরাহত যৌবনকে

হাজার সেলাম।

-লেখক

"পূর্বাভাষ"

বাষট্টির শীত বাঙলায় এসেছে অনেক দেরীতে। সে প্রায় ডিসেম্বরে। কিন্তু তার আগেই সেই যে বমডিলার কাছে প্রচণ্ড উত্তরের হাওয়ায় বরফের থেকেও বেশী শীতের ছোঁয়াচ তা একেবারে শেষ করে দিয়েছে ভারতীয় জওয়ানদের সামর্থ্য। তবুও লড়তে হবে। কেননা আজাদ হিন্দুস্থানের আজাদীকে রাখতে, হিমঘরে চালান করে দেওয়া দেশনেতাদের মগজগুলোকে ঠিক গরম করতে এখন আমেরিকা, রাশিয়ার হিটারের সেঁক লাগবে। তা না হলে শান্তির বুলি আউড়ে বোষ্টমের আখড়া সাজিয়ে ঘরের দরজায় কালকেউটেকে রেখে যারা দেশ শাসন করার দায়িত্ব নিলেন তাদের ঈশ্বর দর্শন না হলেও এই প্রচণ্ড শীতে নাথুলা, স্নুয়েনখিরি, বমডিলা, লাদাখ সর্বত্র এখন ভারতীয় জওয়ানদের পরলোক দর্শন করতে হবে অসময়ে এবং রক্ত দিয়ে সাদা বরফ লাল করে দিয়ে। সেজন্যেই বরফগুলো সব টকটকে দামী লাল পাথরের মত। জওয়ান কর্তার সিং থেকে সুবেদার মেজর চিমন লামা আর কর্ণেল দাসগুপ্ত সবারই পরলোক দর্শন হয়েছে। প্রয়াত আত্মারা স্বর্গসুখে আছে না হিমালয়ের এখানে ওখানে সেদিনের নেহেরু মন্ত্রীসভাকে অভিশাপ দিয়ে চলছে জানিনা।

এত রক্তের পর তিনমূর্তির রক্ত গোলাপ অস্থির। তাই বোধ হয় সেই যন্ত্রণায় অসময়ে তাকেও যেতে হলো। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের পর সেই যে তিনি হঠাৎ থামতে শুরু করলেন তারপর আস্তে আস্তে একদিন সব শেষ।

নেহেরু সামিয়ানার নীচে এলাহাবাদের সঙ্গমে স্নান করা পুণ্যার্থীর মত আর এক জাতক ভারতীয় সভ্যতার একটা ছোট্ট মডেলের মত ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন লালবাহাদুর। বাষট্টিতে চোট খেয়েছি। দেশের অর্থনীতিতে সে চোট বড় মারাত্মক। প্রশাসনের সংহিতায় এল ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল। সংবিধানের ইমারজেন্সীর ধারাকে এনে বসান হল নিজেদে. ব্যর্থতাকে চাপা দিতে।

লাল ফ্ল্যাগ দেখলেই দেশদ্রোহী এই একমাত্র আন্দোলনের ধ্বনিকে পুঁজি করে দিল্লীর হাইকম্যাণ্ড থেকে কোলকাতার কংগ্রেস ভবনের 'মাইকম্যাণ্ড' (মানে আমি যা বলব তাই শোনা)-এর দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব কংগ্রেসকে দেশ-প্রেমের একচেটিয়া কারবারীর দায়িত্ব নিতে বলে, যাকে তাকে জেলে পুরতে লাগলেন। কংগ্রেসের আত্মা কাঁদলেন কিনা খোঁজ নেবার সময় নেই। কেননা তখন বমডিলাতে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং তেজপুর অবধি পালিয়ে এসেও নিজের অপদার্থতাকে ঢেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সারবত্তা প্রমাণের

জন্য হাইকম্যাণ্ড থেকে মাইকম্যাণ্ড ব্যস্ত। বলতে গেলে দেশের অনেক রাজ্যের গণতন্ত্রে বিরোধী বলতে যারা বামমার্গী তাদের তখন বনবাস আর নিশ্চিন্তে দেশপ্রেমের ঠিকাদারীর কাজে তাবৎ কংগ্রেস লেগে গেছে। কে জানত যে এই আন্দোলনই এককালে কংগ্রেসের ঘরের সবচেয়ে বড় অপসংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলার বামপন্থা ও বামপন্থীরা তখনও দ্বিধাগ্রস্ত, অস্থির, নির্বাক, মূক মুখে কেউ বা এই দাপট থেকে বাঁচতে চীনকে দায়ী করে রেহাই পেলেন—কেউবা দায়ী করা উচিত কিনা তার গবেষণার নামে রাজনীতির সবচেয়ে পচা ও বাসি মাংসের দোকানের খদ্দেরের মত মধ্য পন্থী হয়ে গেলেন। একযুগ পরে অনেক গরমমশলাতেও সেই পচা গন্ধ ঢাকা যায় নি।

পঁয়ষট্টির আঘাত আরও নির্মম হলেও জবাব হ'লো আরো প্রচণ্ড। টের পেল আয়ুবশাহীর শাহাজাদারা যে লালবাহাদুরের তূণে কত তীর জমা পড়েছে এই তিন বছরে। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা হলেও তীরন্দাজকে বাঁচাতে পারিনি। আর এত শীতের প্রত্যূষে, ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর আত্মাকে তাসখন্দের মিনারে রেখে এসেছি।

বাষট্টির লজ্জা আর পঁয়ষট্টির গৌরবের ফাঁকে দেশের রাজনীতি, পরিকল্পনা সবটাই যেন উল্টেপাল্টে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল।

হাইকম্যাণ্ড আর মাইকম্যাণ্ডের স্বদেশী করা গান্ধী নেহেরুর সংগ্রামের "আই উইটনেস" সমূহের—আত্মম্ভরিতার সীমা ছাড়িয়ে গেল। দেশবাসী চিন্তা নাই—সুখোনিদ্রা যাও" এই গান আওড়াতে গিয়ে দিন কাটালেন রাত কাটালেন। ততক্ষণে বিক্ষোভের ফৌজ প্লান হলিডের স্তূপ ভেদ করে ঘরের কাছে এসে গেছে।

জেলের ভেতরে জেলের বাইরে তখন ধিক্কৃত ও নিন্দিতরা বন্দিত হবার সুযোগ খুঁজছে। কেননা বাইরে ক্ষোভ জমছে। যখন সুবেবাংলায় বারুদ জমছে খাদ্যের অভাবে—তখন রাইটার্সের ফাইলবন্দী ডি-আই-আর-এর হোমসিক্রেটের কাগজগুলো সবচেয়ে বেশী নাড়াচাড়া করা হলেও "জমি যার লাঙ্গল তার" এবং কংগ্রেসী সমাজবাদ দূর অস্ত হতে লাগল। প্রায়রিটির গোলমাল হয়ে গেল।

দীঘার সৈকতে ঝাউবিথীতে, বাঁকুড়ার ঝিলিমিলিতে, দুর্গাপুরের কংগ্রেসে, আরামবাগের মায়াপুরে তখনও ভাঙ্গনের জয়গান পৌঁছায়নি।

সাতষট্টির নির্বাচনের আগেই আকাশ জুড়ে মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি নেই শুধুই গুমোট, এ মেঘ নিদাঘের লাল মেঘ।

জুলাইয়ের কোলকাতা !

উনিশশ ছেষট্টি। বেশ তাতানো, পিচ গলা গরম। কোনো কোনো দিন এ সময়ে বৃষ্টিও হয় ভীষণ জল ঝড় নিয়ে। ময়দানে উত্তেজনা চরমে ওঠে এই সীজনে, দুপুর বেলা থেকেই।

ইস্টবেঙ্গল, না মোহনবাগান ? মাউন্ট পুলিশের মহড়া, আর তাকে পাল্লা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার মত গেরিলা কায়দায় লাইন ভেঙ্গে অথবা লাইন থেকে কাউকে আউট করে দিয়ে টিকেট নেবার লড়াই, সেই সকাল থেকে। রেইন কোট পেতে রুটি চিবোচ্ছে কেউ কেউ মাঠের ভেতরে।

সিনেমা হলগুলোও বাদ যায় না। লাইট হাউসে ভীষণ বড় লাইন পড়েছে ! একটা মারামারি বা সেক্সের ছবি হচ্ছে। বাইরে বিরাট একটা ফলের দোকানের ছাদে সোফিয়া লোরেনের ছবি আঁকা বিরাট হোর্ডিং ঝুলছে। হাতে রিভলবার, পায়ে মোজা।

অনেকেই ডাবের খোলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাবাগোবার মত একটু বেশী তন্ময় হয়েই সিনেমার হোর্ডিং দেখছে। এদের বোধ হয় কোনো কাজ নেই অথবা কাজের কোনো দরকার নেই। মাঝে মাঝে গাড়ির হর্নে চমকে উঠে সরে দাঁড়াচ্ছে, আবার দেখছে। কয়েকজন মাঝারী বয়সী লোকও এসে দাঁড়াল। আশে পাশে দেখে নিল পাড়ার কেউ আছে কিনা। একটা বাজে অঙ্গভঙ্গী করা রিভলবার হাতে মোজা পরা সোফিয়া লোরেনের ছবি। বেচারারা কেউই ভাল করে শান্তিতে দেখতেই পেল না। অথচ বিনি পয়সায় কোলকাতার এইটুকু মজা মন্দ নয়।

মিছিল আসছে আবার এদিকে।

সোফিয়া লোরেনের হোর্ডিং-এর পাশ দিয়ে মিছিল যাবে। প্রচণ্ড চিৎকার আর শ্লোগানের কোরাস ভেসে আসছে। সাজানো মিছিল। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। শ্লোগান শুনে মনে হলো বেশী তৈরী এরা। আওয়াজগুলো যেন চৌরঙ্গীর দোকানগুলোর দরজা ভেঙে আসছে।

লাল লাল ফ্ল্যাগ। কারো হাতে আবার ফ্ল্যাগ নেই। ছোটো খাটো ফেস্টুন। দরজায় আঁটা কয়েকটা ফেস্টুনে লেখা আছে কিছু। একটু কায়দার পোষ্টারী লেখা। এত দ্রুত মিছিল যাচ্ছে যে পুরোটা ঠিকমত পড়া যাচ্ছে না। লিণ্ডসের সামনে মিছিলটা আসতেই বোঝা গেল কয়েকটা লেখা। মিছিলটা ধর্মতলা দিয়ে মোড় নিয়েছে। পুরোভাগে। অরবিন্দ সেন। পাক্কা মার্কসিস্ট। যাদবপুর ইউনিভারসিটির খুব নামকরা ছাত্র। তিন তিনবার ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছে সারা বাঙলায়। অরবিন্দকে চেনে ছাত্রমহলে সবাই। নিজের বাড়ির লোকের সঙ্গেও বনিবনা নেই। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছে অনেকদিন। সম্ভবত কলেজ স্ট্রীটের দিকে মিছিল যাবে। পিছনে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি। মিছিলের গতি দ্রুত হবার কারণ যথেষ্ট। রোদে তেতে গলে গেছে পিচগুলো। ছেঁড়া চপ্পল পায়ে কেউ, কারো পায়ে জুতোই নেই। দেখতে গরীব। স্কুলের ছেলে বোধহয়। তাদের পক্ষে এই রোদ সইতে পারা মুশকিল। পায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। এত গরম।

মিছিলটা তাই কিছুটা হাঁটা, কিছুটা দৌড় এ রকম অবস্থাতেই চলছে অনেকক্ষণ ধরে। সাইকেলে চড়া কয়েকজন ভলান্টিয়ার কাম্ হাফনেতা মাঝে মাঝেই ছুটে আসছে। মিছিলের ভেতরে ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে মিছিলের ভেতর দিয়ে, বাইরে দিয়ে, কিছু কর্মীকে লাইন ঠিক রাখতে নির্দেশ দিতে ব্যস্ত এরা। এদের মধ্যে কার কি পদমর্যাদা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ সাইকেল আরোহী স্বেচ্ছাসেবকদের যে খুব মানা হচ্ছে তেমন মনে হচ্ছে না। মিছিল থেকেই দু-একজন টিপ্পনি কাটছে এদের।

সাইকেল থেকে নামুন দাদা, একটু কষ্ট করে চলুন না পায়ে হেঁটে। শুধু মাতব্বরি। একটু ধরণীতে চরণ ঠেকান দাদা। টিপ্পনি শুনে সাইকেল ঘুরিয়ে মাতব্বর গোছের কয়েকজন সামনে এগিয়ে গেল রাস্তার ধার ঘেঁষে। লজ্জা পেয়েছে বেশ। সামনে থেকে থেকেই জটলা হচ্ছে কখনও কখনও। কারণ ফটোগ্রাফার ঝুঁকছে। ফটোগ্রাফার দেখে অনেকেরই তাল ঠিক থাকছে না। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবী পায়জামা পরা অনেকদিন স্নান না করা গোছের ব্যাগ ঝোলানো দু-একজন নেতা একটু ইংরেজিতেই আর্তনাদ করে উঠলেন—বি ডিসিপ্লিনড্—হচ্ছেটা কি এ সব। সব লাইনে আসুন।

অরবিন্দ এসব ভ্রূক্ষেপেও আনছে না। নির্বিকার চলছে পায়ে পায়ে শ্লোগান দিয়ে। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে অরবিন্দ। দু বছর জেলে ছিল। একটু বিস্ময় দিয়েই দেখছে কোলকাতাকে। দু-এক জায়গায় তৃষ্ণার্ত কয়েকজন

মিছিল থেকে সরে এসে ফুটপাতে লুকিয়ে বা পালাবার মতো করে একটু জনগনের সঙ্গে মিশে যাবার কায়দায় কোকো-কোলা বা লজেন্সের দোকানে দাঁড়িয়ে পড়ল তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। মিছিল ছেড়ে কয়েকজন লিণ্ডসে স্ট্রীটের গোল ট্রাফিক লাইটের কাছ থেকে বাঁ দিকে কেটে ময়দানে যাচ্ছে খেলা দেখতে। কেউবা ডান দিকে কেটে সাহেব পাড়ার সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে চলে গেল। এটা দক্ষিণের মিছিল। এ ধরণের ফালতুরা কেটে পড়লেও মিছিলের আকার ও গতি প্রচণ্ড। মোটামুটি বড় মিছিল। কোলকাতার রাজপথে একটা টগবগ করা গরম ফুটন্ত জলের মতো শ্লোগানের ধ্বনিগুলো বেরিয়ে আসছে যেন রাস্তার ধারে, দোকানের দুপাশে দাঁড়িয়ে অনেকেই দেখছে। থেমে থাকা বাসগুলো থেকে কেউ কেউ উঁকি দিচ্ছে। দেখছে কেউ ভক্তিতে, কেউ ভয়ে, কেউ বিস্ময়ে, কেউ আনন্দে। কয়েকটা দোকানদার দোকানের ঝাঁপ অর্ধেক বন্ধ করে দিল।

মিছিল নগরী কোলকাতায় মে থেকে সেপ্টেমবর—মানে মহালয়ার আগে পর্যন্ত আন্দোলনের সময়টাও লীগ বা শীল্ডের ফুটবল চার্টের মতই হয়ে গেছে। আই-এফ-এ শীল্ড শেষ হবার মুখে মুখেই কোলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলন সাময়িক স্থগিত বা পুরো বন্ধ হয়ে যায়। কোনো দলেরই পুজোর বাজারে আন্দোলনের কোনো ঝুঁকি নেয় না। কি লাল, কি সাদা, কি সবুজ অথবা গেরুয়া।

অরবিন্দ গত পরশু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে সেই যে ওকে ডি-আই-আর-এ ধরা হয়েছিল আর এই গত পরশু ছাড়া পেল। শুধু অরবিন্দ না, আরও অনেকে। তবে সব রাজনৈতিক নেতারা এখনও ছাড়া পায়নি। বড় নেতারা প্রায় সবাই এখন জেলে। অরবিন্দর চেহারা একটু খারাপ হয়েছে। বড্ড রোগা হয়ে গেছে। দাড়িটা ছিল না আগে। হয়তো জেলে না কামিয়ে বড় হয়ে গেছে। অরবিন্দকে ভালবাসে সবাই। শত্রু মিত্র দুপক্ষেই ওর পরিচিতি অরবিন্দদা বলে। ফাইনাল দেবে এবার অরবিন্দ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। আগের পরীক্ষাগুলো জেলে থেকেই পুলিশের পাহারায় এসে দিয়ে যেত।

অরবিন্দ মিছিল নিয়ে কলেজ স্ট্রীট চলে এল।

এই গরমে একটার পর একটা মিছিল এসে জমা হচ্ছে গোলদীঘির ভেতরে প্রায় কলেজ স্কোয়ারের চারিদিকে। ইউনিভারসিটির ভেতর জমতে পারছে না। ইউনিভিরসিটির সামনের দিকে কলেজ স্ট্রীটের গেট ও পিছনে বেকার

ল্যাবরেটরীর দিকে মুখ করা কলুটোলার গেটও বন্ধ। শতবার্ষিকী ভবনের সামনের দিকটাতে ছোট্ট ত্রিপল টাঙিয়ে ডজন দুয়েক যুবক বোধ হয় কোনো একটা কিছুর দাবীতে সত্যাগ্রহ করছে। একটু কাছে যেতেই দেখা গেল ইউনিভার্সিটি খোলার দাবীতে অনশন চলছে। কতকগুলো ফেস্টুন ও পোষ্টার লটকে দেয়া রেলিঙের সামনে। শতবার্ষিকী ভবন পুরো এখনও তৈরী হয় নি। মিস্ত্রীদের কাজ চলছে। তাই খুট খাট আওয়াজ আসছে। শুধু সামনের দিকটায় একটু রঙ করে কাঁচ লাগিয়ে বিল্ডিংয়ের মেইন মডেলের মুখটা সাজিয়েছে। সত্যাগ্রহীরা সেখানেই বসে। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। সবগুলো কাগজেই আজ বড় বড় করে ছেপেছে এ কথা। এর আগে দুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে। তাই বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে এ খবর সব কাগজেই। এ ধরনের টেনশন এর আগে হয় নি।

একটু এগিয়ে প্রেসিডেন্সীর গেটের একটু ভেতরের দিকে আবার একদল বসে। তারাও জনা পঞ্চাশেক মাঝে মাঝে শ্লোগান দিয়ে উঠছে। সেখানেও কিছু ফেস্টুন ও পোষ্টার। প্রতিবাদের বেশ কড়া ভাষার ব্যবহার হয়েছে পোষ্টারগুলোতে। পাশাপাশি দুদল সত্যাগ্রহীর সমর্থকরা আছে এপাশে ওপাশে। প্রেসিডেন্সীর সামনে প্ল্যাকার্ড ঝুলছে। 'কলেজ থেকে ছাত্র বহিষ্কার চলবে না'। 'বহিস্কৃত ছাত্রদের ফিরিয়ে নাও,' 'নৈলে জবাব পেতে তৈরী হও।' এই ধরনের আরও কত কি। আসলে কি একটা কারণে সম্ভবতঃ প্রিন্সিপাল তিন চার জনকে বহিষ্কৃত করেছেন। অনেকগুলো বড় বড় কলেজ ইউনিয়ন বহিস্কৃত ছাত্রদের ফিরিয়ে নেবার দাবীতে বিবৃতি দিয়েছে। ইউনিভারসিটি লনে বেশ তিন চার দিন ধরে বড় বড় সভা হয়েছে। গত পরশু প্রায় সব ছাত্র ইউনিয়নই সভা করেছে এদের ফিরিয়ে নেবার দাবীতে। কিছু হয় নি। হবার মধ্যে প্রতিবাদের চোটে শেষ পর্যন্ত ভাঙচুর হয়েছে দ্বারভাঙা হলের কিছু জানলা, সিনেটের মিটিং তোলপাড় করেছে ছাত্ররা মিটিং-এর মধ্যে ঢুকে। তারপরেই ইউনিভারসিটি বন্ধ। মিছিলগুলো কিন্তু আসছেই। কেউ এসে দিলখুসার সামনে জমেছে। কেউ বা বসন্ত কেবিনের সামনে। কেউ কেউ মির্জাপুরে ওয়ার্কাস পার্টি অফিসের সামনে জমছে। ওদিকে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দিক থেকেও বড় বড় শোভাযাত্রা আসছে। সব মিছিলগুলোই যেন ঘুরে ঘুরে সেন্টিনারি বিল্ডিংসের দিকেই আসছে—যেখানে আর একদল অনশন করছে। এরা বোধ হয় একটু সরকার পক্ষীয় বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে।

অনেক পুলিশ ছেয়ে ফেলেছে। শতবার্ষিকী ভবনের সামনেটাও ঘিরে ফেলেছে। কতটা ভবন রক্ষার জন্য তা বোঝা না গেলও এরা যে চব্বিশজন যুবকের প্রাণ রক্ষার জন্য বেশী উদ্‌গ্রীব সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। এত পুলিশ ঘিরে থাকায় অনশন সত্যাগ্রাহীদের সঙ্কোচও বড় কম নয়। অনেকটা সরকারী অনশনের মত। ডি-সি সেণ্ট্রাল মিঃ সোম একেবারে প্রেসিডেন্সীর সামনে দাঁড়িয়ে, অপর দিকে কোলকাতা পুলিশের দীর্ঘদেহী বিলিতি মডেল রনিমুর দাঁড়িয়ে শতবার্ষিকী ভবনের সামনে। যেন ছোট খাট একটা যুদ্ধক্ষেত্র। থেকে থেকেই মিছিলগুলো আসছে। একটার পর একটা। যেন বিরাম নেই। প্রতিটি মিছিলের একটা দাবী: সরকার গদি ছোড়, আভি ছোড়, জলদি ছোড়। প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল বোধ হয় মীর্জাপুরের পুঁটিরামের দোকানের সামনে, পুলিশের দুটো বড় কালো ভ্যান সেদিকটায় ছুটে গেল। দুপুর হতে না হতেই ট্রাম বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এপাড়ায়। গোলদীঘির চারদিকের হকার্সের দোকানগুলোর ঝাঁপ নামানো। বিক্রী আজ পুরোটাই বন্ধ। তবে দোকানীরা সবাই চলে যায় নি। কাছাকাছিই আছে, ভাবছে অবস্থা একটু আয়ত্তে এলেই দোকান খুলে বেচাকেনা করবে। এ অভ্যেস দোকানীদের অনেক দিনের। টুং টাং শব্দ করে দু-একটা রিকশায় মফঃস্বলের দোকানদাররা বড়বাজার থেকে মাল নিয়ে শিয়ালদার দিকে যাচ্ছিল। এখন তারাও আর আসছে না। বাসগুলো ঘুরিয়ে মার্কাস স্কোয়ার থেকে সেণ্ট্রাল এভিনিউ হয়ে আসছে। মেডিকেল কলেজের দিকে পুলিশ আরও বেশী। বড় মিছিলগুলো ওদিক থেকেই আসছে।

সেন্টিনারী বিল্ডিংসের নীচে সত্যাগ্রহীদের কয়েকজন মাইকে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না। প্রচণ্ড জোরে শব্দ করে কাঁচের দরজাটা ভেঙে গেল। বাইরে থেকে থান ইঁট এসে পড়েছে। ভাগ্যিস কারো লাগে নি। সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগানের স্পীড বেড়ে গেল এখান থেকে। বোধহয় রক্ত দেব, জীবন দেব, অনশন ভাঙছি না, ভাঙব না—এধরনের কিছু একটা হবে। কলেজ স্ট্রীটের মাইকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার আর শ্লোগানে ফাটা আর্তনাদে ইনকিলাব, লালসেলাম, মুর্দাবাদ, গদি ছাড়, বেইমান, বন্দেমাতরম্ —সবগুলো মিলিয়ে এক বিচিত্র ঐকতান। চিৎকারের শেষ টুকরো ভেসে আসছিল। অনিমেষ দাঁড়িয়ে কি বলতে চাইল মাইকে। এমন সময় কলেজ স্ট্রীটের দিক থেকে আসা মিছিলটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। লক্ষ্য শতবার্ষিকী ভবন। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওদের

ঠেকিয়ে রাখতে। কিছুটা শ্লোগান-যুদ্ধ হলো। এর পর শতবার্ষিকী ভবনের সামনেই বোমা পড়ল। ভীড়টা বেশ হাল্কা হলো। এমনকি পুলিশও একটু সরে দাঁড়াল। অনিমেষ এবার বক্তৃতার সুরটা বিপ্লবের স্কেল থেকে শ্রাদ্ধ-বাসরের কীর্তনের সুরে নামিয়ে আনল। ভয় পেলেও তা প্রকাশ করতে চাইল না। আপনারা ভাববেন না—আমাদের জয় হবেই। এ ধরনের কিছু আশ্বাস দিয়ে সত্যাগ্রহীদের বলল, তোমরা ভয় পেওনা, আমি এক্ষুনি আসছি। ভবনে একটা ফোন করে দেব আর সি-এমকে কনট্রাকৃট করছি, কিছু ছেলেদেরও নিয়ে আসতে হবে। আসলে এই বলে অনিমেষ কেটে পড়ল। অনিমেষকে অনুসরণ করার নামে আরও চার-পাঁচ জন কেটে পড়ল। সুব্রত, বিমল, অজিত তো একেবারে রেগে টং। শালা নেতা না হাতী। ভীতু কোথাকার, মিছিল আর বোমা দেখে কেটে পড়ার ধান্দা। ওরা পালাল। আর এ মুখো হবে না দেখিস। এখন যা আছে কপালে আমাদের হবে—তৈরী হয়ে থাক—সুব্রত বেশ রেগেই বলল।

আমার মার শরীরটা গতকাল রাত থেকেই খারাপ—আমায় ভাই যেতে হবে—বাদল একথা বলেই চলে গেল। রূপক বাদলের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিল। পানিহাটির রূপক সকাল থেকেই সামনে দাঁড়িয়ে। উত্তেজনায় কাঁপছে ওর দেহ।

এমনি ভাবে বেশ কয়েকজন কেটে পড়ল বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। সত্যিই অনিমেষ চলে যাবার পর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল পুলিশের কয়েকজন।

ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসেও আটকে পড়েছে কয়েকজন। ইউনিভারসিটির গেট দুপুরে বন্ধ হয়েছে। ইউনিভারসিটি বন্ধ থাকলেও লাইব্রেরী খোলা ছিল। যারা পড়াশুনো করার তাগিদ কিংবা পড়াশুনোর অছিলায় অন্য কিছুর তাগিদে সাত সকালে লাইব্রেরীতে এসে বসে তারাও পড়েছে খুব মুশকিলে। ওদের মধ্যে কয়েকজন অসহায়ভাবে লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কারণ গেট খোলার ঝুঁকি নিচ্ছিল না দারোয়ান। ওদের মধ্য থেকেই অনেক ভেবে শেষে সুমিত্রা বেরিয়ে এল। সিক্সথ্ ইয়ারের ফিলসফির সুমিত্রা চৌধুরী। সোজা একেবারে শতবার্ষিকী ভবনের সিঁড়ির কাছে এসে বিমলকে ডাকল। বিমলও ফিলসফির ছাত্র—বিমল একটু এদিকে এসো।

বিমলরা সবাই অবাক। এ আবার কোত্থেকে এসে জুটল। কোত্থেকে এলে তুমি! বাইরে ভীষণ হাঙ্গামা। এর মধ্যে এখানে কেন এলে? শিগ্গীর

বাড়ি যাও। সে জন্যেই তো ডাকছি। একটু এদিকে এসো।

বিমল উঠে এলো। সুমিত্রা একটু ভেতরে গিয়ে বলল, আমরা জনা পনের ছেলে মেয়ে আটকে পড়েছি। লাইব্রেরীতে এসেছিলাম। এখন দেখছি যাবার কোনো পথ নেই। লাইব্রেরীর স্টাফ্‌রা বললে তারা নাকি রাতে যাবে, সব হাঙ্গামা থেমে গেলে। দারোয়ানকে বলছি গেট খুলতে। কিছুতেই গেট খুলবে না। ঠিকই বলেছে দারোয়ান। গেট খোলা ঠিক হবেনা। সামনে পুলিশের ব্যারিকেড রয়েছে। গেট খুলে দিলে যেকোনো একটা মিছিল ভেতরে ঢুকে যাবে। আমাদের উপর টার্গেট করেছে ওরা আজ। বরং এদিকে এসো আমার সঙ্গে। দেখি হার্ডিঞ্জের গ্রাউণ্ড ফ্লোর দিয়ে তোমাদের কলুটোলায় নামিয়ে দেওয়া যায় কিনা।"

আবার প্রচণ্ড জোরে বোমা পড়ল। এবার বোধ হয় ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে। চিৎকার শোনা গেল। বিমল সহ সবাই ওরা আঁতকে উঠেছে। বিমল ওদেরকে নিয়ে হার্ডিঞ্জের দিকে যেতেই অজয় ছুটে এলো। সঙ্গে রূপকও হাঁপাচ্ছে।

বিমলদা সর্বনাশ হয়েছে। নিখিলের গায়ে বোমা পড়েছে। ভীষণ রক্ত পড়ছে। শীগগির এসো। বিমল বেশ হতচকিত হলো। সুমিত্রা নিজেও। অবস্থা বুঝতে পেরে সুমিত্রা নিজেই বিমলকে বলল, তোমরা যাও, আমি এদের নিয়ে হার্ডিঞ্জে যাচ্ছি। যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই।

পথ না পেলে বের হবার চেষ্টা করো না। বাইরে ভীষণ টেনশন, বলেই বিমল এল শতবার্ষিকী ভবনের সিঁড়ির কাছে।

ইতিমধ্যে পুলিশের কয়েকজন রেলিং টপ্‌কে ভেতরে ঢুকেছে। নিখিল একেবারে অজ্ঞান বলা চলে। বাঁ হাতটা প্রায় নেই। পেটের কাছেও ভীষণ লেগেছে। ভীষণ ব্লিডিং হচ্ছে। নিখিলের বয়স খুব বেশী নয়। সুরেন্দ্রনাথের ফাস্ট্র ইয়ারের ছাত্র। বিমলদের সঙ্গে এসে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছে। বোমার আঘাতটা প্রচণ্ড হয়েছে। স্প্লিণ্টার ঢুকেছে তলপেটে। পুলিশের লোকেরা তাড়াহুড়ো করে ওকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেল। বাইরে ভীষণ উত্তেজনা। তাই বিমল বা অজয় বা সুব্রত কাউকেই সঙ্গে নেওয়া হলো না।

আপনারা কেউ আসবেন না বাইরে। পুলিশের অফিসার বললেন, দেখছেন তো টার্গেট আপনারা। আপনারা সঙ্গে এলে বাইরের ওরা দেখবে। আরও টেনশন বাড়বে। কি লাভ? আমরাই ওকে জীপে করে নিয়ে যাচ্ছি।

আমিও যাব সঙ্গে। সুমিত্রা এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ব্যাপার তোমরা যাওনি? বিমল তাকিয়ে থাকে সুমিত্রার দিকে।

না, ওরা সবাই চলে গেছে। খবরটা শুনেই আমার কেমন লাগল। তাই গেলাম না, দেখতে এলাম। আমি যাব। আমায় কেউ চেনে না। তাছাড়া আমি কোনো দল করি না। আমি যাব হসপিটালে। ইস্ কি রক্ত পড়ছে! শতবার্ষিকী ভবনের সিঁড়িটা একেবারে লাল হয়ে গেছে।

পুলিশ কোনো আপত্তি না করে সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে নিখিলকে তুলে নিয়ে এল অ্যাম্বুলেন্সে।

এবার কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে পুলিশ। ভীষণ ধোঁয়া। চোখ জ্বলছে। সুব্রত দাঁড়িয়ে মাইকে বেশ উত্তেজিতভাবে কি সব বলল—গুণ্ডারা আমাদের উপর হামলা করেছে। শান্তিপূর্ণ অনশনে হামলা করল এরা—আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল। এর মধ্যে মাইকের তার ছিঁড়ে গেল। বাইরে লাগানো আমপ্লিফায়ারটা খুলে পড়ে গেছে ইঁট পাটকেলের আঘাতে। মুকুল ওই গোলমালে দাঁড়িয়েই মাইক ঠিক করতে ছুটে এল। অদম্য সাহস মুকুলের। ভয় বলতে কোন জিনিস নেই ওর মধ্যে।

জীপে করে একদল পুলিশ এলো। অ্যাম্বুলেন্সে বসে সুমিত্রা নিখিলের রক্তাক্ত দেহটাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সীতে।

নিখিলের বাড়ির ঠিকানা জানত অজয়। পুলিশকে বলে দেওয়াতে তালতলা থানায় খবর চলে গেছে। নিখিলের বাড়ির লোকেরা এসে পড়বে এক্ষুণি।

নিখিলকে নিয়ে গেছে ভেতরে। পুলিশ থাকাতে সুবিধাই হলো। হয়তো এর ফলে চিকিৎসা একটু দ্রুতই শুরু হবে। তখন দু একটা এমার্জেন্সী কেস এসে পড়ে আছে। তাদের প্রতি তেমন কোনো নজর নেই কারো। এদের তদ্বিরের লোক বোধ হয় কম।

মেডিকেল কলেজে ভি-আই-পি, সেমি ভি-আই-পি আর পলিটিক্যাল ইনজুরির যে মর্যাদা অন্যের বেলা তা নয়।

কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ বিরতি হয়েছে। গরমে, তৃষ্ণায় আর কাঁদানে গ্যাসে বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে। কতক্ষণ আর গলাবাজী করা যায়। সবাই যেন একটু হাঁফ ছাড়ছে। একটু চেঁচামেচি হোল প্রেসিডেন্সীর গেটে। ওখান থেকে বোধ হয় পুলিশ দুজনকে ধরে ভ্যানে তুলছে। বোম মারার জন্যও হতে পারে বা অন্য কারণেও হতে পারে। ঠিক বোঝা গেল না। পুলিশ অফিসারটি নিখিলের সঙ্গে সুমিত্রার সম্পর্ক আছে কিনা জানতে চাইল। আমি কিছুই

জানি না। আমি লাইব্রেরীতে পড়তে এসেছিলাম। আটকে গেছি। হঠাৎ এ জিনিস দেখে চলে এসেছি। আপনি বলছেন ওরা এলে টেনশন হবে, তাই আমি এলাম। আমি কোনো দল করি না। তাছাড়া ওদের ওখানে বসে থাকা বিমল সুব্রত ছাড়া আর কাউকে চিনি না।

আপনি কোথায় থাকেন ?

ঢাকুরিয়ায়। আমার দাদাকে বোধ হয় আপনারা চিনবেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার। নাম পরিতোষ চৌধুরী। সুমিত্রা বললে।

ও আচ্ছা, আপনি পরিতোষবাবুর বোন, নমস্কার।

নমস্কার। আপনি বরং একটু থাকুন বাড়ির লোক না আসা পর্যন্ত। আমাদের আবার ডিউটিতে যেতে হবে।

নার্স দুজন লোক এনে স্ট্রেচারে করে নিখিলকে এমার্জেন্সী রুমে নিয়ে গেল। সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রিসেপশানের কাছে। ভাবছে কোথা থেকে কি সব হয়ে গেল। এত রক্ত দেখে সুমিত্রার নিজের মাথাও ঝিম ঝিম করছে। ইস্ কি মারাত্মক ! বসে পড়ল বেঞ্চের উপর। কি যে ছাই হচ্ছে। ইউনিভারসিটি বন্ধ হয়েছে তার জন্য আবার এদের অনশন কেন ? আর ওরাই বা কেন এত মিছিল করে চলেছে। এত সব মাথায় আসে না সুমিত্রার।

তবে একটা জিনিস আঁচ করতে পেরেছে যে অনশনকারী ছেলেরা বোধ হয় সরকারপক্ষীয়। আর মিছিলকারীরা বোধ হয় সরকার বিরোধী। সকালবেলা সুমিত্রাকে ওর দাদা আজ কলেজ স্ট্রীটে আসতে মানা করেছিল। হয়তো আগে থেকে খবর ছিল ইন্টেলিজেন্সের যে গোলমাল হবে। সুমিত্রা শোনে নি। বলেছিল, না আমায় যেতেই হবে। লাইব্রেরীতে কোন হাঙ্গামা হবে না। ডিসেম্বরে পরীক্ষা। রেফারেন্স থেকে নোটগুলো করে না রাখলে আর সময় কই ! ফার্স্ট ক্লাশ পেতেই হবে।

অনার্সে ভাল রেজাল্ট করেছিল সুমিত্রা। ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড। এখন ভাবছে সকালে দাদার কথা শুনলেই হতো। বাড়িতে গিয়ে যা বকুনি খাবে। তারপর আবার পুলিশের লোক জেনেছে। হলো যত ঝামেলা। নিশ্চয়ই এরা দাদাকে কিছু বলবে।

যাবার আগে পুলিশ অফিসারটি সুমিত্রাকে বলল, আমি একজন অফিসার রেখে যাচ্ছি, জীপ রইল। গার্জিয়ান এসে গেলেই আপনি বাড়ি চলে যাবেন আমাদের জীপে। কোনো অসুবিধা হবে না।

না না, তার কোনো দরকার হবে না। আমি বাসে করে যাব।

কি বলছেন আপনি! আজকে বাসে উঠবেন কোন রুট থেকে!

সে আমি পেয়ে যাব। আমার জন্য ভাববেন না। সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে যাব। সেখান থেকে ন'নম্বর ধরে সোজা বাড়ি।

আচ্ছা চলি। আপনার দাদাকে খবর দেব?

না না, একদম না। শুনুন, দাদাকে এসব কিছু বলবেন না। তাহলে আমায় ভীষণ বকুনি খেতে হবে।

হেসে উঠল অফিসারটি—আচ্ছা তাই হবে। আমার পরিচয় আপনাকে দিই নি, আমি সুনীল ঘোষ—এ-সি-সেণ্ট্রাল। পরিতোষ বাবু আমার খুব পরিচিত।

সুমিত্রা বসে আছে। এবার নার্সটি বেরিয়ে এলো সুমিত্রার কাছে। বলল, আপনি কি নিখিল নন্দীকে নিয়ে এসেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবস্থা ভাল নয়। এখনি এক্স-রে করে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো। গার্জিয়ানদের খবর দিন।

হ্যাঁ খবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাঁচবে তো?

বলা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে অনেকগুলো স্প্লিণ্টার ঢুকেছে অ্যাবডোমেনে।

সুমিত্রা তাকিয়ে রিসেপ্সনের ঘড়িটার দিকে।

একটু পরেই একটা পুলিশের জীপে করে এসে নামলেন একজন মাঝবয়সী লোক। সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা ও একটি মেয়ে। সুমিত্রার বয়সী হবে। এসে রিসেপ্সনে বললেন ভদ্রলোক, নিখিল নন্দী নামে······

সুমিত্রা উঠে দাঁড়াল! নমস্কার! আমার নাম সুমিত্রা চৌধুরী। নিখিলকে অপারেশনের জন্য নিয়ে গেছে। বসুন, এক্ষুণি নার্স এসে যাবে। আমি নিখিলের সঙ্গে ছিলুম।

কেঁদে পড়লেন ভদ্রমহিলা। নিখিলের মা। আমার কি হবে মা। নিখিল বাঁচবে? আমার তিনিটি ছেলের একটি যুদ্ধে গেল। আর ফেরে নি। একটি অন্ধ। আর একটি সেও এখন···ভগবান!

ভদ্রমহিলা পড়ে যাচ্ছিলেন। রিসেপ্সন থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ওঁকে ধরে বললেন, অধৈর্য হবেন না। ডাক্তাররা সব করবে। এখানে কাঁদলে কাজের অসুবিধা। আপনি বরং বসুন।

সুমিত্রা সাহায্য করল ওকে ধরে বসাতে।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক নিখিলের কাকা। উনি বললেন, ওঁর বাবা অফিসে কাজ করে চন্দননগরে। আসবে সেই রাতের শেষ লোকালে। আমি তো দোকান

বন্ধ করে এলাম।

নার্স একটু পরেই এলো। সুমিত্রা নিখিলের মা ও কাকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েই চল্লে এল। আসার সময় নিখিলের কাকার কাছ থেকে ওদের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে এল। এগার নম্বর ডাক্তার লেন। নিখিলের বোনও সঙ্গে এসেছে।

ট্রপিক্যালের গেটের কাছ থেকে সোজা হেঁটে এসে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল সুমিত্রা। ভীষণ জ্যাম হয়েছে ট্রাফিক। গায়ে গায়ে গাদাগাদি করে গাড়ি আর ট্যাক্সিগুলো যাচ্ছে। অফিস ফেরত যাত্রীরা কোন রকমে বাদুড়ের মত ঝুলছে।

কলেজ স্ট্রীটে একটু থমথমে ভাব হলেও উত্তেজনাটা কমেছে মনে হচ্ছে। দিবস সংগ্রামীদের অনেকেই ক্লান্ত। অনেকের ট্রেন ধরার পালা। কেউ বা বাসে যাবে। নেতারা যাবে যাঁর যাঁর অফিসে। সেখান থেকে সংবাদপত্রের অফিসগুলোকে কন্‌ট্যাকট করে বিবৃতি দেওয়া, অনেক কাজ বাকি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কার্ফু কার্ফু ভাব গোটা কলেজ স্ট্রীট এলাকায়। এক আধটা দোকান অর্ধেক ঝাঁপ খুলেছে। নানা দলের লোকাল কমিটির কাষ্টডিয়ান কাম লোকাল কেয়ার টেকার কাম লোকাল "ঠেক" ইনচার্জরা এখন এরিয়ার জি-ও-সি। নানা দল হলেও লোকাল বা পাড়া সেন্টিমেণ্টের এই সময়ে একই পানের দোকানে বা রোয়াকে দু-তিনটে পরস্পর-বিরোধী দলের লোকাল কমাণ্ডাররা পরস্পর টীকা-টিপ্পনী কাটে। কখনও একটু হালকা জ্ঞানও দেয়।

যাই বল তোদের অনশন করাটা নিছক দালালী হয়ে যাচ্ছে। মিছিল-ক্লান্ত লোকাল কোন দলের একজন বলল কানাই ধর লেনের শ্যামলকে।

বাজার খারাপ। শক্ত ডিফেন্স নেবার পথ নেই। তারপর 'লিয়ারা' হবার ভয় আছে। সেই জন্যই একটু সারেণ্ডারের সুরে শ্যামল বলল, তা ভাই আমরা তো দলাদলির মধ্যে নেই। শুধু ইউনিভারসিটি খোলার জন্য লড়ছি।

ন্যাকা আর কি! বন্ধ করতে বলেছে কে? তুই বলতে চাস সরকারের সঙ্গে কথা না বলেই বন্ধ করেছে? এখন স্রেফ আমাদেরকে ছোট করার জন্য— আর যত সব শালা বুর্জোয়া প্রেস। ছোটখাট এই ধরনের দু-একটা মন্তব্য আন্দোলনের দিনের একই পাড়ার একই রোয়াকে প্রায় পরস্পরের মধ্যে হয়।

সকালের কাগজে ফলাও করে যদি কারো পক্ষে খবরটা হয়, তার কাছে সেটা বুর্জোয়া কাগজ না হয়ে সেই দিনটার মত সেটা লেনিনের "ইসক্রা" কিংবা অরবিন্দের "বন্দেমাতরম" কাগজ হয়ে যায়। আশ্চর্য এই যে এই ধরনের

মিছিল বা মিটিং বা আন্দোলনে সাংবাদিক অথবা পুলিশ ছাড়া, মূল আন্দোলনের লাভ লোকসানের খতিয়ান দেখতে পরাজিত বা বিজয়ী দলের কেউ যায় না, যতক্ষণ না কাগজের মাধ্যমে নিজেদের বিবরণ জানতে পারে। তাই ডাক্তার লেনের নন্দীর খবর কানাই ধর লেনের গভরমেণ্ট পক্ষের শ্যামল দত্তেরও অজানা, তেমনি করেই মিছিল ফেরত অনেকেরই অজানা। তারা কাগজ পড়ে জানবে।

আলিমুদ্দীন স্ট্রীট, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট, ৫৯ বি চৌরঙ্গী রোড-এর পার্টি অফিসগুলো বর্ণনা করছে মিছিলের দৈর্ঘ্য। কেউ মুড়ি তেলেভাজা এনে চাটুকারিতা করছে কয়েকজন নেতার। এই সব হাফ খচ্চর, পুরো শয়তান নিষ্কর্মা ফাঁকিবাজ পল্টনের কিছু কিছু এ-পার্টি ও-পার্টি সবখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে ধমক দিলেই এরা ঠিক হয়ে যায়। এবং নিজের যে নির্লজ্জ তা নির্ভীকভাবে মেনে নেয়। ঊনষাট বি-তে বসে অনিমেষ বোস বেশ টেনে টেনে সিগারেট ফুঁকছে। চাটুকার পান্না তার জল চা আনছে।

হ্যালো, আনন্দবাজার রিপোর্টার সেকসন? একটু অরুণবাবুকে দিন না।···

হ্যালো, অরুণদা নমস্কার। অনিমেষ বলছি। আমার বক্তব্যটা···

এ্যাঁ কে বলল! না না পুরো ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি···হ্যাঁ হ্যাঁ·· না না। ওসব বাজে কথা। একটু দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা নমস্কার।

এমনি করে সব ম্যানেজ হচ্ছে। অজয় বলত মাঝে মাঝে, যে প্রেসে নাকি নিউজ খাইয়ে দিতে হয়।

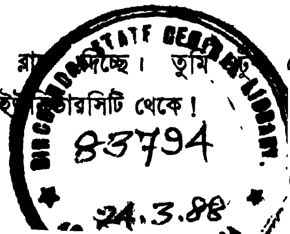
এও এক ধরনের খাওয়ানো। পাকা সাংবাদিকদের খাওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু কাঁচারা এই খাওয়ানোতেই খুশি।

নামজাদা, পায়াভারী সব নেতারাই আজ ভবনে বসে। বোধহয় ভারত রক্ষা আইনের আটক নেতাদের মুক্তির বিষয় আলোচনা চলছে। ডাক পড়ল অনিমেষের। চাটুকারগুলো সব গর্বিত বোধ করছে। যেন লেনিনের ঘরে স্তালিনের ডাক পড়েছে আর কি।

কিছুক্ষণ পরেই অনিমেষ বেরিয়ে এলো। বেশ হাসি খুশি ভাব। প্রচণ্ড আনন্দ। যেন একাই লড়ছে।

ফোন এলো অনিমেষের!

অনিমেষদা, নিখিলের অবস্থা খারাপ। ব্লাড দিচ্ছে। তুমি একটু হেলথ মিনিস্টারকে বলো। বিমল ফোন করছে ইউনিভারসিটি থেকে!



সে কি, কখন হলো ?

নিজেই লজ্জা পেল অনিমেষ। আসলে সেই যে সে দুপুরে পালিয়ে এসেছে তারপর আর যায় নি। গড়ের মাঠে বাদাম খেয়ে সন্ধ্যে হতেই গুটি গুটি ভবনে এসে পৌঁছেছে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি নিজেই যাচ্ছি। তোমরা ভেব না। আবার প্রেসকে ডায়াল করে অনিমেষ।

অরুণবাবু! একটু ভুল হয়ে গেছে। আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে ঘর বোঝাই এত ছেলে তাই কন্‌ফিউসড্ হয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, নিখিল আমাদেরই ছেলে। কি বললেন ? না মানে আমি ইচ্ছে করেই এ সব বলিনি, ঘরে অনেক রকমের লোক তো। না, না, আমি ছিলাম। টেলিফোন নামিয়ে রাখে অনিমেষ। ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। সাংবাদিক জানে অথচ সে জানে না।

অনিন্দ্য এসে দাঁড়াল। মাথায় ছোট্ট ব্যাণ্ডেজ। সেবাদলের অসিত বলল, কি হয়েছে অনিন্দ্য ?

আর বোলো না—এই যা বোতল চার্জ করেছে না—আমি না থাকলে বিমলটা মরত। একটু দেখ তো ফার্স্ট এইড আছে কিনা।

অনিন্দ্য পুরনো কর্মী। কিন্তু ঝামেলা দেখলে কেটে পড়ে যদি সুযোগ থাকে। যতটুকু না হয় তার তিনগুণ বাড়িয়ে বলে। নেতা দেখলে তো কথাই নেই। নেতা ও মিস করবে না। সবাই ওকে জানে। তবুও বিদ্রূপ করেই অসিত বললে, কলেজ স্ট্রীটে চোট খেয়েছিস, আর ডেটল লাগাতে চৌরঙ্গী এসেছিস, পাগল নাকি রে—এর মধ্যেই তো টিটেনাস হয়ে যেতে পারত।

রেগে যায় অনিন্দ্য। শুধু মাতব্বরি, না ? বসে বসে এখানে গ্যাজানো, আর ফেস করব আমি !

ইচ্ছে করেই অনিন্দ্য লিফ্‌টের কাছের বেঞ্চে বসে পড়ে। কারণ এখান থেকেই নেতারা ওঠানামা করে—ওকে তারা দেখবেই এবং সেই সঙ্গে নেতার নোটবুকে নামটা পাকা থাকবে।

অনিমেষ অবশ্য প্রতিবাদ করে না। কারণ অনিন্দ্য অনিমেষের ব্যাপার জানে আর কিছু পরিমাণে অনিমেষও অনিন্দ্যকে জানে। পরস্পর শুধু ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে। কারণ ক্রেডিটটা একা নেয়া গেল না বলে। অথচ অনিমেষকে নিয়েই স্বপ্ন ছিল শ্যামলদার (দলনেতা) যে ওকে ভবিষ্যৎ কর্ণধার করবে। কিন্তু অনিমেষ সম্বন্ধে মত বদলেছে শ্যামলদা এখন। শ্যামলদা একটু পিছিয়ে থেকেই তাই বিমলকে সাহায্য করছে ওর জায়গা নিতে। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় অরবিন্দ-

সেন-এর বাহিনী জিতে গেল।

কোলকাতার সেরা ছাত্ররা সব এসে অরবিন্দর পাশ থেকে কলেজ স্ট্রীটে সরকারকে ধিক্কার দিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

পর পর তিনটে বাস ছেড়ে দিয়েছে সুমিত্রা।

চাপ্‌বার কোনো উপায় ছিল না। আর একটা আসছে। হ্যাঁ, ন'নম্বর। পাদানিতে একটু ভীড় কম। কোনোমতে উঠে পড়ল সুমিত্রা। নীচে একেবারে গাদাগাদি। ও জানে যে এসব ক্ষেত্রে ওপরের দিকে ওঠাই সেফ। দোতলার সিঁড়িতে পা রেখে স্টেপ ফেলতে ফেলতে উঠতে পারলে জায়গা না থাকলেও অনেকে লেডিজ দেখলে জায়গা ছেড়ে দেয়। আর অল্প বয়স হলে তো কথাই নেই। 'কেবা প্রাণ আগে করিবেক দান' এমন দৃশ্যও দেখেছে।

বাসের মধ্যে তখন কথা চলছে—যাচ্ছেতাই হলো আজ। মশাই, এ শহর ছেড়ে পালাতে হবে। এরই মধ্যে একজন মন্তব্য করল, যাবেন কোথায়, বিলেত? ও দাদা, দাদা বোধ হয় গবরমেণ্টের দালাল। বেশ কয়েকটা ছেলে হো হো করে হেসে ওঠে। না, না, বিলেত যাবেন না, বিলেত অনেক দূর। ওনাকে দিল্লী পাঠাও। যে ভদ্রলোক আগে বলেছিলেন তিনি গণতন্ত্রের আনুপাতিক শক্তি অনুযায়ী বাসের মধ্যে কোন জায়গায় টু-থার্ড মেজরিটি বা বলপূর্বক মেজরিটিতে আছে বুঝতে পেরেই আর টুঁ শব্দ করলেন না। হজম করে গেলেন মন্তব্য। এটাই নিয়ম।

কণ্ডাকটার এসে টিকেট চাইল। ভীড়ের মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল—দাঁড়ান মশাই টিকেট দিচ্ছি। কোনো রকমে দাঁড়াতে পেরেছি। পকেটে হাত দেব, দেখব পয়সা কড়িগুলো ঠিক আছে কিনা তবে তো টিকেট। আবার হাসির রোল পড়ল। কণ্ডাকটার বোধ হয় একটু ওদেরই সমর্থক। সে মৃদু হাসল। তেমন আর তাগাদা দিল না। ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের স্টপে বেশ কয়েকজন নামল। এক্ষণে মোটামুটি সুমিত্রা উপরে উঠেছে। সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে। গরমে ঘামে একেবারে অন্য শরীর নিয়ে সুমিত্রা।

সেই সকালে বেরিয়েছে। বারে বারেই ভাবছে যে আজ বাড়িতে গেলে বৌদি মা সবার কাছেই বকুনি খেতে হবে। না জানি এতক্ষণে বোধ হয় খোঁজ খবর শুরু হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটার খবর পড়া শেষ হয়েছে দশ মিনিট

হলো। এখন আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। মা রোজ খবর শোনে। দাদার কাছে খবর আরও আগেই আসবে। কি যে আজ হবে ভাবতেই পারছে না সুমিত্রা।

আবার কণ্ডাকটার এসে টিকেট চাইল দোতলায়। তখনও অনেকে দাঁড়িয়ে দোতলায় ঢোকবার মুখে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক পকেট থেকে পয়সা বের করে কণ্ডাকটরকে দিয়ে বলল, গোল পার্ক।

কোথায় উঠেছেন ?

এসপ্লানেড থেকে।

কণ্ডাকটার টিকেটটা হাতে দিয়ে এগিয়ে গেল অন্যদিকে।

কয়জন ছেলে একেবারে সুমিত্রার সিটের উপর ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করেছে রড্ ধরে। তারা কেউ টিকেট কাটবার আগ্রহ দেখাল না। একজন তো বলেই বসল, টিকেট কি হবে দাদা। আজ সব মাফ করুন। যা ভোগান্তি হয়েছে। যেমন গবরমেণ্ট তেমন শালা বাস। কণ্ডাকটার মৃদু হাসল। বলল, যা আপনাদের ইচ্ছে। আমার কি ?

বুড়ো ভদ্রলোক এবার বেশ উত্তেজিত। বোধ হয় সওদাগরী অফিসে কিংবা কোথাও ভাল কাজ করেন। বেশ পুরনো কালের লোক। চেঁচিয়ে ইংরেজিতে কণ্ডাকটারকে বললেন হোয়াট্ ? ইউ আর নট এ পার্টি টু দিস অর দ্যাট। ইউ-আর এ্যান এমপ্লয়ি। ইল কাণ্ট এনকারেজ দিস থিং। দেশটাকে ডোবাবেন নাকি ? ছেলেগুলো গলা চড়িয়ে জবাব দিল, থামুন দাদু, পেনশন ডবল হবে না। বেশী দালালী করলে নামিয়ে দেব।

কণ্ডাকটার ভদ্রলোক এবার নিজেই বলল এগিয়ে গিয়ে, আমায় জ্ঞান দেবেন না। যা করছি বেশ করছি। আপনি আমায় চাকরি দেননি। আমার ভালমন্দ আমার ইউনিয়ন বুঝবে। বলেই সে বেল বাজিয়ে বাসটাকে রাসবিহারীর মোড়ে বাঁধল। ছেলেগুলো তখনও যা তা বলে চলেছে। বুড়ো ভদ্রলোক সিট ছেড়ে উঠল। বোধ হয় সাদার্ন এভিনিউতে নামবে। টিকিট তো গোল পার্কের। বুড়ো মানুষ হয়তো টু স্টপ আগে থেকেই রেডি হচ্ছে। সুমিত্রা এসব দেখছে অনেকক্ষণ ধরে। সুমিত্রা নিজেও ভাবল, না, থাকা যায় না আর। এক স্টপ থাকতে নেমে হেঁটেই বাড়ি যাবে। একটু হাওয়া লাগবে গায়ে। বুড়ো ভদ্রলোকের পিছে পিছেই সুমিত্রা নেমে পড়তে চাইল। ছেলেগুলো নীচের পা দানির কাছে নেমে এসেছে। বুড়ো ভদ্রলোকটি নামতে নামতে বেশ কড়া চোখে ছেলেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। ছেলেগুলো এখনও টিটকিরি দিচ্ছে

—হরিবোল দাদু হরিবোল—বুড়ো দালাল।

সাদার্ন এভিন্যু আর ল্যান্সডাউন জংশনের কাছে বাসটা দাঁড়াল। বুড়ো ভদ্রলোক এবার রেডি হয়েছেন। নেক্সট্ স্টপে বিবেকানন্দ পার্ক তারপর সোজা গোলপার্ক বিবেকানন্দ পার্কের কাছে বাসটা বাঁধতেই আচমকা বুড়ো ভদ্রলোককে ধাক্কা মারল কয়েকজন। একটা চিৎকার করে বুড়ো ভদ্রলোক পা হড়কে পড়ে গেলেন। সুমিত্রাও তাড়াতাড়ি কিংকর্তব্য হয়ে নেমে পড়ল বেশ ঝুঁকি নিয়ে। চপ্পলের স্ট্রাপ ছিঁড়ে গেল। ভদ্রলোক মুখ থুবড়ে পড়েছেন বেকায়দায়।

বাসটা এক সকেণ্ডও না দাঁড়িয়ে সোজা চলে গেল—কণ্ডাকটার জোরে বেল বাজিয়েছে। শুধু দোতলার জানলা থেকে কয়েকজন লোক ঝুঁকে দেখতে চেয়েছিল।

সুমিত্রা নিজেই ভদ্রলোককে টেনে ওঠাতে গেল, পারল না। ভদ্রলোকের জোর আঘাত লেগেছে। মুখে নাকে প্রচণ্ড রক্ত পড়ছে। কলার বোনটা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে। ওখানে হাত দিতেই চিৎকার করে উঠেছেন। আর এক ফ্যাসাদ সুমিত্রার, নাঃ—আজ কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিল! বিবেকানন্দ পার্কে কয়েকজন ছেলে বোধ হয় ময়দানের চ্যারিটি খেলার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিল। তাদের থেকে একজন মন্তব্য করল সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে, এই বুড়ো বয়সের বাপকে নিয়ে কেন বাসে যাতায়াত করেন? সুমিত্রা ওদের সংক্ষেপে বলে দিল আসল ব্যাপারটা কি। এক্ষুনি একে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া দরকার। ট্যাক্সি ডেকে দিল ছেলেরা, তারপর ওরাই ধরাধরি করে বসাল। সুমিত্রাকে বলল, আপনিও চলুন। সুমিত্রা উঠে বসল ট্যাক্সিটায়। ভদ্রলোকের রেক্সিনের পোর্টফোলিও ব্যাগটায় একটা ছোট কাগজের লেবেল—সুধীর দাসগুপ্ত। ৫।২ গান্ধী কলোনী, টালিগঞ্জ।

ওরা শিশু মঙ্গলে চলে এল। ভর্তি করতে বেশী সময় লাগেনি, ফ্র্যাকচার তো হয়েছেই, উপরন্তু ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন হয় তো ব্রেন হেমারেজ হচ্ছে। বাড়িতে খবর দেওয়া দরকার। ছেলেগুলো ভীষণ ভাল, ওরাই সুমিত্রাকে বলল, দিদি আপনি বাড়ি চলে যান, আমরা ওনার বাড়িতে খবর দিয়ে দেব।

সুমিত্রা বেরিয়ে আসবার আগে ওদেরকে ওনার ঠিকানাটা দিয়ে এল। বললো আমায় একটা খবর দেবেন ভাই।

নিশ্চয় দেব। সুজিত ঠিকানাটা তুই রাখ। দরকার হলে খবর দিতে হবে।

সুমিত্রার ভীষণ ভাল লাগল এই ছেলেদের। এই শহরে কোন ছেলে দেয় টিপ্পনী, কেউ ধাক্কা দিয়ে মানুষকে ফেলে দেয় বাস থেকে-আবার কেউ তাকে তুলে নিয়ে যায় হসপিটালে। কেউ সুমিত্রাকে দেখে অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ আবার দিদি ডাকে।

সুমিত্রা বাড়ি চলে এসেছে। যা ভেবেছিল তাই। মা একেবারে ঘরে বাইরে করছেন। দাদা এখনো ফেরেন নি। ঢুকতেই ওর মা প্রায় চেঁচিয়ে বললেন,

চিন্তায় চিন্তায় আমি কি একদিন মরব?

আরে বাপু শোনো না আগে। শুনলে পরে তুমি এত ভাবনা, রাগ করবে না। সুমিত্রা সব খুলে বলল মাকে। ততক্ষণে ওর বৌদি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, বক বক করতে হবে না ঠাকুর ঝি। একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান করে এসো। খেয়েই শুয়ে পড়ো।

সুমিত্রার মা একটু রেগেই সুমিত্রাকে বললেন, তা ছেলেটার কি হলো, না হলো আর বুড়ো ভদ্রলোকটার কি হলো শেষ পর্যন্ত না জেনেই চলে এলি।

বাবা···এই যা দেরী হয়েছে তাতেই অস্থির। এর পরেও কিছুক্ষণ থাকলে তুমি দাদাকে দিয়ে পুলিশ পাঠাতে।

তোমার দাদার দুবার ফোন এসেছিল। সুমিত্রার বৌদি বললেন।

কি বলেছ তুমি? সুমিত্রার কৌতূহল।

না ম্যানেজ করেছি—কোনো চিন্তা নেই।

রাতে সুমিত্রার দাদা বাড়ি এসে সব কিছুই জানালেন। বললেন এটা বোধ হয় ভাল হচ্ছে না মা। আমি পুলিশে কাজ করি। ওর এসব হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। কোন দিন কি হবে কেউ কি বলতে পারে? গভরমেণ্টকে তোষামোদ করে তবে আমাদের চাকরীর উন্নতি।

তা এখন ও কি করবে বল। রাস্তার মধ্যে একটা ঘটনা দেখলে তো ফেলে আসা যায় না। পরিতোষের স্ত্রী ওকে খেতে দিতে দিতেই বলল।

আসা যায় না বললেই হলো? নিশ্চয়ই আসা যায়। কোলকাতা শহরে কে বাঁচছে কে মরছে এ হিসেব নিতে যাদের মাথা ব্যথা তাদেরই মরণ হয় বুঝলে। তাছাড়া কে ভাল, কে মন্দ তা কি বোঝবার উপায় আছে?

অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কি সব যেন লিখল ডায়েরীতে পরিতোষ। একটা ছোট ম্যাপও দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কি ব্যাপার, তুমি ঘুমোতে যাবে না? পরিতোষের স্ত্রী বেশ অধৈর্য হয়েই বলল।

না, এক্ষুনি বেরোতে হবে। এক জায়গায় রেইড করতে যাব।

সুমিত্রার বৌদি রেগে গিয়ে বলল, ঘোড়ার ডিমের চাকরী। এ মানুষে করে নাকি ?

পরিতোষ হাসতে লাগল। বলল, রাগ কোরো না, পুলিশের ঘরে যখন এসেছ তখন তোমার ভাগ্যের সুখ দুঃখ পুলিশের সুখ দুঃখের সঙ্গেই জড়িয়ে নিতে হবে। তবুও আমরা হলাম লোকের কাছে 'শালা পুলিশ।'

পরিতোষ বেরিয়ে গেল। বাইরেই জীপটা অপেক্ষা করছিল।

॥ তিন ॥

কলেজ স্ট্রীটের মিছিল-মুখর রাজপথ এখন ভীষণ শান্ত।

পুলিশ তবুও যায় নি। গোটা কলেজ স্ট্রীট ঘিরে রেখেছে। সেন্টিনারী বিল্ডিংসের সত্যাগ্রহীদের অনেকে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে নিখিলের জন্য। অথচ অনশন ছেড়ে যাবার উপায় নেই। আগামী কাল সকালে অনশন ভাঙার কথা। ল'কলেজের মোহিনীদা রাত জেগে ছেলেদের পাশে বসে ছিল।

বিমল বলে উঠল, আচ্ছা প্রেসিডেন্সীর খবরটা নিলে হতো না। তা না হলে কালকে আবার হাঙ্গামা হবে।

সুব্রত ঘুমোতে ঘুমোতেই বলল, চুপ করো বিমলদা, পুলিশ যদি ওদের কিছু করে, আমরা আর কি করতে পারি।

একটা গাড়ি করে অনিমেষ, অনিন্দ্য আরও কয়েকজন এলো। এবার সুব্রত লাফিয়ে উঠল—যান যান চলে যান আসতে হবে না। ঝামেলা বাধার সঙ্গে সঙ্গেই কেটে পড়লেন। একটা খবর পর্যন্ত নিলেন না। আর এখন এসেছেন ? কাগজের কাজ সব সেরে এসেছেন তো ?

মুখ সামলে কথা বলো সুব্রত। অনিমেষ বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই বলল। শ্যামলদা দু'জনকে থামাল। সুব্রত আরও উত্তেজিত—কি করবেন আমাকে ? তাড়িয়ে দেবেন ? দিন না—আপনার মত···বিমল বাধা দেয় সুব্রতকে। অনিমেষকে বুঝিয়ে বলে সব। অনিমেষ মেডিকেল কলেজের দিকে বেরিয়ে গেল। সুব্রতর রাগ গিয়ে পড়ল বিমলের উপর—তোমরা জানো খালি তোষামোদ করতে। ঐ ফালতু নেতা আর ঐ চামচেটাকে কতকাল পুষবে বলো তো ? এসব জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে বসতুম না। ইট পাটকেল মেরে বাড়ি চলে যেতাম।

অনশনে বসে এসব কথা ভাবতে নেই সুব্রত। বিমল শান্ত সুরে বলে।

ততক্ষণে প্রেসিডেন্সীর গেটে বসে আরও একদল গান ধরেছে। অদ্ভুত সুরে ও

স্বরে, ওঁয়া ওঁয়া—ওরে জিততে হবে সবাইকে—ওঁয়া ওঁয়া। এই ওঁয়া ওঁয়ার তাৎপর্য্য কেউ বুঝতে পারে না।

রাত বেড়েছে। এখন রিকশাও চলছে না। একটা কালো ভ্যান এসে দাঁড়াল হিন্দু ইস্কুলের সামনে। রাস্তার সব লাইটগুলো হঠাৎ নিভে গেল।

চিৎকার ভেসে এল প্রেসিডেন্সীর গেট থেকে, তারপরে সব চুপ। সি-আর-পি আর কোলকাতা পুলিশের অভিযানের শিকার শুরু হলো। প্রলয়, নির্বেদ, নীলাদ্রিকে প্রায় পাঁজা করে তুলে জোর করেই নিয়ে গেল পুলিশ। প্রচণ্ড রুলের গুঁতো চলল। সি-আর-পির আশীর্বাদ নির্বেদের পিঠে। পুলিশ আসতেই যারা গান গাইছিল তারা মতলব বুঝতে পেরে পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল। যে ক'জন ঘুমিয়ে ছিল ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাদের তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। গণতন্ত্রে নাকি ঘুমোলেও নিস্তার নেই। অত্যাচার নাকি চলতে পারে—এটাই সি-আর-পির ব্যাখ্যা।

একটু পরেই বিমল খবরটা পেল। সুভাষ এসে খবর দিয়ে গেছে। সুভাষ কোনো দল করে না। কলেজ স্ট্রীটের হকার্সদের দোকানগুলো রাতের বেলায় পাহারা দেয়। বিমল খুব একটা ভাল চোখে দেখল না জিনিসটাকে। কাল জোর হাঙ্গামা বাধবেই। শুধু প্রেসিডেন্সীর গেটেই নয়, সারা কোলকাতাতেই ছড়িয়ে পড়বে। বাড়িতে বাড়িতে আজই মাঝরাতে পুলিশ যাবে। রেইড হবে, অত্যাচার হবে।

অরবিন্দ সেনের হোস্টেলেও পুলিশ এলো। অরবিন্দ তখন টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে হয়তো কলেজ পত্রিকার জন্যই একটা প্রবন্ধ লিখছিল। ভাবতেও পারে নি এত তাড়াতাড়ি আবার জেলে যেতে হবে। মাত্র তিন দিন হলো ছাড়া পেয়েছে। প্রচণ্ড জোরে দরজার উপর শব্দ হতেই দরজা খুলে দিল অরবিন্দ।

আপনি অরবিন্দ সেন? পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ।

আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে!

কেন কি হলো?

সে সব কথা কোর্টে গিয়ে বলবেন। আপাতত আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

রুমমেট স্বপন আজ নেই। বাড়ি গেছে।

স্বপনের নামে চিঠি দিয়ে গেল অরবিন্দ—স্বপন, আবার জেলে যাচ্ছি। প্রবন্ধটা শেষ হলো না। কলেজ ম্যাগাজিনের যদি সময় থাকে তাহলে সময়

চেয়ে নিস। পরে শেষ করে দেব। চিন্তা করিস না। জেলে বোধ হয় বেশী দিন রাখবে না। পারলে জেলে দেখা করিস—অরবিন্দ।

লালবাজারের সেণ্ট্রাল লক-আপে আনা হয়েছে প্রেসিডেন্সীর ছেলেদের। পুলিশ নির্বেদকে ভ্যানের মধ্যেই মারধোর করছে। যখন ভ্যান থেকে ওদের নামালো তখন সুনিত আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। নির্বেদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, একজন কনস্টেবল একটা টাওয়েল দিল নির্বেদকে। ভেজা টাওয়েল হয়তো রক্ত মোছবার জন্যই।

মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সী ব্লকটার কাছে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল নিখিলের বাবা। চন্দননগর থেকে শেষ ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে এসে সব খবর শুনেই ছুটে এসেছে। রিসেপশনে খবর পেয়ে লিফ্‌টে করে উপরে উঠে এলো। নিখিলের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। রাত একটা থেকে ওর কাছে আর কাউকে থাকতে দিচ্ছে না। এমন কি ওর মাকেও না। ওর মা নার্সদের ঘরে বসে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শ্যামলদা এসে দাঁড়িয়েছে ওর মার কাছে, বললে ভয় নেই, ডাক্তাররা বলছে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে—শুধু যাতে উত্তেজনা না হয় তাই ডাক্তার ওর কাছ থেকে আমাদের সরিয়ে এনেছে। নিখিলের বাবা একটা ছবির মত তাকিয়ে শ্যামলদার দিকে। সবাই বসে বসে রাত জাগার ধকল সইছে, নিখিলের ঘরের দিকে তাকিয়ে। ডাক্তার নার্স কেউ এলেই সচকিত হয়ে উঠছে। মোহিনীদা আর ল' কলেজের উমা কিন্তু নিঃশব্দ কর্মীর মত সারারাত একবার হসপিটাল আর একবার ইউনিভারসিটি করেছে।

॥ চার ॥

ভোরের কোলকাতা শুরু হলো খবরের কাগজের হকারদের সাইকেলের আওয়াজে। কাগজে ফলাও করে কলেজ স্ট্রীটের খবর বেরিয়েছে। কাঁদানে গ্যাস, গ্রেপ্তার সব কিছু বেরিয়েছে এবং সেই সঙ্গে ছোট করে নীচের দিকে শেষ শহর সংস্করণের কাগজগুলোতে বেরিয়েছে নিখিল নন্দীর মৃত্যু সংবাদ। প্রচণ্ড হেমারেজ হচ্ছিল। নিখিল নন্দীকে বাঁচানো যায় নি। রাত পৌনে তিনটেয় নিখিল মারা গেছে।

আজও ইউনিভারসিটি বন্ধ। ঘুম থেকে উঠেই ব্রাশটা মুখে দিয়ে কাগজের দিকে একবার তাকিয়েই ইস্‌ করে থেমে গেল সুমিত্রা।

ওর মা বলল, কি রে, কি হয়েছে ?

নিখিল মারা গেছে। এই বলেই সুমিত্রা ওর বৌদিকে বলল, বৌদি তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরোও, আমি একটু নিখিলের বাড়িতে যাব।

বাথরুম থেকে ওর বৌদি চিৎকার করে বলে উঠল, কে মারা গেছে ?

যার কথা কালকে বলেছিলাম, সেই ছেলেটি। একটিবার ওর মার কাছে যাব। নিখিলের মৃত্যু, অরবিন্দের আবার গ্রেপ্তার, সুনিত, নির্বেদ, নীলাদ্রির মাঝ-রাতে গ্রেপ্তার—সব মিলিয়ে কেমন যেন গুলিয়ে গেল। ট্রাকের পর ট্রাক পুলিশ যাচ্ছে কলেজ স্ট্রীটের দিকে, আজ আর অনশন নেই—নিখিলের মৃত্যুতে ওরা অনশন ভেঙেছে সেন্টিনারী বিল্ডিংসে।

কলেজ স্কুলগুলো সব অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবুও ভীষণ উত্তেজনা আজ কোলকাতায়, একটা না বাজতেই ট্রামে আগুন লাগল শিয়ালদায়। আবার সেই কাঁদানে গ্যাস, গুলি। নৈহাটির একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার মারা গেল গুলিতে।

মেডিকেল কলেজ থেকে নিখিলের বডিটা গেল মর্গে। বেলা তিনটে নাগাদ এই গোলমালের মধ্যেই মর্গ থেকে ডেড বডিটা নিয়ে শ্যামলদা, বিমল মেডিকেল কলেজের লনে চলে এল।

সেখানে সব নেতারাই কড়া পুলিশ পাহারায় এসে হাজির, শুধু মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন নি। তিনি একটা বাণী পাঠিয়েছেন শোকার্ত পরিবারের উদ্দেশ্যে। অনিমেষ সেই সরকারী বাণীর কাগজটা নিয়ে নিখিলের বাবাকে দিল।

নিখিলের বাবা-মার সব কিছু বুঝতে কেমন যেন অসুবিধে হচ্ছিল। ডাক্তার লেনের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। জীবনে যারা মন্ত্রীর পাশে দাঁড়াবার সুযোগ পায় নি তাদের ছেলের জন্য এত মন্ত্রীর আনাগোনা, এত কাগজের লোক, এত গাড়ি, এত কিছু সব যেন অবাক করে দিচ্ছে। নাটক দেখছে না তো নিখিলের বাবা। নিখিল কি এত ইম্পর্ট্যান্ট ? হতভাগ্য নিখিলের বাবা জানেনা যে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থ পূরণ করতে এ ধরনের ক'টা লাশের প্রয়োজন হয় ? মন্ত্রীদের চোখে জল। সিনেমার হিরোইনদের মত। শুটিং শেষ হলেই পেইন্ট মুছে, চোখ মুছে ওরা বাড়ি চলে যায়। মন্ত্রীরাও তাই, ক্যামেরার মুখের সামনে থেকে সরে গেলে, এখান থেকে লাশ শ্মশানে চলে যাবার পর এগার নম্বর ডাক্তার লেনের নিখিল নন্দীর বাবার খবর রাখবার প্রয়োজন নেতাদের আর থাকবে না। একজন মন্ত্রী অনিমেষকে ডেকে বললেন, ওদের ফ্যামিলিতে খবরটা একটু দেবে। দেখি আমরা কিছু করতে পারি কিনা। বিমল এক কোণার

চুপ করে দাঁড়িয়ে।

সবার মালা দেওয়া শেষ, ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল সুমিত্রা। হাতে সামান্য কয়েকটা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। নামিয়ে রাখল নিখিলের শিয়রের কাছে। মুখ নিচু করে এসেছিল, কিছুক্ষণ ওর মার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পরেই চলে আসছিল। বিমল ডাকল—সুমিত্রা তুমি কেমন করে যাবে? গাড়ি ঘোড়া বেশী একটা নেই, তোমায় পৌছে দেবার ব্যবস্থা করে দেব?

না, দরকার হবে না। আচ্ছা বিমল বলতে পার কবে ইউনিভারসিটি খুলবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

যা-ই ডিসিশান নাও, নিখিলদের বারে বারে মরতে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার চেষ্টা কোরো না। বলেই সুমিত্রা চলে গেল।

একজন নেতা বললেন বিমলকে, মেয়েটি কে? বেশ ধারালো কথা বলে। আমাদের এ্যান্টি পার্টির?

না, না, ও কোনো পার্টি করে না। ও-ই কালকে নিখিলকে নিয়ে এসেছিল হসপিটালে।

* * * *

আজ কলেজ স্ট্রীটের হাঙ্গামা কম হয়েছে। মধ্য কোলকাতা থেকে উত্তর কোলকাতার দিকে হৈ চৈ বেশী হয়েছে। তবুও ট্রাম একেবারেই চলছে না বললেই চলে। বাসের রুটগুলোও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুমিত্রা ভাবল, একবার প্রফেসার সেনের বাড়ি থেকে ঘুরে গেলে কেমন হয়। ইউনিভারসিটি কবে খুলবে ঠিক নেই। সেই সঙ্গে ক্লাশ লাইব্রেরী সব বন্ধ। বরং নোটগুলোর খোঁজ নিলে ভাল হয়। প্রফেসার সেন গনেশ এভিনিউতে হিন্দ সিনেমার কাছে থাকেন। একটু পরে দিব্যি হেঁটে যাওয়া যাবে। সব লোকই তো হেঁটে যাচ্ছে। হেঁটেই প্রায় প্রফেসার সেনের বাড়ি এসে পৌছল সুমিত্রা। কলিং বেল টিপতেই চাকর এসে ঘর খুলে বসতে বলল। মিনিট দশেক পরেই প্রফেসার সেন এলেন। স্যার, আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম অসময়ে। সুমিত্রা বললে।

না, না, তাতে কি হয়েছে। বসো। তোমাদের পড়াশুনো হচ্ছে না। আমাদের কাজ নেই। তা হঠাৎ আজ এদিকে কেন মা? গতকাল আর আজ তো তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে। প্রফেসার সেন অধৈর্য হয়েই বললেন, তোমার এসবের মধ্যে থাকা ঠিক হয় নি মা। যতসব বাজে ঝামেলা। ছেলেদের দোষ দেব আর কি? গণ্ডা গণ্ডা পাশ দিয়ে বেরোচ্ছে। চাকরী নেই, কাজ নেই, বেকার হয়ে সব ঘুরছে। আমার এক এক সময় পড়াতেই লজ্জা করে। কি ছাই

পড়াব মা। তোমাদের না হয় বিয়ে হয়ে যাবে। যে কোনো একটা ঘরে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ছেলেগুলো যাবে কোথায়? পড়ার কোনো চার্মই রইল না। প্রেসিডেন্সীর ব্যাপারটা না হলে বোধ হয় ইউনিভারসিটি বন্ধ হতো না স্যার। সুমিত্রা বলে।

না, বন্ধ তোমার এমনিও হতো আজ বা কাল। যা জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে পলিটিক্যাল পার্টিদের এই তো সময়। এ সময়ে কেউ চুপ করে থাকে? তবে হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সির ব্যাপারটা একটু হেস্টি হয়ে গেছে। কোন্ ছেলে কোন্ মেয়েকে কি বলেছে এসব নিয়ে কি এখন হৈ চৈ করার সময় আছে? একি আগের দিন নাকি? এখন খেতে পরতে দেবার, চাকরী দেবার কথাই বলতে পারছি না। শুধু আচার আচরণ চরিত্র নিয়ে কত আর জ্ঞান দিয়ে মরব?

সুমিত্রা একটু হেসেই ওঠে—স্যার আমি কিন্তু এসেছিলাম নোটগুলোর জন্য।

আজ থাক মা। আজ বরং একটু চা খেয়ে যাও। তবু তো যা হোক এলে তাই। তা না হলে চুপ করে বসে থাকতুম।

সুমিত্রা চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে কলুটোলার কাছে এসে একটা বাসে উঠে পড়ে সুমিত্রা। আজ কোনো কাজ হলো না।

ডাক্তার লেনে এখন ভীষণ ভীড়। নিখিলের শেষ কাজ করে সবাই পাড়ায় ফিরেছে। নিখিলের মা ও বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত প্রতিবেশীর দল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়তে লাগল। পুলিশও এলো। জাগরণী ক্লাবের উপর বোমা পড়েছে। নিখিলের সমর্থকরাই হামলা করছে জাগরণীতে। ওরা নাকি কালো ব্যাজ পরতে অস্বীকার করেছে। দলগতভাবে ওরা নিখিলকে খুব একটা ভাল-বাসত না। জাগরণী ক্লাবের ঘরে ভাগ্যিস কেউ ছিল না। ডাক্তার লেনে পুলিশ ছেয়ে গেল। তালতলার ও-সি নিজেই এলেন ক্লাবটির কাছে। যারা বোমা মেরেছে তারা আর কেউ নেই। সবাই গা ঢাকা দিয়েছে।

একজন ছেলে নিখিলদের বাড়ি ছুটে আসছিল। নিখিলের কাকা দরজায় দাঁড়িয়ে ধরে ফেললেন ছেলেটিকে।

ছেড়ে দিন সুধীর কাকু, শালা পুলিশ আসছে। ছেলেটি বলে উঠল।

কেন এসব করছিস বল তো? সুধীরবাবু বললেন।

দৌড়তে দৌড়তে ছেলেটি বলে গেল, বদ্‌লা নিতে হবে কাকু, বদ্‌লা। নিখিলের বদ্‌লা চাই-ই।

ডাক্তার লেনের গলি দিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

পুলিশের জীপটা এসে থামল একেবারে নিখিলের বাড়ির দোর গোড়ায়।

নিজে একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। বাড়িতে ভিড় তখন। কান্নার রোল পড়েছে। কিছুক্ষণ থেকেই পুলিশের জীপটা চলে গেল। ডাক্তার লেন নয়, গোটা তালতলা পাড়াতেই আজ উত্তেজনা চলবে। বদ্‌লা চাই—বদ্‌লা চাই। মারকা বদ্‌লা মার হ্যায়! খুনকা বদ্‌লা খুন হ্যায়!! কোলকাতায় নূতন সর্বনাশা গানের রাগ বেজে উঠল এই প্রথম। বদ্‌লার এই গান সুর না বাঁধতেই আগস্টের শেষে বসিরহাটে পুলিশের গুলিতে মারা গেল নুরুল ইসলাম। কৃষ্ণনগরে তিন ইঞ্চি বুলেট বুকের ছাতিটা উড়িয়ে দিল আনন্দ হাইতের। মদনপুরে ট্রেনে আগুন লাগল।

মজা করে পান চিবিয়ে পুলিশের কয়েকজন বড় কর্তা বললেন, কৃষ্ণনগর ডুবু ডুবু, শান্তিপুর ভেসে যায় রে।

ভেসে গেল কত ছেলের ঘর বাড়ি। নুরুল ইসলামের মায়ের কান্না, আনন্দ হাইতের মায়ের চোখের জল, নিখিল নন্দীর মায়ের কান্না ছাপিয়ে তবুও আওয়াজ বেড়েই চলল, বদ্‌লা চাই! রক্ত চাই! প্রতিবাদ না—প্রতিশোধ চাই।

সি-আর-পির বুটের তলায় বাহুরিয়ার ঘাসে চাপ চাপ রক্ত। প্রিজন ভ্যানের মেঝেতে নির্বেদের রক্ত। লালবাজারের সেণ্ট্রাল লক্ আপে ধুঁকছে এখন নির্বেদ!

বাংলার খড়ের গাদায় আগুন জ্বলে উঠল। ঘরের ছাউনিতে সে আগুন এখন প্রবেশ করছে। সব পুড়বে—অথচ কোন দলের কাছেই এখন দমকল নেই।

॥ পাঁচ ॥

গান্ধী কলোনী!

'যুগান্তর', 'অনুশীলন'-এর অগ্নিযুগের যাঁরা মানুষ তাঁরা এসেছেন এখানে। কেউ কেউ ছিন্ন মূল হয়ে। বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকার লোকই বেশী। মুকুন্দ দাস, যতীন সেনের একাধিক অনুগামী আছে গান্ধী কলোনীতে। আকাশে বাতাসে পূর্ব বাঙলার মাটির ঘ্রাণ আর সহজ স্বাভাবিক জীবনের ছবি না থাকলেও গান্ধী কলোনীর ভাষা আর সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার ছবিগুলো মাঝে মধ্যে এ বাড়ি ও বাড়ির আচার অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে। গান্ধী কলোনীর বাসিন্দা অনেকেই রয়েছেন আত্মীয় পরিজন নিয়ে। কেউ আবার পূর্ব বাংলার একই পাড়ায় ছিলেন। এদের প্রতি সমাজ ও সরকার

যে ইংরেজী নামে সম্বোধন করে তা হলো 'রিফিউজী।' একটু কায়দা করে একজন বড় নেতা সংক্ষিপ্ত করে বলেন রেফুজী। মজাটা এখানেই যে রেফুজী কলোনীর যাঁরা বাসিন্দা তাঁরাও এই নাম শুনে অভ্যস্ত হয়ে আছেন, বরং এ নামের সেন্টিমেণ্টে নেতা মন্ত্রী এদের সুড়সুড়ি না দিলে এদেরও অভিমান হয়। হায়রে আমার দেশ। কার্তিক মাসে খেজুরের রস খাওয়া বাঙালী, বোশেখের আমবাগানে ঝড়ের রাতে আম কুড়োবার বাঙালী, অগ্রহায়ণের নবান্নের বাঙালী, পদ্মার ইলিশ মাছের বাঙালী যখন ওপার ছেড়ে এপারে এলো, তখন শিয়ালদা স্টেশনে মাদুরে বাঁধা বিছানা, ফুলকাটা টিনের স্যুটকেশ, ছাতা আর বিছানার সঙ্গে বাঁধা একটা হ্যারিকেন। অন্ধকারে পথ দেখতে হবে তো! হ্যারিকেন চাই যে।

কোলকাতার এত আলোতে এখনও গান্ধী কলোনীতে কত অন্ধকার। রেফুজী কলোনীর এই উদ্বাস্তুরাও কিন্তু কলোনীর প্লট ভাগাভাগির সময় বাস্তুপূজা করে—বাস্তু দেবতাকে—ভিটের রক্ষা কর্তাকে।

উদ্বাস্তুর ভিটেতে বাস্তুদেবতা এসেছিল কিনা সুধীরবাবুও জানতেন না। তবু এই ভিটেতে থেকেই তিন-তিনটি ছেলেকে পড়িয়েছেন। দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

রেফুজী কলোনীর মেয়ে, কাজেই ওপার বাঙলার কৌলিন্য গর্ব যাই থাক এপার বাঙলার জোবচার্ণকী আদব কেতাবের কাছে কলোনীর মেয়ের খুব ভাল পাত্র জোটে কি। সুধীরবাবুর শখ ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের খুব বড় ঘরের নামী পাত্রের হাতে মেয়েকে দেবেন। কিন্তু ঐ যে নেকলেশ ঝুলছে গলায়, মুক্তোর নেকলেস, টসটসে হাজার চোখের জলের ছিন্নমূল বাঙালীর কান্না, বাস্তু ছেড়ে এসে কাঁদতে গিয়ে সেই যে চোখের জলের ফোঁটায় মুক্তোর মতো নেকলেশ হয়ে রইল সারাজীবন গলায়—মীনে করা খোদাই করা নাম 'রেফুজী।' এই নেকলেশ নিয়ে, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার যাই থাক পায়রা ওড়ানো কোম্পানী কোলকাতার সভ্যতায় জোবচার্ণকী সমাজে কলোনীর মেয়ের নাকি স্ট্যাটাস নেই।

দিল্লীতে অবশ্য ডিফেন্স কলোনী আর ভূপালের প্রফেসার্স কলোনীর ইজ্জত আছে। কারণ সেখানে বাস্তু আছে অনেকের যাঁরা উদ্বাস্তু নয়। কিন্তু বাস্তুগুলো এত সব উদ্বৃত্ত সম্পদে ভরা যার পরিমাণ আয়কর দফতর এখনো করে উঠতে পারে নি। গান্ধী কলোনীতে তাই ডিফেন্স কলোনী প্রফেসরস কলোনীর স্ট্যাটাসের ছেলে পাওয়া মুশকিল।

সুধীরবাবু এক ছেলেকে অনেক কষ্টে স্কলারশিপ পাইয়ে বিলেতে পাঠিয়েছেন। লণ্ডনের স্কুল অব ইকনমিক্স-এ আরও একটা ডিগ্রী আনবে। সুধীরবাবুর ছেলে সত্যেন একবার চিঠি লিখেছিল ওর বাবাকে লণ্ডন থেকে। সে কথা সুধীরবাবু গান্ধী কলোনীর সবাইকে শুনিয়েছেন। সত্যেনের চিঠিগুলো সুধীরবাবুর কাছে গান্ধী কলোনী নামেই পোষ্ট হতো। একবার ওর বন্ধু ঠিকানা দেখে সত্যেনকে বলেছিল, হাউ গ্রেট ইউ আর, ইউস্টে অ্যাট গান্ধী কলোনী! সত্যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। ওর বন্ধুটি আফ্রিকান। ও ভেবেছিল গান্ধীর নামে কলোনী, না জানি কি বিরাট ব্যাপার, হয়তো সবচেয়ে ভালভাবে থাকবার কোনো বন্দোবস্ত। ওর বন্ধু সত্যেন হেসে বলেছিল, জেম্সের দেশে গান্ধীর নামে এখনও নাকি প্রচণ্ড সম্মান আফ্রিকায়। আমাদের দেশে হাজার হাজার মহাপুরুষের নামে রাস্তাঘাট, বাড়ি, কলোনী, স্কুল কলেজ আছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কাপুরুষেরা সেখানে রোজই সমাবেত হয়। মাথা গোঁজার জন্ত মারামারি করে। জেম্স অবাক হয়ে শুনল সব।

সুধীরবাবু একথা বলেছিলেন কলোনীর সবাইকে। সবাই তো হেসেই খুন। কিন্তু সুধীরবাবু কেঁদেছিলেন, কারণ সুধীরবাবু যে গান্ধীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অভয় আশ্রমে কতদিন গিয়ে চরকা কেটেছেন সুধীরবাবু তার ইয়ত্তা নেই।

সুধীরবাবু শিশুমঙ্গল থেকে সুস্থ হয়ে গান্ধী কলোনীতে ফিরে এলে অনেকেই খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। কলার বোন ভেঙ্গে গেছে বুড়ো বয়েসে, তারপর মাথাতেও বেশ ভাল আঘাত পেয়েছেন। বেশ রক্তপাত হয়েছে দিন কয়েক। ভয়ের ভাবটা কেটে যেতে ডাক্তাররাই ছেড়ে দিয়েছেন ওঁকে। রঞ্জনই সুধীরবাবুকে নিয়ে এসেছে।

রঞ্জন এম-এ পাশ করে বেকার বসে আছে দুবছর। মাঝে মাঝে দু'একটা টিউশানী করে। ছোটভাই স্বপন এরিয়ান্সে খেলে আর ব্যাঙ্কে কাজ করে। সেই ভোর থাকতে ময়দানে চলে যায় প্র্যাকটিস করতে।

স্বপন অবশ্য খবর পাবার পরদিন থেকেই ফুঁসছিল। যদি জানতে পারত কারা এমনটা করেছে তাহলে বোধ হয় আস্ত চিবিয়ে খেত। রাজনীতির ধার স্বপনও ধারে না। তবুও বাবার কাছে যখন ঘটনাটা শুনছিল তখন বাধ্য হয়েই গালমন্দ করেছিল এ্যান্টি-গভরমেণ্ট পার্টিগুলোকে। কলোনীতে এই নিয়ে দু'একদিন উত্তেজনাও ছিল। কিন্তু কিছুই হয় নি তেমন করে। রায়গড় কলোনীর নীতু এসে বলে গিয়েছিল স্বপনকে—দরকার হলেই খবর

দিবি। গুঁড়িয়ে দেব শালাদের। পুলিশ সঙ্গে আছে। এক রাউণ্ড রেখে নিতে চাই।

নীতু যাদবপুর ব্যায়াম সমিতির সেক্রেটারী। স্বপনের স্কুল জীবনের বন্ধু। স্বপন অবশ্য অতটা তখন মাথা ঘামায় নি। সুধীরবাবু ফিরে আসার পর প্রতিবেশীর আহা উহুতে টেনশন বেশ বাড়ল। সুধীরবাবু একটা দলের নাম করে বললেন, এদেরই জন্য আমার আজ এই অবস্থা।

রতন সামলে রেখেছে অনেকটা। এসব ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করতে কাউকে দেয় নি। বুঝিয়েছে সুধীরবাবুকে, দিনকাল বদলেছে বাবা, তুমি এমন করে কেন ভাবো বলো তো, অনেক করেছ দেশের জন্য তার বিনিময়ে পেলে কি? আজও জমির অর্পণ-পত্রটাও তো পেলাম না। কোথাও কিছু একটা হয়েছে তো অমনি বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল। সরকারই বা কি অমৃতের ভাণ্ড এনেছে আমাদের সামনে?

সুধীরবাবু রেগেই গেলেন, 'কি?' লাভ লোকসানের কথা ভেবে দেশের কাজ করেছি বলতে চাস? কি পেয়েছি, কি পাইনি, তাতে তোদের কি? তোদের পড়াবার জন্য স্টাইপেণ্ড দেয় নি গভরমেণ্ট? বিধান রায় না থাকলে মাথা গোঁজার জায়গা পেতাম? শেয়ালদাতেই পচে মরতাম। বড় বড় কথা বললেই হলো না। গভরমেণ্ট চালাতে গেলে ঝামেলা কত তুই কি বুঝবি?

তুমি খামোখা রেগে যাচ্ছ বাবা। আমি বলছি আমাদের এ অবস্থার কথা। দেশ ভাগ হলো এসবের জন্য দায়ী কে? বিধানবাবু একলা কত করতে পেরেছেন? শেয়ালদায় এসে কত মেয়ে বাধ্য হয়ে পতিতালয়ে চলে গেছে, তুমি জানো? রেফুজী বলতেই এরা নাক সিঁটকে ওঠে তা জানো?

রতনের কথার প্রতিবাদ করেন নি সুধীরবাবু, শুধু বলেছিলেন, সে জন্য আমরা কি করব? কলোনী কমিটিতে আমরা সবাই তো ছিলাম। সব দল মত নির্বিশেষে। কিন্তু আমরাই কি সভতা রাখতে পেরেছি? প্লট নিয়ে আমরাই কি মারামারি করি নি? রতনের মা এসে পড়তেই চেঁচামেচি থামল। রতন সুধীরবাবুকে ওষুধ খাইয়ে, জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে সুধীরবাবু বালিশের তলা থেকে কয়েকটা কাগজ আর প্রেসক্রিপশানের ভাঁজ থেকে একটা ঠিকানা বের করে দিলেন রতনকে। বললেন—একে একটা খবর দিয়ে জানাস, আমি বাড়ি এসেছি।

ভাল আছি। মেয়েটি আমার জন্য খুব করেছে। মেয়েটি না থাকলে ঠিক সময়ে হসপিটাল যেতে পারতাম না।

রতন পড়ে নিল সুমিত্রার ঠিকানা।

বেশী দূরে নয়—কাছেই, গোলপার্কের কাছে। ভাবল নিজেই গিয়ে বলে আসবে। ওদিকে টিউশানীতেও যেতে হয় রতনকে। রতন মর্মাহত বাবার এই অবস্থা দেখে, কিন্তু নিজেও কিছুতেই মানিয়ে উঠতে পারছে না এ অবস্থাকে। সারা জীবন কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে মন দিয়ে পড়ে শেষকালে নিওন আলোর নীচে কোনো বড়লোকের ছেলেকে সপ্তাহে তিনদিন পড়িয়ে পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর টাকা রোজগার, একেবারে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। তপতপে হাওয়া শুরু হয়েছে রাজনীতির। বোধহয় ধ্বস নামবে। তাহলে রোজ রোজ এত হামলা, হাঙ্গামা আর পুলিশ—এ সবের বাড়াবাড়ির কোনো দরকার ছিল না। কলোনীর ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া বা গায়ে পড়ে খুটখাট ঝগড়া বাধানো, কোনো ব্যাপারেই রতন থাকে না। কালেভদ্রে এক আধ দিন বিকেলের দিকে কলোনীর মাঠটায় গিয়ে বসে। রতনের মা এর জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠেন প্রায়ই। একদিন রতনের বাবাকে বলেই ফেললেন, রতনের মতিগতি বুঝতে পারছি না, কি যে হবে ওর ছাই! আজও একটা চাকরী হলো না।

চাকরি যেন হাতের মোয়া! আর দশজন কষ্ট করছে না? বেকার কি কম নাকি দেশে? সুধীরবাবু একেবারে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন।

রাখ তো তোমার স্বদেশীপনা। অনেক তো করেছ! কে দেখতে এসেছে তোমায় শুনি? স্বদেশীর গল্প মারা রাজা উজীরের। রতনের মা-ও কম যান না। সত্যেন অবশ্য প্রায়ই রতনকে না ভাববার জন্য ভরসা দিয়ে চিঠি লেখে। সত্যেনও নাকি রতনের জন্য চেষ্টা করছে ওখানে। একটা কিছু হলেই খবর দেবে।

টিউশানী সেরে সুমিত্রাদের বাড়িতে গেল রতন। কলিং বেল টিপতেই সুমিত্রার বৌদি এসে দাঁড়াল।

সুমিত্রা দেবী আছেন?

হ্যাঁ, আছেন, আপনি কে বলুন তো?

আমায় আপনি বা উনি কেউ চিনবেন না। আমার বাবা ওনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।

বেশ তো বসুন! ডেকে দিচ্ছি। একটু পরেই সুমিত্রা বেরিয়ে এল।

নমস্কার! রতন দাঁড়িয়ে উঠে বলল।

বসুন বসুন, নমস্কার। কোত্থেকে আসছেন?
আমি সুধীর গুপ্তর ছেলে। সেই যে বাস থেকে পড়ে গিয়ে···
হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা কেমন আছেন উনি? ভাল হয়ে গেছেন তো?
হ্যাঁ, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আপনার কথা বলছিলেন। আপনার একবার সময় হলে যেতে বলেছেন।
আচ্ছা নিশ্চয়ই যাব। বাব্বা। সেদিনের কথা মনে হলে গায়ে জ্বর আসে। সে দিনটা যা গেছে একটার পর একটা।
দোষটা অবশ্য আমার বাবারই। কেন অমন করে বলতে গেলেন। যা দিনকাল, এভাবে বলার কোনো মানে হয়? রতন বলে।
এটা কিন্তু ঠিক বললেন না। যেখানে যার যা খুশী তাই হবে? প্রতিবাদ করবে না কেউ?
কিসের প্রতিবাদ বলুন, মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেই যা খুশী তাই বলে।
একটু হেসে সুমিত্রা বলে, আপনি পলিটিক্স করেন বুঝি?
সাধারণ কথা বুঝতে এবং বোঝাতে পলিটিক্স করার কি দরকার বলুন।
আমি বাপু এসব বুঝি না। তবে কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি হলে একটু আধটু বলা দরকার।
আমার চোখের সামনেই এক রকম নিখিল নন্দী মারা গেল।
ও, সেই কলেজ স্ট্রীটের ব্যাপার বলছেন? সে তো এখনও থামে নি। আপনি নিখিলেরটা দেখেছেন আপনার কষ্ট হয়েছে। যারা চোখের সামনে নুরুল ইসলামকে দেখেছে গুলি খেতে, তাদের কষ্ট তাদের কাছে—কেউ আনন্দ হাইতকে দেখেছে কৃষ্ণনগরে গুলি খেতে, তাদের কাছে আনন্দর স্মৃতি!
এগজ্যাক্টলি, কিন্তু এসব করে কোনো লাভ হবে কি?
যখন লোকসানের অর্থটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, তখন লাভের কথা কে ভাবে বলুন। আচ্ছা আমি আজ উঠি, আপনি কিন্তু যাবেন। বাবা তো আপনাকে একেবারে ত্রাণকর্ত্রী বানিয়েছেন।
আমিও আমাদের বাড়ীর তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে।
না, না, আমি আবার কি করেছি। আমি কিছু করিনি। তাছাড়া আরও ছেলে ছিল, তারাও করেছে।
রতনকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে এসে সুমিত্রা একটু খুশিই হলো। অন্ততঃ এধরনের টুকটাক কাজ করলে কেউ কেউ নাম করে। বাড়িতেও আসে। পরোপকারের বেশ একটা আনন্দের অনুভূতি এলো সুমিত্রার মনে।

॥ ছয় ॥

কলেজ স্ট্রীটের সেই হাঙ্গামার পর কলেজগুলো খুলেছে। ইউনিভারসিটিও খুলেছে। প্রেসিডেন্সীতে দুচার দিন সামান্য হৈ চৈ হয়েছে, তারপরেই সব নর্মাল হয়ে গেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সব কয়জন নেতা, যাঁরা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন গ্রেপ্তার হয়েছেন। অরবিন্দ সেনকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়েছে। কোলকাতায় মিছিল তবুও কমে নি। প্রায় সব ক'টি জেলাতেই কিছু না কিছু বিক্ষোভ হয়েছে। আজ ময়দানে সভা হবে। অকংগ্রেসী সব ক'টি দলই যোগ দেবে সভাতে। নুরুল ইসলামের মা এসেছেন। তাঁকেও মঞ্চে রাখা হবে। আনন্দ হাইতের স্ট্যাচুতে মালা দেবার জন্য একদল যাবে কৃষ্ণনগরে আগামীকাল। সেখানেও বিরাট সভা।

গত সপ্তাহে রানাঘাট মিউনিসিপাল ময়দানে কংগ্রেসের সভা ভেঙ্গে গেছে। প্রচণ্ড বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ সভা করতে সাহস করেনি।

রানাঘাটের সম্মানিত নাগরিক বিনয়চৌধুরীও রেহাই পাননি। যেদিন মদনপুরে ইলেকট্রিক ট্রেনে আগুন লাগল সেদিন তো শুভঙ্কর দাসবাবুকে বিক্ষোভকারীরা একেবারে মাইলের পর মাইল দৌড় করিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজের তাড়া খেতে এবং ইংরেজকে তাড়া করতে যতটা না দৌড়তে হয়েছে তার থেকে বেশী দৌড় করতে হয়েছে এ যাত্রায়। শুভঙ্করবাবুর নয়া দৌড়। তারপর বাড়ী ফিরে সেই যে খদ্দর ছেড়েছেন আর ব্যবহার করেন নি। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শুভঙ্করবাবুর খদ্দর প্রীতির সাময়িক অবসান হলো। ফজলুরদার বাড়ি পুড়ে গেছে। এত ক্রোধ কেন? সম্পাদকীয় কলমগুলোতে কেউ খুলে লিখছে না। বাবট্রির পর এক রাউণ্ড চীনের দালালদের দেখে নেওয়ার মহড়া সরকার এবং সরকারী দলের তরফ থেকে হবার পর কম্যুনিষ্ট পার্টিটাই যা ভাগ হয়েছে মাত্র, কিন্তু সরকার-বিরোধী শক্তির প্রাবল্য এত প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়েছে যে, যে কোনো ছোট ঘটনাতেই পুলিশকে গুলি চালাতে হচ্ছে। সি-আর-পি নামে অভিনব একটা শক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের আছে সবাই জানে, কিন্তু তাদের দৌরাত্ম্য, প্রয়োগ, কৌশল আর সেই শক্তির সঙ্গে সবার পরিচয় হবার সুযোগ হলো এবারই। সাবাস্ সি-আর-পি, ভাষা বোঝে না, লোক মানে না, হৃদয়বৃত্তি নেই, যেন দেশটা বিদেশীর হাতে আছে এমন ভাব। তাদের গাইড করছে বীর্যহীন, ধৈর্যহীন, কর্মহীন, শক্তিহীন কাপুরুষতার প্রতিমূর্তি, ক্রৌজছাড়া,

ঢলঢলে প্যান্টপরা, পোনামাছ্ আর মাংসের কষা খাওয়া, পেটমোটা কয়েকটা বাঙালী দারোগা। এদের কোমরের বেল্ট বুক পর্যন্ত উপরে উঠেছে চর্বির ঔদ্ধত্যে। সাহেব মার্কা এস-পি, ডি-এস-পি-র দল। এরা পুলিশ ক্লাবে বব্ ছাঁট করা, সাহেব মার্কা, অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মেমবৌগুলোকে বোঝায় তাদের ক্ষমতা কত।

গাড়ির ড্রাইভার থেকে পুলিশ ক্লাবের লাটবাগানের খানসামা যখন বলে মেমসাব আর ছোট সাব, বড় সাব—তখন ইংরেজের এঁটো ভর্ত্তির হুইস্কীর অর্ধবোতল বা আধ পোড়া চুরুট দেখলে রায় বাহাদুরের চাকররা যেমন উল্লসিত হতো—তেমন উল্লসিত হয়ে পড়ে সাহেব মার্কা, ববছাঁট করা বাঙালী মেমসাহেবানের দলেরা।

ক্যালকাটা ক্লাবে একদিন হোম সেক্রেটারীর মেম সাহেবানি পুলিশ কমিশনারকে বলে বসল, ইজ নাউ গভারমেণ্ট কার্ড আন পপুলার?

কমিশনার তো থতমত খেয়ে বলল, নো ম্যাডাম, হোয়াই ম্যাডাম, অল পারফেক্ট ম্যাডাম।

ও:! এত্ রিডে সাম ট্রাবল ইন্ দ্যা সিটি! আই কাণ্ট স্ট্যাণ্ড।

না, না তেমন কিছু নয় ম্যাডাম। এসব জিনিস ছদিনে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

প্রেসিডেন্সী রেঞ্জের ডি-আই-জি'র গিন্নি বলে উঠলেন, এসব স্টুপিডদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। রিফুজী কলোনীর ছেলেরাই বেশী মেতেছে এ আন্দোলনে। আমার সাহেব তো তাই বললেন।

কোলকাতা ক্লাবের মদের আসরে ভালোমন্দ সবাই আছেন। সি-আর-পি কমাণ্ডাণ্ট পাঞ্জাবী অফিসার অরোরা বেশী খেয়েছেন। তাঁকে ডি-আই-জির স্ত্রী আর হোম সেক্রেটারী ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দিল।

অরোরা কিন্তু ডি-আই-জির স্ত্রীকে ছাড়ল না—প্লিজ কাম উইথ মি। এসব ব্যাপারে কমাণ্ডাণ্ট সাহেবের জ্ঞান টনটনে। ডি-আই-জির মেমসাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। অরোরা সাহেব কোথায় গেলেন সে ঠিকানা কেউ রাখলেন না। ডি-আই-জি সাহেব নিজে সেদিন ক্লাবে আসেন নি। তিনি সেদিন বারুইপুরের বাগানবাড়িতে অন্য কাউকে নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই কেউ কারো ঠিকানা রাখতে এত ব্যস্ত নয়। পুলিশের যে অফিসারেরা এই আসরে আসতে চান না তাদের লালবাজারের ভাষায় আনস্মার্ট বা হাফ কালচারও বলা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা, নিয়ম মাফিক কাজ। ফাইলগুলোকে আরও শক্ত করে বাঁধা মহাকরণে। যেন কোন তথ্য বেরিয়ে না যায়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে যে আভিজাত্য নষ্ট হয়ে গেল অফিসারের। দশদিন খেতে তিরিশ

দিন যাক। তারপরে না হয় ফাইল সরবে। পাবলিক চেল্লালে কি আছে তাতে। পুলিশ আছে—হানড্রেড ফরটিকোর আছে। কার্ফু আছে। ডি-আই-আর আছে। পি-ভি-অ্যাক্ট আছে। আর সর্বোপরি সি-আর-পি আছে। তাই ব্যুরোক্র্যাসি জিন্দাবাদ, লাল ফিতে লং লিভ।

এর পর কোলকাতা ক্লাবের রাত। দুদিন দীঘা বীচ, গ্র্যাণ্ডের ক্যাবারে, বারুই-পুরের বাগানবাড়ি—সব মিলিয়ে ইংরেজ রাজত্বের কুঠিবাড়ির অর্ধেক সুখ বহাল। এটা অবশ্য চাকরীর বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে না। কিন্তু এটা ধরে নিতে হয়।

ওদিকে—মায়াপুরের লাঙল যার জমি তার, উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন, বেকারের চাকুরি—এগুলো সব দিল্লী আর কোলকাতার মোজেইক ফ্লোর, লাল ইঁট, আর লাল কার্পেটের ঘরগুলোতে রিকাইণ্ড হচ্ছে। বড় ফাইলগুলো এয়ারকণ্ডিশান ঘরের স্ট্রং রুমে রেখে দেওয়া আছে। খুব গরম দুধের মতো প্রচণ্ড উত্তপ্ত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত তো। তারপর গরীবের পেটে আগুন। উত্তপ্ত জিনিস ঠাণ্ডা না করে মুখে দিলে মুখ পুড়ে যাবে যে। তাই ঠাণ্ডা করা হচ্ছে ফাইলগুলোকে। রাইটার্সের বাইরে ঠাণ্ডা নেই। এমন কি লালদীঘির জলও গরম। মিছিল গরম, রাস্তার পিচ গরম, বন্দুক গরম, সি-আর-পির মাথা গরম, কোলকাতা ক্লাবের হুইস্কি গরম, বড়বাজারের নোট গরম, ক্যাবারে গরম। এত গরমে মদনপুরে ইলেকট্রিক ট্রেন পুড়বে, ফজলুদার বাড়ি পুড়বে এ আর এমন কি।

তবুও কাঁচা দূর্বা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশী জোরে না হেঁটে আস্তে আস্তেই বাদুরিয়া, স্বরূপনগরে নুরুল ইসলাম, কাজল হালদার, নিমাই মণ্ডলরা কেরোসিন চেয়েছিল, চাল চেয়েছিল। ওদের অপরাধ ছিল না—ওরা কোনো দলকে ডাকেনি। কোন্ ঝাণ্ডা ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা কেমন করে দেখবে? ওরা চিৎকার করছিল—ব্যস সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

আব্বাজানের দোয়া, পীরের দরজায় মানত করা নুরুলের মায়ের প্রার্থনা, রমজানের এত রোজাও নুরুলকে বাঁচাতে পারল না। থি-নট-থির বুলেট একেবারে দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। কিন্তু কি হলো? নুরুলের মৃত্যুতে বসুমতীর সেল বাড়ল। নুরুলের মৃত্যু আরও কয়েকজনকে মরবার প্রেরণা জোগাল, অরবিন্দ সেনদের জেলে নিয়ে গেল। বড় নেতাদের মুক্তি দিয়ে দিল। কিন্তু ঘরে ঘরে কেরোসিন পৌঁছে দিল না। সেই অন্ধকারে 'কিশলয়', 'বর্ণপরিচয়' শিশু শিক্ষার পরিচয় করানো গেল না।

সুমিত্রার পড়ার ঘরের নিওন লাইটের আলো প্রায়ই নিভে গেল। বিদ্যুৎ সঙ্কট হয়েছে কোলকাতায়। মাঝে মাঝেই মোম কিনে আনত সুমিত্রা গোল-

পার্ক থেকে। গান্ধী কলোনীতে হ্যারিকেনের আলোর জায়গায় অল্প অল্প ইলেকট্রিক আসছে। কিন্তু ভাঙ্গড়, বাসন্তী, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, মদনপুর, সন্দেশখালি, ক্যানিং, গোসাবায় : কেরোসিন চাই, না হয় কম দামে মোমবাতি চাই। সব কিছুরই প্রচণ্ড দাম। সাপের কামড়ের পরেও ওঝার বাড়ি খুঁজতে কেউ যায় না। কেননা হ্যারিকেন নেই। ভীষণ অন্ধকার! অথচ প্রতিদিন সাপের কামড়ে লোক মরে। মনসা পুজোর প্রভাব বাড়ে।

কোলকাতার এস-বি'র হোমরা চোমরা অফিসার বহরমপুর এসেছেন অরবিন্দকে আরও একটু ভাল করে বুঝতে। জেলারের ঘরেই নিয়ে যাওয়া হল ওকে। সুমিত্রার দাদা পরিতোষ চৌধুরীও এসেছেন টিমে। তিনিই ছিলেন গ্রেপ্তারকারী দলের প্রধান নায়ক।

পরিতোষ :—আপনি এসব আন্দোলনে কেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন?

অরবিন্দ :— বিশ্বাস করি বলে।

পরিতোষ :—দেশের সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। রোজ ছেলেরা মরছে—এসব কি আপনি সমর্থন করেন?

অরবিন্দ :—আন্দোলন একবার শুরু হয়ে গেলে অনেক কিছুই হতে পারে—তবে যে ঘটনা দুঃখজনক তার জন্য আফশোষ সবার সমান।

পরিতোষ :—আপনি কি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করাকেই আন্দোলন মনে করেন?

অরবিন্দ :—আমি কোন বিশেষ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছি না—সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়ছি। গণতন্ত্রের এই পথ বা কায়দায় কোনদিন এ-দেশের মানুষ সুখী হবে না।

পরিতোষ :—হাসালেন অরবিন্দ বাবু। এ সব গোলমালের ফয়দা তো নির্বাচনের ভোট পাবার জন্যই আপনারা করবেন—আর আপনি বলছেন···

অরবিন্দ :—খুব উত্তেজিত হয়ে অরবিন্দ বললে, না সে সব আমার পথ নয় —আমি ভোটের কথা ভাবছিনা।

পরিতোষ :—কিন্তু আপনার যে প্রবন্ধটা রেখে এসেছিলেন আপনার রুমমেটের কাছে সেটা তো ছাপা হবে। সেখানে কিন্তু বলেছেন যে জনগণ চূড়ান্ত রায় দেবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং তার দিন নাকি এগিয়ে আসছে।

অরবিন্দ :—তার মানে আমি নির্বাচন মীন করিনি, বিপ্লবের কথা বলেছি।

পরিতোষ :—নিখিল নন্দীকে কারা মারল?

অরবিন্দ :—জানি না।

পরিতোষ :—আপনি সেই মিছিলে অথচ আপনি জানেন না?

অরবিন্দ :—সব কিছু দেখা অতবড় মিছিলে সম্ভব হয় না।

পরিতোষ :—এই মৃত্যুতে আপনার কি মত?

অরবিন্দ :—ওদের মেরে কিছু লাভ নেই। ওরা শ্রেণী স্বার্থের একাংশের হাতের পুতুল মাত্র, শ্রেণী শত্রু নয়।

পরিতোষ :—আপনার মুক্তির ব্যবস্থা আমরা করতে পারি, কিন্তু আপনাকে মুচলেকা দিতে হবে—

অরবিন্দ :—আপনারা এতক্ষণ ভদ্র আচরণ করছেন তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু এখন যা বললেন তা দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করলে আপনাদের প্রতি আমার আচরণ বদলাতে আমি বাধ্য হব।

বহরমপুর থেকে ফিরে এসে এস-বি'র লোকেরা সোজা এলেন অরবিন্দর বাবার কাছে। তিনিই সেই প্রফেসর সেন, দর্শনের অধ্যাপক। যার কাছে সুমিত্রা প্রায়ই যায়।

প্রফেসর সেন একাই থাকেন। স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে অনেক কাল।

একমাত্র পুত্র অরবিন্দ সেন। বাবার সঙ্গে দূরত্ব রাখতে চায় বলেই—যাদবপুরের হস্টেলে থাকে। বাবা আজীবন স্বদেশী করা মানুষ। দেশের নানা ঘটনায় নিরপেক্ষ হলেও ভোটের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে কংগ্রেসের গায়ে ছাপ মেরে এসে বসে থাকেন।

প্রফেসর সেনের নাম একবার উপাচার্য হবার প্যানেলেও এসেছিল। কিন্তু কংগ্রেসী জায়গীরদারদের যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলদার, সিনেট বা সিণ্ডিকেটে তারা চূড়ান্ত পরীক্ষার পর নামটা বাতিল করে দিয়েছিলেন। পুত্র যেহেতু অন্য চিন্তার শরীক সেই হেতু বিচারের মাপকাঠিতে খাঁটি আগ মার্কা দেশভক্তের মাপকাঠিতে প্রফেসার সেনকে ফেলা যায় না বলেই তাঁকে উপাচার্য করা যায় না।

পুলিশ দেখে প্রফেসর সেন ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন তারা কেন এসেছেন।

সেই পুরোনো প্রশ্ন—ছেলের ব্যাপারে একটু খুলে বলুন।

হেসেই উত্তর দিলেন প্রফেসর সেন—এত মাইনে দেয় সরকার আপনাদের, আপনারা হদিস করতে পারলেন না?

পরিতোষ চৌধুরী বললে—দেখুন আপনি ওর বাবা—আপনি যদি আমাদের

সাহায্য না করেন·····

ওর কথা শেষ না হতেই প্রফেসর সেন উত্তেজিত হয়ে বললেন, কিসের সাহায্য? —ও কি চুরি ডাকাতি করেছে নাকি? যে লুকোনো মাল বের করার সাহায্য করতে হবে। ও রাজনীতি করে ওর চিন্তায়, আমি সেখানে ওকে বাধা দিতে চাইনি—তাছাড়া ওর পরিকল্পনা যদি কিছু থেকেও থাকে সে তো আমায় সে বলবে না—কারণ আমাকে শত্রু শিবিরের লোক মনে করে। আপনারা এর বেশী কিছু আমার কাছ জানতে চাইবেন না।

পুলিশের লোকেরা বেরিয়ে যেতে গেলে প্রফেসর সেন আস্তে বললেন, আপনারা কি ওর কাছ থেকে এলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—

কেমন দেখলেন ওকে? ভাল আছে তো?

হ্যাঁ সে সব কোন অসুবিধে নেই—তবে জেনারেল সেলে আছে, কোন ক্লাস পায়নি, তাই একটু অসুবিধে তো হবেই।—

প্রফেসর সেন আর কিছু না বলে দেওয়ালে ওর মায়ের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পনরই আগষ্ট জন্মেছিল এই পুত্র। প্রফেসর সেনের স্ত্রী বলেছিলেন, অরবিন্দ নাম দাও, আজ ওঁর জন্মদিন। স্বপ্নও দেখতেন ছেলে যেন অরবিন্দর মত তেজস্বী ও নির্ভীক হয়।

হয়ত অরবিন্দ তার মায়ের মনোবাসনাই পূর্ণ করতে চলেছে।

গান্ধীর মৃত্যু তিথিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে চেয়েছিলেন প্রফেসর সেন একবার। সেবারই বাদবিতণ্ডা হয়েছিল ছেলের সঙ্গে, সে তখন সবে কলেজে পড়ছে।

ওর বাবাকে বলেছিল এসব করে কি লাভ। যে যাবার সে গেছে। যতবেশী দ্বিধা আর বিভ্রান্তি দেশ ভাগের সময় না করলে গান্ধীজি মরতেন না বাবা।

প্রফেসর সেন চটে গিয়েছিলেন—তুই থাম—কি জানিস গান্ধীজির। কতটুকু জানিস—?

জানবার ইচ্ছে থাকলেও যে কংগ্রেস চোখের সামনে দেখছি বাবা, তারপর আর জানার ইচ্ছে থাকছে না।—

অরবিন্দর এ সব কথায় ওর বাবা বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—না বুঝে না জেনে এবং না উপলব্ধি করে কোন বিষয়ে মত দিলে সেটা মূল্যহীন ও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতে এটা মনে রেখো।

অরবিন্দ শেষে কম্প্রোমাইজ করে বলেছিল তা গান্ধীর মৃত্যু তিথিতে ব্রাহ্মণ

ভোজন না করিয়ে হরিজনদের বরং খাওয়াও, তাতে একটা দিক থেকে তাঁকে রেসপেক্ট জানানো হবে।
শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন ছেলের প্রস্তাব—বলেছিলেন তুই ঠিক বলেছিস। এর পরও ছোটখাটো ব্যাপারে প্রায়ই লাগত ওর সঙ্গে ওর বাবার। তারপর যখন যাদবপুরে ভর্তি হল অরবিন্দ সেই থেকেই হস্টেলে থাকত। কিন্তু ততদিন সে ছাত্র মহলে বেশ পরিচিত বিদ্রোহী।
অরবিন্দ এবার জেলে আসবার আগে যে প্রবন্ধটা লিখে এসেছিল ম্যাগাজিনের জন্য, শেষ পর্যন্ত সেটা আর ছাপা হয়নি। স্বপন ওটা অন্য এক কাগজে ছাপিয়েছিল। প্রবন্ধের এক জায়গায় ছিল শ্রেণী শত্রুর হয়ে যারা কাজ করে তাদের জন্য মায়া-মমতা করাও বিপ্লব বিরোধী আচরণ বলে গণ্য হবে।
পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনী এই কথাকেই বেশী করে গুরুত্ব দিচ্ছে।
প্রফেসর সেনের ছেলেই যে অরবিন্দ একথা সুমিত্রা জানল। ওর দাদার খাবার টেবিলে বসে কথা বলতে গিয়ে এই ঘটনার দিন দশেক বাদে জিনিসটা পরিষ্কার হল সুমিত্রার।
প্রফেসার সেনের কাছে মেয়ের মত ব্যবহার পেয়েছে সুমিত্রা। অরবিন্দর ব্যাপারটা জেনে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করেছিল ওর দাদাকে।
এদের আটকে রেখে এই বুড়ো বাপটাকে মনকষ্ট দিয়ে তোমাদের যে কোন ছাই সরকার চলছে বুঝি না। সত্যি দাদাকে শেষে এমন চাকুরী করতে হল, যেখানে সবটাই বিবেকের বিরুদ্ধে করতে হয়। সুমিত্রাকে ওর বৌদি ও মা সায় দেয়।
পরিতোষ জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, কর্তব্য বিবেকের থেকেও কঠোর রে সুমি। তাছাড়া অরবিন্দবাবুর প্রবন্ধে যা বেরিয়েছে সে যদি বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে তোর বৌদির মত অনেকেরই সিঁথির সিঁদুর থাকবে না।
ততক্ষণে পান সেজে এনেছে সুমিত্রার বৌদি। কথাটা শুনেই বললে, কি সব ছন্নছাড়া কথা।
পরিতোষ হাসতে হাসতে বলে—আহা সেই জন্যেই তো আমরা কঠোর হচ্ছি।
সুমিত্রা বললে, দেশ জুড়ে নানা অভাব, বেকারী, আর দোষ দেখার বেলায় শুধু অরবিন্দ সেনদের।
পরিতোষ বললে, ওসব সমস্যা ভাববার জন্য নীরোগ ও রোগগ্রস্থ ডজন চল্লিশেক নেতা আছে দেশ জুড়ে। কিন্তু আমাদের কাজ সম্পূর্ণ অন্য।
সুমিত্রা সেদিনই আবার প্রফেসর সেনের বাড়িতে এল আজ আর নোট

নেবার মতলবে নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই অরবিন্দ প্রসঙ্গ তুলেছে সুমিত্রা।
প্রফেসর সেন বললেন, তুমি কোথেকে জেনেছ এসব ?
সুমিত্রা বললে—দাদার কাছে, সে এস-বির অফিসার।
বুঝেছি। কিন্তু মা, সে কথা আর নাই বা তুললে। মা মরা-ছেলেটা যে শেষ পর্যন্ত এত বিপরীত মেরুতে যাবে ভাবিনি। তবে ওর নির্ভীকতাকে আমি বাপ হয়েও শ্রদ্ধা করি।
সুমিত্রা বললে, আপনি একটু কোর্টে তদবির করুন না।
সর্বনাশ! একথা মুখেও এনো না। তাহলে সে ছেলে যাওবা একটু সম্পর্ক রাখছে, সেটাও ঘুচিয়ে দেবে। ওযে কি জিনিষ মা তুমি বুঝবে না। একেবারে আপোসহীন ছেলে।
আমি স্যার একটু যাব ওকে দেখতে। আপনার কথা বলব।
সে তোমার ইচ্ছে। তবে আরো অনেকেই তো এ জেলে ও জেলে যাচ্ছে। খামোখা একা ওর জন্য গেলে, ওইবা কি ভাববে।
সুমিত্রাও ভাবলে হয়তো সেটা ঠিক হবে না। ফেরার পথে মহাজাতিতে গিয়ে বিমলকে সব বললে।
বিমলও জানত না যে অরবিন্দ প্রফেসর সেনের ছেলে। কিন্তু অরবিন্দের ধাত বিমল জানে বলেই সুমিত্রাকে বলে, ওর লাইনে ও পাক্কা আদর্শবাদী, ওকে ছোট করতে চাই না।
বিমল একটু থেমে সুমিত্রাকে বললে, মানে তোমার কি অরবিন্দের পথ, মত গ্রহণীয় সুমিত্রা ?
মতটা অত অপছন্দ নয়—তবে পথটা এখনো গ্রহণীয় হয় নি বলে যেতে পারছি না।—
তবুও নিশ্চিন্ত হলাম। তা নাহলে ভাবছিলাম তুমিও বোধহয় কেটে পড়লে।
প্রফেসর সেনের মত লোকেরা এখনো তোমাদের মত আঁকড়ে আছেন বলেই তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছিনা বিমলদা। তা না হলে কি হত বলা মুশকিল।

॥ সাত ॥

মনুমেণ্ট, ময়দানে প্রচণ্ড আলোর সামনে, সন্ধ্যাবেলায় হাজার হাজার লোকের সামনে, নুরুল ইসলামের মা দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কাঁদছে। শুধু কাঁদছে। তার কাছে এত লোক, এত আলো, এত কিছু সবটাই নতুন জনমের স্বাদ অথবা বিভীষিকা। এত আলো এখানে! কেরোসিন নয়—নিয়নের আলো! তার নুরুল তো নেই। আবার ভাবছে তাকে নিয়ে এত কেন সহানুভূতি?

এই কথাই ডাক্তার লেনের নিখিল নন্দীর বাবা ও মা ভেবেছিল মেডিকেল কলেজের লনে দাঁড়িয়ে শোকাহত বিস্ময়ে! সেদিন তাদের ঘিরে কত মন্ত্রী, কত গাড়ি, কত ফটোগ্রাফার। ফুলের মালা, সহানুভূতির টেলিগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রীর সীল করা বড় খামের চিঠি!

নিখিলের মা, নুরুলের মা, বাঙলার সন্তানহারা মায়েদের চোখের জলের ফোঁটায় আর একটা নেকলেশ হলো পার্টির। একজনের পাশে শাসক গোষ্ঠীর কান্না, মুখ্যমন্ত্রীর বাণী—আর একজনের পাশে বিরোধী দলগুলির বিরাট সভা, সমর্থন, মিছিল, আলো, মাইক, ফটোগ্রাফার, বসুমতীর প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি।

সৎকারের পর নিখিলের চিতাভস্ম বাবুঘাটের গঙ্গায় দিয়ে এসেছে ওর বাবা। নুরুলের দেহ কবরে গেছে। মাটির তলায় যে ঠাণ্ডা—সেই ঠাণ্ডা রাইটার্সের স্ট্রং রুমের এয়ার কণ্ডিশান করা ঘরের থেকেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

গণতন্ত্রের এসব কান্নার প্রচণ্ড নিহিত সত্য হলো ক্ষমতা দখল। দুর্গাপূজোর নিখিলের জামা কিনতে ওর বাবাকে আর যেতে হবে না। রমজানের উপোসের পর মুড়ি আর তেলেভাজার সান্‌কী নুরুলের সামনে ওর মা কোনোদিন আর বেড়ে দেবে না। কিন্তু কোলকাতা ক্লাবের হুইস্কির অফুরন্ত ফোয়ারা কোনোদিন আর থামবে না। সি-আর-পির গাড়ি, প্রিজন ভ্যানের দৌরাত্ম্য গণতন্ত্রের গতিকে অব্যাহত রাখবেই।

সি-আর-পির প্রচণ্ড টহল সত্বেও এক্ষুনি ময়দানের মিটিং ভেঙেছে। হাজার হাজার লোক বোধ হয় সরকারকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ি ফিরে গেল। সেই ট্রাম বাসে গাদাগাদি। ঘামে ভেজা জামার এর ওর মুখে নোনতা বিস্বাদ!

কে বা কারা দায়িত্ব নিয়ে নুরুলের মাকে বাদুড়িয়া নিয়ে গেল জানা গেল না। তবে প্রচণ্ড আলোর সামনে, চোখ ঝলসানো কোলকাতার জুলুষ দেখে সাশ্রুনয়নে বাড়ি ফিরে এল নুরুলের মা। তখনও হ্যারিকেন নেই। নুরুলের

ছবির সামনে মোমবাতি জলছে। ঘরের দাওয়ায় বাড়ির আর সবাই বসে। তীব্র হেড লাইটের আলো ফেলে নেতারা বোধ হয় মুকুলের মাকে নাবিয়ে দিয়ে গেল। তাদের দায়িত্ব ও কাজ শেষ। এবার আর এক মুকুলের সন্ধানে ছুটবে ওরা। আর গুলি ভরবে রাইফেলে সি-আর-পি। মুকুলের মা কাগজ পড়তে পারে না। কালকের কাগজে বের হবে খবর, ছবি। কেউ হয়তো এসে বুঝিয়ে দেবে।

প্রায় সব নেতাই মুক্তি পেয়েছে।

হেমন্ত বসু মুক্তি পেয়েই, সবার স্বার্থে, সবার মুক্তির জন্য এক বিরাট শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। একেবারে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্ক। আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভীড়। তবুও পুলিশ রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রী জানলেন, লোকই হয় নি। ময়দানের মিটিং-এ হেমন্তদা এসেছিলেন পায়ে হেঁটে। এই বয়সেও হেমন্তদা হাঁটলেন সবাইকে নিয়ে। আজ ময়দানের মিটিং শেষে গাড়ি করে বাড়ি ফিরলেন আর সব নেতারা। হেমন্তদা ট্রামে চড়ে বাড়ি ফিরলেন।

নেতাদের সব ছেড়ে দিতে হলো। গণ আন্দোলনের চাপে নেতাদের মুক্তি হচ্ছে এ দাবী করলেন বিরোধী নেতারা। সরকার অবশ্য মুখে কিছুই স্পষ্ট করে বললেন না।

সরকারের অবস্থাটা অনেকটা ঠিক অর্ধেক দাড়ি কামানো—সাবান মাখা গালের মত আর কি—টাওয়েল জড়িয়ে বসে আছে, কেউ ডাকলে বেরিয়ে আসারও উপায় নেই। অথচ নাপিতও ছেড়ে চলে গেছে। ভীষণ লজ্জার অবস্থা।

সাতষট্টিতে নির্বাচন।

জিতলে পরে পুরো গালটাই কামানো হবে। তখন যদি মুখটা ফিটকারী দিয়ে মুছে দেয়া যায় তাহলে আর জলবে না।

সুমিত্রা অবশ্য মিটিং শুনতে আসে নি। প্রফেসর সেনের বাড়ি থেকে নোট নিয়ে বাসে করে ফিরছিল। এসপ্লানেডে আসতেই মিটিং শেষের ভীড়ের কেউ কেউ উঠে পড়ল বাসে। অনেকেই দুএকজন মন্ত্রী সম্পর্কে কুৎসিৎ কথা বলছিল। এবার রাজনীতির আমেজটা সুমিত্রা বেশ উপভোগ করতে পারছে। রতনের কথাটা মনে হলো।—যা দিনকাল পড়েছে বুঝে চলা উচিত। চট করে উতলা হয়ে পড়ে না সে। ব্যাগের মধ্যে প্রফেসর সেনের নোটগুলোকে নিয়ে জানালার ধারে বসে ভীড় দেখছিল সুমিত্রা। কাগজ পড়ে জেনেছে কি মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে মুকুল ইসলামের। কাকে দায়ী করবে? তাছাড়া

সুমিত্রা কাউকে দাবী করে নিজে কতটা করতে পারবে। এরকম কত সুমিত্রা ভাবছে, তার মূল্য কতটুকু? শুধু একটু করে ভোট তাও তাৎক্ষণিক বিবেকের তাগিদে—অন্তরের ইচ্ছায় নয়।

বিমলদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। সেই কলেজ স্ট্রীটের হাঙ্গামার পর ওরা কোথায় গেল তার পাত্তা নেই। নিখিল নন্দীর বাবাই বা এখন কি করছে? এমনি নানা কথা ভাবছে সুমিত্রা। রাজনীতি করবে নাকি?

বাসটা রাসবিহারীর মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে স্ট্রীট কর্ণার হচ্ছে কংগ্রেসের। কালিঘাটের এম-এল-এ বিভা মিত্রের সাঙ্গপাঙ্গরা কি সব যেন বলছে। লোক মন্দ হয় নি। বিভা মিত্র আছে কিনা বাস থেকে দেখা গেল না। তাছাড়া সুমিত্রা তাকে চেনে না। খবরের কাগজে নাম দেখেছে। আর ইলেকসানের পোষ্টারে আর দেওয়ালে নাম আছে। বিধানসভায় নাকি একদিন প্রায় সারা দিন এম-এল-এ-দের আটকে রেখে হাউস চলছিল কয়েক দিন আগে। সেদিন বোধ হয় বাঙলা বন্ধ ছিল। তাতে যেসব মেনু দেওয়া হয়েছিল সেসব খবর বেরিয়েছিল কাগজে। বিভাদি নাকি সবাইকে পান সরবরাহ করেছিলেন।

কংগ্রেস নামের পতাকাটা যখন কৃষ্ণনগর থেকে পুড়ে পুড়ে নৈহাটি হয়ে কোলকাতার দিকে ধেয়ে আসছে, তখন পান, দৈ, রসবড়া ফ্রাইড রাইসে অন্নপ্রাশন চলছে বিধান সভা ভবনে এম-এল-এ দের। তাও আবার প্রচণ্ড শক্তিমান জন প্রতিনিধি সব। রেলিং-এর দিকে কড়া পুলিশ পাহারা, ভেতরে তাঁরা গৃহবন্দী হয়ে অন্নপ্রাশন করছেন। আর হোম মিনিস্টার পুলিশ রিপোর্ট পড়ে বলছেন, আসলে এসব আন্দোলনে গণ সমর্থন নেই ইত্যাদি।

বিমল একবার সুমিত্রাকে বলেছিল, ক্লাশে দাঁড়াও না সুমিত্রা।

না, বাবা, ওসব ব্যাপারে আমি নেই, ওসব আমি বুঝি না। সুমিত্রা বলেছিল। ওর দাদা পরিতোষও বার বার নিষেধ করত সুমিত্রাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়তে। কিন্তু এখন সুমিত্রা ভাবছে রাজনীতি না করেও রাজনীতি তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সুধীর গুপ্তর চিকিৎসা, নিখিলকে হসপিটাল পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে সমাজ সেবা হয়তো আছে, কিন্তু রাজনীতির পরিবেশ কি একদম নেই? অবশ্য এসব করলে একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। সুমিত্রার মা অবিশ্যি বলে, এসব নাকি নোংরা জিনিস। নোংরামিটা এর মধ্যে কোথাও খুঁজে পায় না সুমিত্রা। সমাজের আবর্জনাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই হাত যা একটু কালো হয়ে যায়। তাকে বাদ দিয়ে এড়িয়ে যাবে কি করে?

॥ আট ॥

হেমন্তদার আন্দোলনের কল্যাণে চীফ মিনিস্টার মাথা নত করেছে। প্রায় সব নেতাই মুক্তি পেয়েছে। বড় দিনের আলোতে পার্ক স্ট্রীট ঝলমল করছে। কোলকাতার পথে ঘাটে নির্বাচনের ঢাক বেজে উঠেছে। বিমল তো পার্টির মিটিং-এ হৈ চৈ বাধিয়ে বসেছিল। চীফ মিনিস্টার রেগে গিয়ে বিমলকে গলা ধাক্কা দেয় আর কি। সেবাদলের লোকেরা এগিয়েও এসেছিল।

ছেড়েই যখন দিলেন, তখন আবার আটক করার দরকার কি ছিল? আমরা এদিকে শুধু প্রচার করলাম যে ওরা দেশদ্রোহী। ওদের ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্দোলনের ধাক্কাতেই ছেড়ে দিলেন। বেশ উত্তেজিত হয়ে বিমল বলে উঠল।

এসব ব্যাপারে তোমায় কি কৈফিয়ৎ দেব হে ছোকরা? সত্যই, এসবের আর কি কৈফিয়ৎ হতে পারে। পরে বিমলকে অনিমেষ বুঝিয়েছিল, এসব হলো চাল, বুঝলি। আসলে পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসি রাখতে হলে নির্বাচন হলো মাস্ট। আর নির্বাচন করতে হলে সব রাজনৈতিক দলগুলোকে ফিল্ডে নামানো হলো সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজি। তাই এদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এত বেশী চেঁচামেচি হলো সেদিন যে বিমল সভা ছেড়ে বেরিয়েই গেল। ইউনিভারসিটিতে অরবিন্দ, নির্বেদ, সুনীলদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার পোষ্টারগুলোর কথা ভাবল বিমল। অন্যদিকে প্রায় এক বছর ধরে দেখা কোলকাতার পোষ্টারগুলোতে বড় বড় নেতাদের মুক্তির কথা। কতবার বিমলকে বোঝানো হয়েছে যে বন্দী করার উদ্দেশ্য জাতীয় নিরাপত্তা। লালবাহাদুরের "জয় জওয়ান, জয় কিষাণ" শ্লোগান দিয়ে হাজার হাজার টাকা তুলেছে বিমলরা প্রতিরক্ষা তহবিলে দেওয়া হবে বলে। ঘটা করে আশুতোষ বিল্ডিংস-যে সভা করে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীকে এনে সেই টাকা দিয়েছে। অভিজিৎ রায়, কর্নেল গোস্বামীর মত বীরদের মৃত্যুতে শহীদদের সম্মান জানিয়ে সভা হয়েছে কত।

আর হঠাৎ আজই জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থীদের একেবারে লাইন দিয়ে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র না অগণতন্ত্র বুঝতে পারে না। নদীয়ার স্বদেশপ্রেমী বৃদ্ধ সুরতআলী খান্‌কেও আটক রাখা হয়েছিল।

এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারল বিমল যে প্রশাসন হাতে থাকলে যে কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে কাউকে আটক করে রাখাটা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। এই ভিতের উপর দিয়ে গণতন্ত্রের চুন সুরকি কতটা ইঁট গাঁথতে পারবে বুঝতে পারে না বিমল্।

অনিমেষ ওকে এটাও বুঝিয়েছে যে মাঝে মাঝে নাকি বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রয়োজনেই দেখা দেয়। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র নেই। বিরোধী দলকে থাকতে হলে বিরোধীতার ইমেজ চাই। দলাদলির মধ্য দিয়ে সেই ইমেজ গড়ে ওঠে না। সেই ইমেজ গড়তে গেলে মাঝে মাঝে গ্রেপ্তার হওয়া চাই। সেই গ্রেপ্তার হতে গেলে নাকি আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং চাই। তাই গবরমেণ্টের পক্ষে এই আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এর জন্য কিছু দালাল থাকে; যাদের সবাই চেনে না। সারা বাঙলার বিপ্লবী নাগরিক সমিতির নেতা তারিণীবাবুকে মাঝে মাঝেই জেলে নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর আর একটু ইমেজ করেই দুমাস পরেই তার মুক্তির দাবী করা হতো। তারিণী-বাবুর মুক্তি ঠিক সেই সময়েই দেয়া হতো যখন বাইরে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে জনতা উত্তাল। তারিণীবাবু বেরিয়ে এসেই রজনীগন্ধার মালা গলায় দিয়ে বলতেন, আপনাদের আন্দোলনের চাপ সরকারের কঠিন শৃঙ্খলকে ভেঙে আমায় বাইরে বের করে এনেছে। আপনারা আমার সংগ্রামী অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের আন্দোলন প্রমাণ করল, বিপ্লবীর শৃঙ্খল নেই। তারপরই তারিণীবাবু কাজে লেগে যেতেন। দিন পনেরোর মধ্যেই কোন আন্দোলনকে থিতিয়ে দিয়ে, জোড়াতালির ফয়সালা করিয়ে সব শান্ত করে দিতেন।

বাঙলা বিহার সীমানা পুনর্নির্ধারণ আর উদ্বাস্তু আন্দোলনের সময়ে তারিণীবাবু এ কাজ অনেকবার করেছেন। তাই তারিণীবাবুর এ ব্যাপারে একটা অখ্যাতি থাকলেও বিরোধীরা যখন এক জোটে মোর্চা বা ফ্রণ্ট করে তখনও তারিণীবাবু বাদ যান না। তারিণীবাবু কমন ম্যান বিটুইন কংগ্রেস ও এ্যাণ্টি-কংগ্রেস।

তারিণীবাবুর অঙ্কটা খুবই সহজ। তা হলো—জনসমুদ্রে নাকি এক শ্রেণীর বিভ্রান্তিতে ভোগা জনগণ সব সময়েই থাকবে যারা তারিণীবাবুদের সমর্থন করবে এবং তাদের সমর্থন ওয়ান পার্সেণ্ট কম হলেই তারিণীবাবুদের ব্যাখ্যায় (কম করে দুটো থেকে চারটে বিধান সভার সদস্যপদ বাঁধা।) বিরোধী আসনে অথবা সরকারের অল্প মেজরিটিকে থ্রেট করে তা একেবারে ভীষণ মূল্যবান হয়ে পড়ে। কয়েকজন এম-এল-এ-কে দর দিতেই হৈ চৈ পড়ে যায়।) তারিণীবাবুরা (হলেন সরকারের নন্-অফিসিয়াল পলিটিক্যাল কনট্রাকটর—ফর সেটেলমেণ্ট এণ্ড

সাবোটাজ। সংক্ষেপে এন-ও-পি-সি অ্যাণ্ড এস-এস। এই এস-এসদের সিক্রেট সার্ভিসের মর্যাদা না থাকলেও রায় বাহাদুরী মোসাহেবীর একটা মূল্য সরকার থেকে পেয়ে থাকে। যেমন পুত্র কন্যার ভাল শিক্ষা, জামাইদের চাকুরী, স্ত্রীর স্কুলের গ্রাণ্ট মঞ্জুর করানো। বিপদে পড়লে অবশ্য একান্ত নিষ্ঠাবান বিপ্লবী দলের দু একজনও তারিণীবাবুর শরণাপন্ন হন। তাদের দু-একটা কাজও তারিণীবাবু করে দেন। তবে সামান্য কমিশনের বিনিময়ে। জাত বিরোধী দল তো। স্ট্যাণ্ডার্ড রেট অ্যাপ্লাই করতে তারিণীবাবুরও লজ্জা।

বিমলকে একবার প্রেসিডেন্সীর নির্বেদই বলেছিল যে হিন্দ মোটরের গোলমালে নাকি তারিণীবাবু প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। আসলে তারিণীবাবু আন্দোলনে যুক্ত থেকেও শ্রমিকদের না জানিয়েই বিড়লার সঙ্গে গোপনে সেটেলমেণ্ট করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সিটু, এ-আই-টি-ইউ-সি এবং ইনটাকের—সব দলেরই উত্তেজিত কর্মীরা রাত্রিবেলা গেটে বেদম প্রহার করেছিল তারিণীবাবুকে। রক্তে জামা ভিজে গিয়েছিল। হিন্দুস্থানী শ্রমিকরাও শ্লোগান দিয়ে ফেলেছিল, গলি গলিমে শোর হ্যায়—তারিণী দালাল চোর হ্যায়। সরকারকি দালাল হ্যায়।

অবশ্য ব্যাপারটা রাতের মধ্যেই ম্যানেজ করা গিয়েছিল। দালাল হলেও বিরোধী নেতা তো। তাই বড় বড় নেতারা এসে গভীর রাতে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে, শ্রমিকদের শান্ত করে পরে রটিয়ে দিয়েছিল, মালিকের চক্রান্তে সমাজবিরোধী কর্তৃক তারিণীবাবুর উপর হামলা। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দেখতে এসেছিলেন ফল, ফুল, মিষ্টি নিয়ে। তারিণীবাবুর কোনো লজ্জাও নেই, ভ্রূক্ষেপও নেই। এই গণতন্ত্রে তারিণীবাবুরা হলেন স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের জিনিস। এ জিনিস নিউ মার্কেটে বিক্রি না হলেও শিয়ালদা মার্কেটে এর খদ্দের আছে। তারিণীবাবু অবশ্য এ ঘটনার পর আর কোনোদিন হিন্দ মোটরে যান নি। তারিণীবাবুর মেয়ে কম নম্বর পেয়েও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। অথচ বিমলের দলের তিনজন মেয়ে, যারা দিনরাত জিন্দাবাদ করে দলের জন্য, সেই অনুপাতে নম্বর বেশী থাকতেও সিট পায় নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন স্ট্রিক্ট অর্ডার, ইম্‌পাসিয়াল ভর্তি করতে হবে। ইলেকশন্ ইয়ারে আমরা ক্লিন ইমেজ চাই। আসলে বিমল পরে বুঝেছিল ইলেকশন্‌কে সামনে রেখে এক ধরনের নীতি, আর ইলেক্শন শেষ হলে আর এক ধরনের নীতি এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই গণতন্ত্রকে চালাতে হবে এবং বাঁচাতে হবে। কংগ্রেসও সেটাই চায়।

কংগ্রেসের যে নেতারা এই নীতির সমর্থক তাদের কাছে দল করা এবং দল গড়া হলো ইলেকশনের মেসিনারী বানাবার একটা উদ্দেশ্য মাত্র।

তারিণীবাবুর মেয়েরা বামপন্থীর মেয়ে হলেও মিনিস্টারের ব্যাকিং পেয়ে কম নম্বরে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে। অরবিন্দ সেনেরা সাচ্চা মার্কসিস্ট হয়েও জেলে পচে মরবে। হেমন্ত বসুরা সাচ্চা দেশপ্রেমিক হয়েও সারা জীবন সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে করে বাড়ি ফিরবে। দু'একজন কংগ্রেসী নেতা খদ্দর পরেও রাত দশটার পর মদ গিলবে। আর বিমলের মত সাচ্চা বন্দেমাতরম বোলনেওয়ালারা শুধু পোষ্টার মারবে, আর মার খাবে। এই বিচিত্র নাট্যশালার সব প্রেগুলো বন্ধ করা যায় না ' কুড়ি বছর তো হলো!

এখানে তারিণীবাবুরা হলো গণতন্ত্রের স্ট্যাণ্ডার্ড ডিজাইন। হেমন্ত বসুরা হলেন গণতন্ত্রের কণ্ট্রাডিকশান, অরবিন্দ সেনেরা হলো ডেমোক্র্যাসির বলি, আর বিমলরা হলো ডেমোক্র্যাসির চৌকিদার।

মিটিং থেকে মন খারাপ করে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ফিরে এল বিমল। হোস্টেলে এসেই খবর গেল বাদল স্ট্যাবড্ হয়েছে সারপেনটাইন লেনে। একটুও দেরী না করে নীলরতনে চলে এল বিমল।

পোষ্টার মারতে গিয়েই নাকি স্ট্যাবড্ হয়েছে। এতক্ষণে বেঁচে আছে কিনা কে জানে। বাড়ি ফিরে সুমিত্রা অন্যান্য দিনের মত বিশ্রাম করে পড়ার টেবিলে না গিয়ে পুরোনো ব্যাগ থেকে কতকগুলো ছাপানো কার্ড বের করে টেবিলে সাজাল। কার্ডগুলো ইউনিভার্সিটির ক্লাশ রিপ্রেসেণ্টেটিভ প্রার্থীদের। ইউনিয়ন ইলেকশনের কার্ড। Please support, please cast your vote-এভাবে অনেকের নাম ছাপা অক্ষরে, রোল নাম্বার দিয়ে লেখা। ইউনিভারসিটির দেয়ালের পোষ্টারগুলো চক চক করে ভেসে উঠল। কত নাম। ভিন্ন কায়দায় লেখা সব। এসব থেকেই ষ্ট্রাইক, মিছিল, নিখিল নন্দী, নুরুল-ইসলাম। খবরের কাগজে ছাপা অক্ষরে বড় বড় নাম।

রাজনীতি করবে নাকি সুমিত্রা? কেমন যেন মনটা করছে। পড়াশুনো তো আর দশজনও করে। কিন্তু প্রফেসর সেনের নামও রোজ রোজ এতখানি করে বের হয় না।

কখন যে সুমিত্রার বৌদি এসে পাশে দাড়িয়েছে টের পায় নি।

কি ঠাকুরঝি, এসব কি হচ্ছে, তুমি কি কাজ করবে নাকি?

না, এমনি।

সবগুলো আবার ব্যাগেই রেখে দিল। রেডিও ছেড়ে দিল খবর শুনতে, স্থানীয় সংবাদ শুরু হতেই বাদল ঘোষের ছুরিকাহত হবার খবর এল, ওর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সংগঠনের নাম শুনেই বুঝল বিমলদের কেউ হবে। আবার রক্ত! ইশ্! কি সর্ব্বনাশ!

॥ নয় ॥

ইলেকশনের ঢাকের বাদ্যি বাজছে!

জিনিসের দাম সামান্য কমেছে—সেই সঙ্গে চাঁদাও উঠছে!

চাঁদা তোলার ও জিনিসের দাম সামান্য কমে যাওয়ার কারণ খুঁজতে কোনো সেমিনার অবশ্য এখনও এদেশে হয় নি। তাহলে দেখা যেত যে ইলেকশনের চাঁদা যারা দেয় তারা ইনভেস্টমেণ্টকে ডাবল করার জন্য যে সামান্য স্যাক্রিফাইস বা ত্যাগ করেন তা সাময়িক, এবং এই বৃহত্তর জনগণকে ভোটের দিন পর্যন্ত খুশি করার জন্য। কোন্ পার্টির চাঁদা কত উঠছে এসব হিসেব করা মুশকিল! কোলকাতার কালিপূজোতে যেমন এক পাড়ার চারটি পূজোতে সমান কম্পিটিশান চলে তেমনি ইলেকশনের মিটিং-এ ফ্ল্যাগ, মাইক, মিছিল, পোষ্টার আর ডায়াস দেখে বোঝার উপায় নেই কার কত চাঁদা অথবা কে কার লোক। সবাই যেন সমান সঙ্গতিসম্পন্ন।

এই ডেমোক্র্যাসিতে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, পুলিশপন্থী, ধর্ম্মপন্থী, বড়বাজার পন্থী সবাই এক যে গ্রন্থীতে বাঁধা তা হলো চাঁদা। প্রথমে চাঁদা তারপর 'লাল সাদা' নামক সামান্য পদার্থ। চাঁদা এবং লাল সাদা সামান্য ঠিক হবার পরেই ডাক আসবে "দাদাদের"। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

একমাত্র হেমন্ত বসু এসব চাঁদার ধার ধারে না।

পায়ে চটি বা ছেঁড়া জুতো লাগিয়ে সেই যে নেতাজীর নাম করে সকালে বেরিয়ে পড়ে—সারা দিনের শেষে বাড়ি ফিরে আসে যখন তখনও ক্লান্তি নেই। রাজনীতিতে এ ধরনের মহাপুরুষ এ দশকে খুব কম।

গুজরাটের ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ঠিক এই ধরনের মানুষ।

হেমন্ত বসু, ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের মত দশ জন করে রাজনীতির কুলীন মানুষ যদি সব দলে থাকত তাহলে চাঁদা দেনেওয়ালারা বেশ টাইট হতো। তাহলে গণতন্ত্রের দলে ফিল্টারাইজেশন হতো। বিশুদ্ধ জল পান করে বাঁচত সবাই।

সেদিন "দিন বদলের পালা" নাটক হচ্ছিল, সোদপুরের অমরাবতীর মাঠে।

লোকের ভীড়ে শুধু কালো মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল সোদপুর স্টেশন রোড থেকে। বিমল-ভয়ে ভয়েই রিকসা করে সুব্রতকে নিয়ে আসছিল। সোদপুরে হেলথ মিনিস্টারের মিটিং-এর প্রোগ্রাম ঠিক করতে গিয়েছিল বিমল। সেখানে গিয়েই ঝগড়া শুরু হলো। আসলে যার মিটিং ঠিক করার কথা সে সোদপুর নার্সিং হোমের এক নার্সকে নিয়ে পালিয়েছে গতরাত্রে। সাবাস কংগ্রেসী! বিমল বেশ উত্তেজিত হয়েই মিটিং-এ বলেছিল, এসব লোকেদের আপনারা জ্যান্ত কবর দিতে পারেন না!

সুব্রত বললে, এদের কবর দিলেও আবার অন্য জায়গা থেকে ফুঁড়ে উঠবে। এদের পুড়িয়ে মরা উচিত। জ্যান্ত কবর দূরে থাক, এদেরকে ধমক দেবার শক্তিও কারো নেই। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে এদের। এরা সবাই দালাল।

আগরপাড়ার অলক প্রতিবাদ করে বললে, আমাদের ধমকে কি লাভ সুব্রত দা? ভানুদা মিনিস্টারের ফেভারিট লোক। রাইটার্সে যখন তখন যায়। নার্সদের চাকরী দেবার পাওয়ার রাখে। আমাদের কথা শুনবে কে? কংগ্রেসের কাজ করে কেউ আর জনপ্রিয় হয় না আজকাল। মন্ত্রীর দালাল বা টাউট হলেই পাওয়ারফুল হয়, আমরা কি করব! মুখ খিঁচিয়ে বলল সুব্রত, অমন মন্ত্রীর মিটিং করে লাভ কি? এলে পরে পাবলিকের সামনে ফুলের মালা দেব? ঘরে ডেকে নিয়ে ঘুঁটের মালা দেব। ডোবাবে কংগ্রেসকে এরা! বিমলদা, চলো আর দরকার নেই। মিনিস্টারকে আনতে হবে না! এসব নার্স নিয়ে পালিয়ে যাওয়া চামচার বস যদি আসে তাহলে ভোট আরও বাঁশ হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুলসীবাবুর সিনেমা হলে একটা ওয়ার্কাস্ মিটিং করে দাও, তাহলেই হবে। "দিন বদলের পালা" জমে উঠেছে। উৎপল দত্তের ইউনিট বেশ কায়দা করে ডায়ালগগুলো, ঝোলানো মাইকের সামনে বলছে। ভীষণ হাততালি পড়ছে। বেশ জমাট কিছু কথা আছে। মানুষের মনের কথা।

সুব্রত বিমলকে বলল, চলো না পালাটা দেখে যাই। খিস্তিগুলো শুনতে মন্দ লাগে না। তাহলে পাল্টা খিস্তি দেওয়া যায়।

বিমল কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, ওসব দিন বদলের পালা'তে দিন বদলাবার কথা খুব বেশী নেইরে সুব্রত, নেতা বদলের কথায় ভর্তি। কংগ্রেসের কেলেঙ্কারীর কথা বলে কংগ্রেসকে পাল্টাবার কথাই বেশী আছে, গিয়ে লাভ নেই। স্টেশনে এসেছে ওরা। লোকাল ট্রেনে করে সোজা কোলকাতা। কাউণ্টারে

গিয়ে সুব্রত দুটো টিকেট নিয়ে এলো। রাত মন্দ হয় নি। ডাউন ট্রেনে ভীড় কম। দশ পয়সার বাদাম নিয়ে পা ছড়িয়ে বসল সুব্রত আর বিমল।

বেলঘরিয়া আসবার আগে জানালাটা বন্ধ করে দিও বিমলদা। তোমায় সবাই চেনে। ধোলাই হবে তাহলে। বসুমতী খেপিয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দের কলমই আমাদের মেরে ফেলবে। আরে যাঃ! যা হবার হবে। এত ভয় পেলে পলিটিক্স ছেড়ে দে। ননী ঘোষালের দলবল আছে। কোনো ভয় নেই। বিমল একটু আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল। ননী ঘোষাল, কানু মিত্তির সবাই কিন্তু প্রফেশনাল বিমলদা। ওরা নেতা আর মন্ত্রীর টাউট। ওদের দালালির বিনিময়ে ওদের নিজেদের বিজিনেস অবাধে করে ওরা। তোমার প্রাণটা এমনিতেই যাবে—কেউ বাঁচাতে আসবে না।

বেশী কথা না বাড়িয়ে বিমল জানালা নামিয়ে দিল। আগরপাড়া থেকে ট্রেন ছেড়ে টেক্সম্যাকোর গেটের কাছে আসতেই ট্রেন থেমে গেল।

অনেক পুলিশ আর লোক। জানালা দিয়ে দেখল সুব্রত কয়েকজন ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। যেতে যেতেই বলল, আজ আর ট্রেন যাবে না। হেঁটেই বাড়ি যেতে হবে। এরা বোধ হয় সব বেলঘরিয়ার প্যাসেঞ্জার।

নামিস নে সুব্রত, চুপচাপ বসে থাক। বিমল সিটে বসেই বলল।

সুব্রতও খুব ঝুঁকি নিল না। শুধু শিয়ালদা যাবার প্যাসেঞ্জারেরা ট্রেনের ভেতরে বসে, আর বাকি সবাই নেমে গেছে। সামনেই একটা পুলিশের লোক যাচ্ছিল। সুব্রত জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে দাদা?

কি আবার হবে, মারপিট হয়েছে, লোক মরেছে, বলতে বলতেই পুলিশের লোকটা চলে গেল। একটু পরেই অন্ধকার সাইডিং-এর দিক থেকে, দু'তিনটি ছেলে এসে সুব্রতদের কামরায় উঠে পিছনে গিয়ে বসল আর জানালা বন্ধ করে দিল। তখন অবশ্য সবাই দৌড়চ্ছে। একটা ফায়ারিং-এর আওয়াজ হলো। পুলিশ বোধ হয় লাইনের উপর অবরোধ করে থাকা লোকগুলিকে সরাবার চেষ্টা করছে। ফাঁকা আওয়াজের মিনিট দশেকের মধ্যে লোক সরে গেলেও গাড়ি ছাড়তে আরও আধ ঘণ্টা সময় লাগল। প্রায় পৌনে এগারটা নাগাদ বেলঘরিয়ায় এসে গাড়ি পৌছল। স্টেশনেও ভীষণ উত্তেজনা। পুলিশ! খবরটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে গেছে। টেক্সম্যাকোর গেটের সামনে দিয়ে মোহিনী মিল্স-এর ইউনিয়ন বোধ হয় মিছিল করে যাচ্ছিল। এরা সবাই আই-এন-টি-ইউ-সি-র লোক।

টেক্সম্যাকোর গেটে আসতেই এদের উপর বোমা পড়তে শুরু করে। মোহিনী

মিলস্ ইউনিয়নের লোকেরা টেক্সম্যাকোর ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর দক্ষ-যজ্ঞ হয়। টেক্সম্যাকোর দুজন আর মোহিনী মিলসের একজন লোক মারা গেছে। কত লোক মারা গেছে জানা যায় নি। বেলঘরিয়ার লোক খুন হলে তার জের এক সপ্তাহ চলে। এটাই এখানকার মস্তানীর রেওয়াজ।

যারা মারা গেছে তারা কোনো পার্টি করে না। একজনের বয়স ছাপ্পান্ন, একজনের চল্লিশ, আর একজন ক্যান্টিনের বয়, বয়স সতের মাত্র। হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গিয়ে এরা শেষ হয়ে গেল। ইলেকশনের ঢাকে আরও জোড়ে কাঠি পড়ল। বাজনার গতি দ্রুত হলো।

নেতাদের আরতির ছন্দ বেড়ে গেল। শহীদবেদীর নামে কয়েক গজ কাপড় কিনে থান ইঁট সাজিয়ে পাবলিকের সেন্টিমেন্টকে নীলামে আর একবার দর দিয়ে কেনা যাবে। দু চারটে ভোট বাড়বে। বিবেকানন্দ মুখার্জির কলমের খোরাক আর বসুমতীর প্রফিটের অঙ্ক বাড়ল। বিবৃতি দিয়ে কাঁদবার সুযোগ পেল নেতারা। চির বৈধব্যের যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে বসে পড়ল ছাপ্পান্ন বছর বয়স্ক কর্মচারীর স্ত্রী। তাদের দিন কিন্তু বদলে গেল। ছিল দুমুঠো ভাত আর কপালের সিঁদুর—তাও গেল।

'দিন বদলের পালা'য় এমন দৃশ্য কিন্তু নেই। এ পালায় যারা অভিনয় করছে তারা তখন স্পেশাল ট্যাক্সি করে বি. টি. রোড ধরে বাড়ী ফিরছে। ক্যান্টিন বয়ের বাবা তখন পাড়ার লোককে নিয়ে থানায় এসেছে। কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে আর তারই মধ্যে বলছে আমার ছেলের লাশটা মর্গ থেকে কবে পাব বাবা? বারবেলার আগে করে দিন।

হায়রে বারবেলা। বারোটার কাঁটা যার আর কোনা দিনই ঘুরবে না, সেও বারবেলার তিথি গুনছে। শ্মশানে যাবার সময়টা খুঁজছে।

ট্রেন ছেড়েছে বেলঘরিয়া থেকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিমল, সুব্রত। অন্যান্য প্যাসেঞ্জারেরও ফাঁড়া কাটল।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে হলদে ছাপা শাড়ি পরা একটা মেয়ে উঠে পড়েছিল বেশ সেজেগুজে। ওদেরই উল্টো দিকে মুখ করে বসে আছে। বিমল সুব্রতকে খুঁচিয়ে বলল, আরে সুব্রত এই সেই রমা মিত্র না? মাঝ মাঝেই গাড়ি করে ইউনিভারসিটি আসে। অনেক রকমের গাড়ি। বিমল শুনেছিল আলিপুরের দিকে নাকি ওদের বাড়ি আছে। খুব বড় লোক নাকি। সে আজ এই রাতের ট্রেনে থার্ড ক্লাশে যাচ্ছে!

সুব্রত মুখ উঁচিয়ে বলল, তুমি ঠিক বলেছ বিমলদা। সেবার লালবাহাদুর

শাস্ত্রীর মৃত্যুর দিন গান গেয়েছিল এই মেয়েটি। মনে নেই সেই সেন্টিনারী হলে গাইল—"আছে দুঃখ আছে মৃত্যু—" ভীষণ সুন্দর গেয়েছিল।

কেমন যেন লাগছে। এত বড়লোকের মেয়ে। এভাবে এত রাতে!

শিয়ালদায় গাড়ী পৌছাল। বিমলকে সুব্রত বলল, একটু দেখি বিমলদা, মেয়েটা যদি কোনো সাহায্য পায়। হয়তো কোনো নিমন্ত্রণ রাখতে বেলঘরিয়ায় এসেছিল, হয়তো গাড়ি-টাড়ি সব আটকে গেছে! অনেক রকম বিপদ হতে পারে তো!

তোর ভীষণ হ্যাংলামো। কি দরকার আমাদের, ওর মনে ও চলে যাবে। তাছাড়া কানা বোবা তো নয়।

তুমি এক এক সময় যাচ্ছেতাই বলো বিমলদা।

রমা মিত্রা ততক্ষণে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুব্রত গিয়ে পাশে দাঁড়াল। এবার চিনতে পেরেছে মেয়েটি ওদের। চিনতে পেরে যে খুব খুশী হলো না তা বোঝা গেল। তবুও বলল, আপনারা এখানে?

না মানে একটা মিটিং ছিল কিনা। তা বেলঘরিয়ায় আপনাকে ট্রেনে উঠতে দেখলাম। কোথায় যাবেন?

একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, ল্যান্সডাউন রোড।

সুব্রতকে থামিয়ে দিয়ে বিমল বলল, আপনি আলিপুরে থাকেন না?

আজ্ঞে হ্যাঁ! তবে ল্যান্সডাউনে একটা নিমন্ত্রণ আছে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে। বেলঘরিয়ায় আমার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ব্রেকডাউন হয়েছে। ড্রাইভারকে একা রেখে চলে এলাম—কতক্ষণে গাড়ি সারবে ঠিক নেই তো?

সুব্রত ঠিকই বলেছে। কিছু মনে করবেন না। সুব্রত ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিল আমাকে। তা আপনাকে বলতে দেখলুম সুব্রতর আইডিয়াটা ঠিক। তা আপনি চলুন আপনাকে আমরা নামিয়ে দিয়ে আসছি।

না, না, তা কি হয়। আপনারা ভাবছেন কেন, আমি ঠিক চলে যাব। ছোটবেলা থেকে কোলকাতা আছি, তাছাড়া এমনি আমি প্রায়ই যাই।

না, আমাদের তো ওদিকেই যেতে হবে কিনা—সেই জন্যই ভাবছিলাম আপনাকে নামিয়ে দেব। বিমল পরোপকারীর মত বললে।

বেশ তো চলুন।

সুব্রত সামনে বসল ড্রাইভারের পাশে। বিমল আর রমা মিত্র পিছনের দিকে বসল। উগ্রসেন্টের গন্ধে ট্যাক্সি ভরে গেছে। ট্যাক্সিটা ল্যান্সডাউন মার্কেটের

কাছে আসতেই ট্যাক্সিটা থামাতে বলল রমা মিত্র।
'এখানে নামবেন? যেতে পারবেন তো?
হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ। আমার টাকাটা নিন।
না, না, তার কি দরকার। আমাদের তো যেতেই হবে। একদিন বরং কফি হাউসে খাইয়ে দেবেন। বিমল বলল।
রমা মিত্র চলে গেল। ও চলে যেতে সুব্রত বলল বিমলকে, আমায় বললে হ্যাংলা আর নিজে তো একেবারে গদগদ হয়ে পড়লে। তোমার ঢং দেখে আর বাঁচি নে। ট্যাক্সির টাকা দিতে চাইল, অত কায়দা করলে কেন? কম টাকা বিল হলো! কালতো আবার মেদিনীপুরে যেতে হবে।
সে তো তোমার আমার প্রেষ্টিজের জন্য। যাব আমরা কলেজ স্ট্রীটের মেসে, তা তুমি বললে আমরাও ল্যান্সডাউনের দিকে যাব। এখন গোন টাকা।
আমি তো প্রথম থেকেই কাটতে চেয়েছিলাম, তুই তো স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালি—মেদিনীপুর যাবার টাকা থেকে এখন দাও পথ প্রেমের বিল। তারপর দেখা যাবে। ওরা মেসে ফিরে এল। বিমল সারা রাত ভাবল রমা মিত্রের কথা! মেয়েটা অন্য কিছু নয় তো? খারাপ কিছু ভাবছিল বিমল—কেমন যেন মনে হয়েছে ওকে।
সুব্রত বলল, কি ভাবছ? রমা মিত্রের কথা? আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে বিমলদা, মেয়েটার কোনো গোলমেলে ব্যাপার আছে। জার্নালিজম পড়তে আসে কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার যেন কেমন ক্লিয়ার নয়।
কোনো গোলমেলে ব্যাপার নেই, চট্ করে কারও সম্পর্কে অমন ভাবতে নেই। বিমল প্রতিবাদ করল।
ঠিক আছে তুমি মিলিয়ে নিও। এ সব কায়দা দেখলেই আমি বুঝতে পারি। ঠিক আছে ঘুমিয়ে পড়। কাল আবার মেদিনীপুর যেতে হবে। নন্দীগ্রামে মিটিং আছে।
টেকসম্যাকোর ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশকে নিন্দা করে অনেকগুলো বিবৃতি বেরিয়ে গেল সকালে। পুলিশের গুলিতে যদিও কেউ মরে নি বরং তার আগেই সব হয়ে গেছে, তবুও গুলি চালনার নিন্দে হলো আর সেই সঙ্গে পুলিশের সমর্থিত গুণ্ডাবাহিনীকে ধিক্কার জানানো হলো।
কোলকাতার ট্রাম ও বাস কর্মচারীরা মেহনতী শ্রমিকদের সংগ্রামে সামিল হতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ট্রাম বাস বন্ধ রাখবার আবেদন জানাল। ব্যারাকপুর মহকুমায় কলকারখানায় ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলো।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাগজ পড়েই সুব্রত লাফিয়ে উঠল। বিমলদা—যাবে কেমন করে—কোলকাতায় বাস ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সি চলবে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মেদিনীপুরে বরং ফোন করে দাও।

ফোন করলে হবে না। কোনো মতে হাওড়া স্টেশনে চল্, রিক্সা করেই যাবো। ওখান থেকে তমলুক হয়ে যাবো। নুরপুর, গেঁওখালি না করে মেচেদা, তমলুক মহিষাদল হয়ে যাবো। প্রবীরদা বার বার করে বলেছে, না গেলে সভাটা পণ্ড হবে। চল্, বেরিয়ে পড়ি।

হাওড়া স্টেশনে আসতেই ওরা দেখল কোলকাতা পুলিশের একটা জীপ থেকে নামল সুমিত্রা। [illegible] অনুমান করে নিল বাস ট্রাম স্ট্রাইকের জন্য ওর দাদা বোধ হয় ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে এসেছে।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বলল, আরে সুমিত্রা যে—কোথায় ?

সুমিত্রা ভাবতেও পারে নি সাত সকালে এদের সঙ্গে দেখা হবে। সুমিত্রা চট্ করে ওর দাদা প[illegible]তোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বলল, দাদা ইনিই হলেন বিমল বোস, আর এ[illegible] হলো সুব্রত রায়। এরা আজকাল বিরাট নেতা।

ওর দাদা ব[illegible]ল নমস্কার! আপনাদের আমি চিনি সব খবরই রাখি।

সুব্রত বল[illegible] আপনি সুমিত্রার দাদা, জানতুম না। আপনাকে অনেকবার প্রাইম মি[illegible]স্ট[illegible] মিটিং-এর ব্যাপারে ভবনে আসতে দেখেছি।

সুমিত্রার [illegible]

তা সুমিত্র[illegible] ? তোমারও কি পলিটিক্স নাকি মেদিনীপুরে ?

না মশাই! [illegible] ওসবে দরকার নেই। লেখাপড়ার তো বারোটা বাজিয়েছে [illegible] কেউ জানি না। পাঁশকুড়া স্কুলে একটা ইন্টারভ্যু [illegible] যাচ্ছি।

বাবা, পাঁশ[illegible]! কোলকাত[illegible] এত স্কুল থাকতে শেষ পর্যন্ত পাঁশকুড়া!

কোলকাত[illegible] বিমল। সেগুলোতে পড়াশুনো তো প্রায় বন্ধ হ[illegible] কোথা থেকে ?

সুমিত্রার দা[illegible] গেল। [illegible] সঙ্গে ট্রেনে উঠল।

সুব্রত এবা[illegible] কথা। [illegible]লিটিক্সে চলে এসো না সুমিত্রাদি। কি ফালতু এসব চাকরি [illegible]করি করছ।

মুচকি হেসে জবাব দিল সুমিত্রা। ওসব আমার বুদ্ধিতেও আসবে না, তাছাড়া পলিটিক্সের যে নমুনা বের হচ্ছে দি[illegible] দিন তাতে আঁতকে উঠছি।

আঁতকে ওঠার কিছু নেই সুমিত্রা। এটাই স্বাভাবিক। হাজার হাজার

উদ্বাস্তু ঘর না পেয়ে কলোনীতে পশু হয়ে আছে। বেকারগুলো চাকরি পাচ্ছে না। একটু উত্তেজনা হবে না! বিমল বলল!

বেশ তো, তাই যদি সত্যি হয় তাহলে তোমরা সবাই মিলে বিদ্রোহ করছ না কেন? সুমিত্রার জবাব।

বিমল বললে, করব, কিন্তু তার নেতা কই। পথ কোথায়? আমরা তবু ভেতরে থেকে দু একটা উপকার করতে পারছি। বাকিরা তো শুধু গালাগালি দিয়েই ফয়দা ওঠাচ্ছে। তুমি কি মনে করো ওরা সিন্‌সিয়ারলি কিছু চায়?

সেটা আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু বুঝি যে পাবলিক ভীষণ চটে আছে তোমাদের ওপরে। সুমিত্রা একটু হেসে বললে।

ট্রেনে একজন পেয়ারা বিক্রি করছিল। সুব্রত কিনতে চাইলে কয়েকটা। সুমিত্রা নিজেই ব্যাগ থেকে বের করে দিল খুচরো পয়সা!

সুব্রত বলল, চাকরি পাবার আগে পেয়ারা। চাকরি পেলে কিন্তু সন্দেশ সুমিত্রাদি।

কেন বাপু, চিকেন বিরিয়ানী হবে। তবে চাকরি হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। তার কারণ আমার কোনো ব্যাকিং নেই।

সুব্রত হঠাৎ বললে, আচ্ছা বিমলদা, পাঁশকুড়ার চিত্তদাকে বললে হয় না? চিত্তদার তো খুব ইন্‌ফ্লুয়েন্স। চাকরিটা যদি করে দেয়।

বিমল বললে ঠিক বলেছিস। কিন্তু আমরা তো কেউ যাচ্ছি না সেখানে। বরং একটা চিঠি লিখে দিই।

সুমিত্রা প্রথমটায় আপত্তি করছিল। সুব্রত বলল, সঙ্কোচ কোরো না সুমিত্রাদি। চিত্তদা ভালোমানুষ। উনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। অন্যের হাতে পড়লে প্রথমেই ঘুষ চাইত। (আমাদের কংগ্রেসে ইদানিং আবার দু ধরনের লোক হয়েছে। বোকা কংগ্রেসী—অর্থাৎ জীবনে যাঁরা কিছু পাবার চেষ্টা করলেন না। এদের ভাঙিয়ে আমরা খাচ্ছি। আর একদল হলো চালাক কংগ্রেসী। এদের অনেকেই চোর। এরা আবার গভরমেণ্টকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে।)

বিমল বললে, তুই যে ভাবে দিনের পর দিন বিরাট হয়ে যাচ্ছিস তাতে তুই এ-পার্টিতে টিকলে হয়।

ঠিক টিকে যাব বিমলদা, ও কায়দাটা শিখে গেছি। মার খেলেও বলব না ব্যথা লেগেছে, তাহলেই টিকে যাব।

চিঠিটা ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে সুমিত্রা নেমে গেল পাঁশকুড়াতে।

বিমলরা মেচেদায় নেমেই দেখতে পেল রাস্তার পাশে বিরাট ভীড়। একটু

পরেই এখান দিয়ে অজয় মুখার্জী যাবেন। বাংলা কংগ্রেস তৈরী হয়ে গেছে। অজয় মুখার্জী দলের নেতা হয়েছেন।

রেলস্টেশনের চার দিকে পতাকায় ভর্তি। বাংলা কংগ্রেসের নতুন পতাকা। ভীড়ে গরীব মানুষের সংখ্যাই বেশী। কেউ কেউ শঙ্খ নিয়ে, মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এরা বোধ হয় স্কুলের ছেলে মেয়ে। অনেকগুলো তোরণ হয়েছে অজয় মুখার্জীকে স্বাগত জানিয়ে।

বিমলকে বলল সুব্রত, কিছুক্ষণ থেকে গেলে হয় না? কি প্রচণ্ড ভীড় দেখেছ?

বিমল বললে, ঠিক বলেছিস। একটুক্ষণ দেখে যাই।

দেখতে দেখতে অজয় মুখার্জী এসে পড়লেন। ভীড় সামলানো দায় হলো। হালকা গেরুয়া রঙের বেশ—ঢলঢলে পাঞ্জাবী গায়ে, হাত জোড় করে গাড়ী থেকে নামলেন অজয়বাবু। ভীড়ের মধ্যে থেকে একে একে প্রায় সবার কাছ থেকেই মালা নিলেন।

একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন বাবু? স্বাধীনতার জন্য জেল খাটলেন? কংগ্রেসের জন্য এত খেটে কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন?

কে বললে আমি কংগ্রেস ছেড়েছি। আমি যতদিন আছি কংগ্রেসের নীতি এবং আদর্শ আমার সঙ্গেই আছে। অকংগ্রেসীরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আসল কংগ্রেসে আসবার সুযোগ দিয়েছে। আমি কংগ্রেস কিনা সে বিচার আমার সুপ্রীম কোর্ট মানে তোমরা জনগণেরা করবে!

এইটুকু মাত্র শোনা গেল অজয় মুখার্জীর কণ্ঠে।

বিমল একটু হতাশ হয়েই বলল সুব্রতকে। দেখেছিস কী ভীড়। অথচ এই লোকটাকেই ওরা সব তাড়িয়ে দিল।

তোমার আমার মত তো ঠেকাবার ক্ষমতা ছিল না বিমলদা, ভেবে ল৲ভ কি। তবে দেখ অজয়দাকে আবার ফিরে পাবই।

তমলুকের পথে যেতে যেতে ভবনের কেলেঙ্কারীর কথাগুলো বিমল বলছিল সুব্রতকে। অজয়দা ঘরে বসে থাকতেন সভাপতি হয়ে। একটার পর একটা স্লিপ যেত পাশের ঘর থেকে। কোনটাতে লেখা থাকত শূয়োরের বাচ্চা। কোনটাতে গাধা গরু! আরো কত কি। দিনের পর দিন এই জিনিস চলতো। অথচ যারা এটা করত তারা এখনও ইম্পরট্যাণ্ট লোক।

সুব্রত বেশ আক্ষেপ করে বলল, আর এই দালালদে৲ জন্য আমরা খেটে মরছি। বিমল বলল, আসলে কি জানিস, এই ফ্ল্যাগটা আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিটা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে। কি যে যাদু আছে এতে জানিস না।

,ইউ. এল. এফ. আর. পি. ইউ. এল. এফ. তৈরী হয়ে গেছে।

এত রক্তের পরেও সরকারের বিরুদ্ধে এরা এক হতে পারল না নির্বাচনের আগে। নন্দীগ্রামে সরকারের বিরুদ্ধে একই দিনে দু পক্ষ থেকে মিটিং হলো, বক্তব্য একই কিন্তু নেতৃত্ব আলাদা। সুব্রত নন্দীগ্রামের কলেজের পুকুর পাড়ে বসে রাতে মিটিং সেরে গল্প করছিল। নন্দীগ্রামের অমল জানা বলছিল, সুব্রতদা, এবার বোধ হয় আমরা জিততে পারব না, হাওয়া ভাল নয়। তবে ভরসা আছে যে ওরা সব এক হতে পারে নি।

যা হয় হবে। অত ভেবে লাভ নেই। না জিতলে মনের সাথে একবার লড়াই করব। ওটা তো কেউ কেড়ে নেবে না।

বিমল পাশেই বসে ছিল। অমলের উদ্দেশ্যে বলল, দিন বদলাবার তাগাদা ওদেরও নেই আমাদেরও নেই, রুচি বদলাবার আর নেতা পাল্টে দেবার জন্য লড়ছে ওরা, তাই এক হতে পারল না।

নন্দীগ্রামের কলেজের ছোট পুকুরটার জল ভীষণ স্বচ্ছ। জলের উপর আবছা আলো পড়েছিল একাদশীর চাঁদের। পরিষ্কারভাবে যেন তারই মধ্যে ফুটে উঠেছিল একটা পতনের ছবি, সেই সাম্রাজ্য পতনের মত কোন কিছু।

অমল জানা, বিমল, সুব্রতরা মনের দিক থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল সর্বনাশকে মুখো-মুখি মেনে নেবার জন্য।

খেতে বসেছে ওরা এক সাথে। হোষ্টেলের রান্নাটাই ছেলেরা আদর করে খেতে দিয়েছে। গ্রামে রক্তারক্তির ভাবটা কম। সব দলের ছেলেরাই আছে এখানে, কেউ কিন্তু রক্তারক্তি খুনোখুনির ধার ধারে না। বড়জোড় একদিন কলেজ ইলেকশানে একটু হাতাহাতি—তারপর সব শেষ। কিন্তু এদের সুনাম করে কে? আর কোলকাতার চারপাশে যারা উপদ্রব করে তারাই সব সময় নেতা হবে, আর নন্দীগ্রাম, গেঁওখালির ছেলেগুলো সারা জীবন শুধু মানুষ নিয়ে যাবে ময়দানে ভীড় বাড়াতে, নেতাদের নাটকীয় বক্তৃতায় হাত তালি দিতে।

একটা ছেলের কাঁধের রেডিওতে স্থানীয় সংবাদ শোনা যাচ্ছিল। এক জায়গায় সংবাদটা পেয়েই থেমে গেল সুব্রত। ঘোষক বলছিল—টেক্সম্যাকোর সামনে গতকালের গোলযোগের পর আজ সারাদিন এসব অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হলেও আশে পাশে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। বেলঘরিয়ার নন্দন নগর ঝিলের কাছে আরও তিনটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে—এদের পরিচয় এখনও জানা যায় নি।

পরদিন দুপুরে সুব্রতরা যখন কোলকাতা পৌঁছাল তখন সবকিছু নর্মাল—ট্রাম

বাস স্বাভাবিক ভাবে চলছে। শুধু কাগজে কয়েক জনের মৃত্যু সংবাদ ছাড়া আর সবই নির্বাচনী সফরের কথা। পার্টি অফিসের দরজার কাছে কয়েকজন ছেলে বসে। সুব্রত আসতেই বললে, আজ সকাল থেকে আগরপাড়ার অলককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

॥ দশ ॥

ইলেকশানের কাজ শেষ।

ভোটের ব্যালট কাগজ বোঝাই বাক্সগুলো সব গাড়ীতে করে, কুলির মাথায়, নৌকোয় করে সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় কালেক্টরের অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, নেতাজী সুভাস ইনষ্টিট্যুটে জমা হচ্ছে।

কাউন্টিং শুরু হবে। গণতন্ত্রের এত বাক বিতণ্ডা, দাপাদাপি, লাফালাফি জগঝম্পের মত শব্দ করে শ্লোগানের ধ্বনি সব কিছুই সেই মহালোকে মহানন্দে মহাসুখে পরিসমাপ্তির জন্য। সেই মহালক্ষ্য হলো ভোট।

ভোটের মিটিং করতে এসে কোনো এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেন বলেছিলেন মাইকে—অস্পষ্টভাবে শোনা গিয়েছিল দূর থেকে খিদিরপুরের বস্তিতে—

'আমাদের সবার সমান ক্ষমতা।' দেশে আমরা সমান অধিকার দিয়েছি সবাইকে। সেখানে 'রাজরানী কি লিয়ে ভি এক ভোট, আউর মেথরানী কি লিয়ে ভি এক ভোট।' ভীষণ হাততালির শব্দ ভেসে এল, সেই সঙ্গে কিছু জিন্দাবাদ মন্ত্রীর বক্তৃতার পরেই। কি চমৎকার কথা। রাজরানী আর মেথরানীর সেই সমান অধিকার। একজনের বাথরুম আছে, ঘর আছে, অন্ন আছে, জাত আছে, প্রতিপত্তি আছে আর রাজন্যভাতা আছে। আর একজন সারাজীবন সেই বাথরুম পরিষ্কার করবে, গৃহহীন হয়ে শূকর গরুর সঙ্গে খাটালের একপাশে রোদে জলে বস্তির ভেতরে বাস করবে, নিতান্ত মালিকের দয়ায় সামান্য বকশিষ মাঝে মাঝে ওদের দিনান্তের ক্লেদকে ভুলিয়ে রাখতে সামান্য দিশী মদের ব্যবস্থা করে দেবে। অথচ তবুও কি সুন্দর ব্যবস্থা—রাজরানী কি লিয়ে ভি এক ভোট—মেথরানী কি লিয়ে ভি এক ভোট।

এই মহান অথচ পবিত্রতম শক্তিশালী অধিকার প্রয়োগ করার আগেই স্বর্গ থেকে নেমে আসেন দেবকূল, শুরু হয় নৃত্য, গীত, বাদ্য। দলের নেতা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে বড় বড় সব বুদ্ধিজীবি সবাই এ সময়ে ছেঁড়া চটি পায়ে বস্তির মানুষের দুঃখ দেখতে ছুটে আসেন। একটা প্রচণ্ড কিছু করা উচিত এই মন্তব্য করে স্বর্গের

দেবতাদের (?) দরবারে সব খবর পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবশেষে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে যাত্রা করেন। বস্তিবাসী, গ্রামবাসী, চাষী, মুটে মজুরের দল সারা 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' ঘুমুতে যাবার আগেই ঠিক করে দর দিয়ে কিনে নিতে চায় যাচাই করে যে কাকে বরমাল্য দেবে।

ওদিকে রাজরানীর ও মেথরানীর সমান অধিকার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত দেবকুল ঘর্মাক্ত হয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসারদের ডেকে রাজভবনে, রাইটার্সে কিংবা দিল্লীর হোম মিনিষ্ট্রীতে রিপোর্ট জানতে চাইছেন ইলেকশান প্রস্‌পেক্টের, —তখন আই, বি-র কেউ তাদের পেণ্ডিং প্রমোশন এ্যাপ্রুভ করিয়ে নেবার তাগিদেই হোক আর স্তাবকতার পদ্মশ্রী পাবার লোভেই হোক—টু-থার্ড মেজরিটির অঙ্কটা যে সরকার পক্ষের সিওর—এটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। রাইটার্সে একদিন এই রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছিল যে ব্যারাকপুরে আর চব্বিশ পরগণার শহরাঞ্চল যদি সরকার পক্ষের ফরে হয় তাহলে সারা বাঙলার মফস্বলে যে জিতবে এর মানে কি?

আই. বি. বোঝাতে চাইল, না স্যর, মানে যেখানে যেখানে এ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স (মানে আন্দোলনকারীরা) হল্লা করছে এবং আমরা (ম্যান ন্যাশনাল প্যাট্রিয়ট ফোর্স) গুলি চালিয়েছি—সেখানে সামান্য লোকসান হবে। তাছাড়া সারা বাঙলা ঠিক আছে।

বাঃ! বাঃ! চমৎকার বলেছে! কারেক্ট এ্যানালিসিস, সঙ্গে সঙ্গেই ফোন তুলে ভবনে যেন কাকে ফোন করে বলা হলো, ওহে আছ নাকি, আরে রিপোর্ট দেখলাম, আমাদের জিত হচ্ছে। কুছ পরোয়া নেই।

গম্ভীর গলায় উত্তর এলো টেলিফোনে—আমাদের মধ্যে আমাদের যারা হারাবে সেই রিপোর্টটাও আই. বি-র কাছ থেকে জেনে নাও। বুঝলে? টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আই. বি রিপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে যখন রাজরানী, মেথরানী, চাকরানীদের সমান অধিকারের গড় হিসেব চলছে তখন জেলার কর্মকর্তা ও প্রশাসনের বৃহৎ কো-আর্ডিনেশন কমিটি, জেলা গঞ্জ, বি. ডি. ও. অফিস, সার্কেল অফিস, পোষ্ট অফিস সর্বত্র বিবেকানন্দের এডিটোরিয়াল, বসুমতি কাগজ আর উৎপল দত্তের "দিন বদলের পালা" দেখেছে ও দেখাচ্ছে।

অদ্ভুত সব বন্দোবস্ত। কেউ খেপেছে মাগ্‌গী ভাতার জন্য, কেউ খেপেছে তার বন্ধু বা আত্মীয় ইলেকশানের টিকেট পায় নি তার জন্য—কেউ খেপেছে তার ইনক্রিমেণ্ট ডিউ আর প্রমোশন এখনও হয় নি বলে। সব ক্ষ্যাপাদের ক্ষ্যাপামিকে নিয়ে সরকারী কর্মচারীদের কোনো কোনো নেতা চিৎকার করে

সভা সমিতিতে বোঝাতে চাইলেন যে সরকার কত ভয়ঙ্কর দানব এবং কি তার ভয়াবহ শোষণের শক্তি। কারণ মাগ্‌গীভাতা আর ইনক্রিমেণ্টের প্রশ্নে সরকার আশ্চর্য রকম নীরব। তাই বন্ধুগণ, আর চুপ করে থাকার দিন নয় আমাদের এখন আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন, আজ আমাদের অনুশোচনার দিন নয়—জেগে ওঠার দিন।

ডালহৌসির লালদিঘিকে সাক্ষী রেখে ইলেকশানের আগে কতবার যে অফিস পাড়ার টিফিন পিরিয়ডে মাগ্‌গী ভাতা আন্দোলনের দেশ প্রেমিক বিপ্লবী নেতারা অকারণে নজরুল সুকান্তের উদ্ধৃতির ব্যবহার করে 'স্বজন হারানো শ্মশানে' চিতা জ্বেলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অথচ তখন গ্রাম বাঙলার দুঃখী মানুষ আর দরিদ্র শিক্ষক নাগরিকদের ছোট খাট আবেদনের ফাইলগুলো পেপার ওয়েট চাপা পড়ে মাসের পর মাস লাল ফিতা মালা গলায় নিয়ে চিতার মত শুয়ে আছে। চিতায় আগুন পর্যন্ত কেউ দেয় না। লাশ পচে দুর্গন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তখনও ফাইল আর ক্লিয়ার হয় না।

নজরুল আর সুকান্তের সবচেয়ে বড় আফশোষ এই যে তাঁদের গান যদি মাগ্‌গী ভাতা আন্দোলনের পাশ কাটিয়ে যদি ডালহৌসির বোনাস, ইনক্রিমেণ্ট, টেষ্ট খেলার টিকিট, দেরাদুন, মুসৌরীতে বেড়াতে যাবার আবেদন পত্র আর পান দোক্তার-গুলতানি মারা ক্যান্‌টিন জাতীয় কমিউন থেকে মুক্তি পেয়ে, পা ফেলে ফেলে সুন্দরবনের লাঞ্ছিত কৃষক, বাদুরিয়ার অপমানিত শিক্ষক আর সাঁওতালদের জমি পাবার আন্দোলনে গিয়ে পৌছত তাহলে জরিয়াদের আবেদনে অনেকের লাশই স্বজন হারানো শ্মশান চিতায় জ্বলত। তা হলো না বলেই বাদুরিয়া স্বরূপ নগরের নুরুল ইসলামের মায়ের ঘর অন্ধকার, সেখানে কেরোসিন এখনও পৌছায় নি, কিন্তু নিয়ন আলোতে নুরুলের মাকে নিয়ে কলকাতায় সভা হয়েছে।

মাগ্‌গী ভাতা আন্দোলনের এক বিরাট অংশ ক্রুদ্ধ হয়েও নির্বাচন নামক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষ কাজের দায়িত্ব পেয়ে শহর গ্রামে চলে গেলেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতার যা কিছু খেদ, বিরক্তি আর কষ্ট চলল তাদের বাক্স পেঁটরার সঙ্গে। তারপর অতি নিরপেক্ষ ভাবেই রাজরানী ও মেথরানীদের মতামত শেষ হলো। সব দলের নেতারাই যে যার অফিসে বসে। তখন আর আই-বি রিপোর্ট, বসুমতীর কমেণ্টে কারো ইণ্টারেষ্ট নেই। সব কিছু বাক্স বন্দী হয়ে আছে। একটু পরেই বের হতে শুরু করবে।

সব দলেরই যাঁদের একান্তই মন্ত্রী হবার বাসনা তাঁরা সত্যনারায়ণের সিন্নি,

কালীমায়ের পুজো আর দরিদ্র ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর একটা চান্স নিয়ে দেখতে চান পুণ্যর ঘরে কয় কিলো পুণ্য বেশী হলে ওজনটা মানানসই হবে ভাগ্যের হাটে।

আলিমুদ্দীন ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, আর উনষাট বি চৌরঙ্গীতে স্পেকুলেশন পর্ব শেষ হয়ে এক্সপেক্টেশন্ ও ক্যালকুলেশান পর্ব শুরু হয়ে গেছে। বিমল সুব্রতর দলবল মির্জাপুরের নটবরের দোকানের তেলেভাজার প্যাকেট নিয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে নিজেরাও বলাবলি করছিল, কি যে হবে ভাই—কাল বাক্স থেকে কি যে বেরুবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

স্টেটসম্যান কাগজ টয়নবি-র প্রবন্ধ নিয়ে সাম্প্রদায়িক উসকানি যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তাকেও সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছে কেউ কেউ। তবুও দাপটে আবুল হাসানদের হারিয়ে দিয়ে বিজয়বাবুর জয় সুনিশ্চিত একথা বলছে অনেকেই। ইলেকশানের প্রচার পর্ব ভোট পর্ব শেষ হয়ে এখন গণনা পর্ব শুরু হবার মুখে এসে বিমল বলেছিল সুব্রতকে, লোকজন কিন্তু কম জখম আর খতম হলো না।

এর তো সবে শুরু বিমলদা। দেখ না আর কি হয়। সুব্রত জবাব দিল।

সুব্রতর সংক্ষিপ্ত জবাব পাবার আগেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে ভেঙ্গে যাওয়া একটা শহীদ বেদীর দিকে তাকাল বিমল, দেখ দেখ সুব্রত, বোধ হয় ক'দিন আগেই কেউ এটা বানিয়েছিল, আর আজ ভেঙ্গে পড়ে আছে।

কারণ ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে বিমলদা। হয়তো আমাদের ছেলেদের হতে পারে কিংবা অপোজিট পার্টিরও হতে পারে। গোটা পনের টাকা খরচ করতে হয়েছিল এই যা। এখন ইলেকশান শেষ, সেন্টিমেণ্ট শেষ, শহীদরা আপাততঃ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাসিত। আবার দরকার হলে নতুন শহীদদের প্রয়োজন দেখা দেবে। বেশ হতাশার সুরেই সুব্রত কথাটা বলল।

বিমল আর কিছু না বলে একটা ট্যাক্সি ডেকে ভবনে চলে এল। ওরা যখন ভবনের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে তখন বেশ বড একজন নেতার সঙ্গে লিফ্‌টে করে নেমে এলেন সেই রমাদি—আলিপুরে যার বাড়ী। ইউনিভারসিটির জার্নালিজম ডিপার্টমেণ্টে বড় বড় গাড়ী করে সে মাঝে মাঝে আসে।

সুব্রত সিড়ির মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে গাড়ী বারান্দায় একটা বড গাডী এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ী করে রওনা হয়ে গেল রমাদি—সেই বড নেতার সঙ্গে কোথায় কে জানে।

বিমল জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে সুব্রত, এখানে কেন রে? ঠিক দেখেছি তো?

একেবারে ঠিক বিমলদা। আগেই বলেছিলাম না গোলমেলে ব্যাপার আছে। তুমি তখন সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলে।

স্টোরকীপার সুশীলদাকে জিজ্ঞেস করল সুব্রত, কি ব্যাপার সুশীলদা, ওই গাড়িতে যে গেল ওঁকে চেনেন?

স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে কাজ করতে করতেই জবাব দিল সুশীলবাবু, চিন্তা তোমাদের কাজ কি। যা করনের তাই তোমরা কর। নেতাদের পিছে পিছে নজর রাইখ্যা বড হওন যায় না বুঝলা?

সে তো আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি। স্টোর কীপার অবধি শেষ প্রমোশন। অথচ সারাজীবন—

সুব্রতর কথা শেষ না হতেই চটে উঠল সুশীলবাবু, কি কইল্যা, মুখের একেবারে লাগাম্ নাই—বিমল হস্তক্ষেপ করল উভয়কে শান্ত করতে। এমন সময় আদিত্য ছিল কাছে।

আদিত্য সুব্রতকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বোঝাল যে ভদ্রমহিলা হলেন রমা মিত্র। একজন বিশেষ নেতার ইয়ে আর কি। নেতার বাড়ী ল্যান্সডাউনে।

ইউরেকা করে লাফিয়ে উঠল সুব্রত। আরে একেই তো বেলঘরিয়া থেকে ল্যান্সডাউনে পৌছে দিতে হয়েছিল। পরে আরও জানা গেল—আদৌ এর বাড়ী আলিপুরে নয়। বাড়ী হলো নিমতায়। তবে প্রায়ই এসে কোলকাতায় থাকে। ডালহৌসি পাড়ায় এক অফিসে তার ভাই কাজ করে। সেখান থেকেই গাড়ী আসে রমাদেবীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে।

বিমলের আর বুঝতে বাকি রইল না যে নন্দীগ্রামের কলেজের সামনের পুকুরে চতুর্দশী চাঁদের আলোয় সাম্রাজ্য পতনের ছবিটা দেখেছিল—আর চিনেও, যে আকৃতি ফুটে উঠেছিল এখানে ওখানে শহীদ বেদীতে—তার পছনে আছে অনেক অবক্ষয়ের কাহিনী, অনেক অন্যায় আর নৈতিক অধঃপতনের ইতিহাস। গান্ধীর 'হা রাম হা রাম' বলে মৃত্যুকালীন প্রার্থনা, সুভাষের দেশপ্রেম আর দেশবন্ধুর মৃত্যুহীন প্রাণের কোন মূল্যই দিতে প্রস্তুত নয় ভবনের অনেক নেতা। তাই কম দামে জিনিস নীলামের হাটে যে সে কিনে নিতে আসছে। দর দিয়েছে পি-ইউ-এল-এফ, দর দিয়েছে বাংলা কংগ্রেস, দর দিয়েছে ইউ-এল-এফ। কোন হাটে বিকোবে এ তরী কিংবা বন্ধক থাকবে কেউ জানে না। বিমল সেদিন সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। বারে বারে সুমিত্রার সেই পাঁশকুড়া যাবার সময়কার একটা কথা মনে পড়েছে—পলিটিক্সে যাব না। যা নোংরামি। তাছাড়া দিন দিন একে যা করে তুলেছেন—তাতে

ওর মধ্যে আমরা কেন বাপু।
সত্যিই তো। কেউ যদি না আসে, সবাই যদি ঘৃণা করে তাহলে এই নোংরামির প্রাসাদে জমে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব কে নেবে? এত দুর্গন্ধময় সমাজে প্রাণভরা নিঃশ্বাস নেবে কে? আকাশ বাতাস বিষাক্ত, সমাজ বিষাক্ত —যেন একটা বিরাট গ্যাস চেম্বারে পুড়ে মরছি আমরা প্রতিনিয়তই।

॥ এগার ॥

কংগ্রেস হেরে গেল।
কোলকাতার ল্যাম্প পোষ্টগুলো লাল কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো। এমন ঘটনা ঘটল বহরমপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, ব্যারাকপুর আরও অনেক শহরে। হেরে গেলেও বিরোধী পক্ষের উল্লাস তেমন তীব্রতা ধারণ করে নি। সম্ভবতঃ এর কারণ হবে বিরোধী জোটের শেষ সিদ্ধান্ত স্থির না হওয়া। অর্থাৎ ইউ-এল-এফ এবং পি-ইউ-এল-এফ প্রভৃতির ঐক্য।
একশ' সাতাশের কাছে এসে স্কোর বোর্ডের কাঁটা স্থির হযে গেল। অপমানিত, তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত ও কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে বহিস্কৃত অজয় মুখার্জীর ছোট্ট প্রয়াস ছোট্ট দল কিন্তু বিরাট সাফল্য বহন করে আনল। অবশেষে সত্যিকারের সুপ্রীম কোর্টের রায় সত্যি সত্যি অজয়বাবুর পক্ষেই গেল।
গণতন্ত্রে রাজধানী এবং মেথরানীর সমান অধিকার, শিক্ষিত অশিক্ষিতের সমান অধিকার বলেই হয়ত অধর হালদার, ভুধর মালী, আর রাম চ্যাটার্জীরাও জনতার রায়ে সমান অধিকার প্রয়োগের সুযোগে মর্যাদার মূল্য পেলেন। একশ সাতাশের কংগ্রেস সেদিন উনষাটের বি চৌরঙ্গীর সান্‌মাইকা দিযে মোড়া, পালিশ করা টেবিলগুলোর পাশে নেতাদের বসিয়ে তখনও অঙ্ক কষে চলছিল। এ কেন হলো? এ কেমন হলো? এঁদের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী সুবাদারের মত সারাজীবন মন্ত্রীত্ব করবেন ভেবেছিলেন কিংবা রাজভবনকে বেস করে সোস্যাল এ্যারিস্টোক্র্যাসির স্পেশাল ক্যাটাগরির লিস্টে রেখে পুত্র কন্যা, ভাগ্নে ভাগ্নীদের ডন্‌বসকো, লরেটো, ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের কস্ট্যুমে সাজাতে চেয়েছিলেন—তাঁদের শিরে সর্পাঘাত হলো। সর্বনাশ এলো অকস্মাৎ। কয়েকজনের গৃহিণী ও জামাতা মূর্ছা গিয়েছিলেন। সেই যে মৃগীরোগ শুরু হলো—তা সারাতে সময় লেগেছে অনেক দিন।
পার্সেণ্টেজের হিসেবে গড় ভোট কংগ্রেস বেশী পেলেও পদ্মজা নাইডুর সাংবিধানিক চাহিদা মেটাতে যা পাওয়া উচিত ছিল তা পাওয়া গেল না।

বিশিষ্ট কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সাংবাদিক-কাম-ছেলে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার ইনচার্জ-কাম-গভীর রাতে সংবাদ সরবরাহকারী-কাম-ব্যক্তিগত ভেরী-বাদকের কয়েকজন যারা মিটিং করার শেষে নেতার গাড়ীতে উঠে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সঙ্গে কাঁচাগোল্লা আর ফিসফ্রাই মুখে নিয়ে নেতাকে বলতেন, আপনি তো গ্ল্যাডস্টোন ডিজরেলিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। কোথায় লাগে বিপিন পাল !

আরে বলছ কি ? কি এমন বলেছি। আরো বলতুম—টাইম পেলুম না। একবার আমার বক্তৃতা শুনে পণ্ডিতজী তো আনন্দে আত্মহারা।

আপনি যা বলেছেন এর পরে আর কোনো পার্টিকে কিছু করে খেতে হবে না। কি অদ্ভুত এ্যানালাইসিস। বিশেষ করে মিল মালিকদের বিরুদ্ধে যে ল্যাংগুয়েজ বললেন, এতটা আমিও ভাবি নি।

ভাল করে ছাপিও কিন্তু। গদগদ হয়ে নেতা বললেন।

কাঁচাগোল্লা গলাধঃকরণ করতে করতেই সেই অল্ পারপাস বশংবদ সাংবাদিকটি বললেন, আমিও ভাবছি—স্পেশাল রাইট আপ করব।

বলা বাহুল্য, এসব বশংবদের তালিকায় যাঁরা ছিলেন না তাঁদের সংখ্যাই সর্বাধিক। কিন্তু তাঁরা জীবনে মোটা ইনক্রিমেণ্টও পেলেন না, গভরমেণ্টের রেকমেণ্ডেশনে সস্তায় ফ্ল্যাট আর ভাইয়ের জন্য কোলকাতায় একটা রেশনের দোকান থেকে সারা জীবনের জন্য বঞ্চিত হলেন।

বশংবদ চাটুকার যখন বন্দনা গাইছেন তখন সেই নেতা গ্যাস খেয়ে ফুলছেন আর ভাবছেন—আমিই সব। আমি দিবালোকে নেতা—রাতে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরার একমাত্র সুপুরুষ। দীঘা আমার, দিল্লি আমার, লোক আমার, টাকা আমার, কাগজ আমার—সবই আমার! আমিই মর্ত্যলোকে গান্ধী, সুভাষ, দেশবন্ধুর একমাত্র ইউনাইটেড এজেন্ট। বাগান বাড়ি আমার। সব কিছু আমার। আমি সত্য আমিই মিথ্যা। আমাকে অগ্রাহ্য করার মানেই অজয় মুখার্জী হওয়া। আমাকে অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। একশ সাতাশ হবার পর এই সব কালজয়ী, মহান দূরদ্রষ্টার দল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের মহান অধীশ্বরের একাংশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ততক্ষণে শিয়ালদার গেটে হকার সুর করে টেলিগ্রাম বিক্রি করতে শুরু করেছে—

আরে লইয়া যান, লইয়া যান—মজার কথা লইয়া যান—কংগ্রেস সরকার চিংপটাং—লইয়া যান, লইয়া যান।

সবাই কিনছে। একটা দুটো করে হাজার হাজার টেলিগ্রাম গেল। দাপট কি

বসুমতীর সেদিন। বসুমতী ধন্বন্তরী। বসুমতীর খবর মকরধ্বজের মত কাজ করছে তখন।

আধপোড়া চুরুটটা টেবিলে রেখে গালে হাত দিয়ে বসে হাওড়ার রবীন্দ্রলাল সিংহ। ক্লান্ত সুহৃদ রুদ্র। বিমর্ষ বিজয়ানন্দ। একটু সাহস আর দৃঢ়তা দেখা গেল ২৪ পরগণার হংসধ্বজ ধাড়ার চোখে। যেন বেশ দাপটের সঙ্গেই বললেন, হয়েছেটা কি? আমরা মরে গেছি নাকি? আবার হবে। লড়াই হবে খাটতে হবে। দাপটের প্রমাণ দিয়েছিলেন হংসধ্বজ ধারা খাদ্য মিছিলের দিন।

কংগ্রেস নেমে এসেছে মিছিল করতে, খাদ্যের মিছিল। মহাকরণের চারদিক থেকে মিছিল। সবচেয়ে বিশাল মিছিল এনেছিলেন হংসধ্বজ ধারা চব্বিশ পরগণা থেকে। মিছিল তো নয় সাগর—কাকদ্বীপ থেকে যেন গোটা বঙ্গোপসাগর তুলে এনেছেন।

বেশ কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ লোকের মিছিলে রাজভবনে প্রথম অভিষেক হলো ভারতীয় গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনীতির রূপকারদের। পদ্মজা নাইডুর শেষ অনুষ্ঠান। ততক্ষণে সংবাদ এসেছে আরও। বিহার, উড়িষ্যা, মনিপুর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাজে পতনের এসেছে। ধস নেমেছে যেন উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম—সারা ভারতে। নানা রকমের ধস। সেই ধসে কংগ্রেসের মহাপতন।

কুমারস্বামী কামরাজের মাদ্রাজ চলে গেল আন্নাদুরাই-এর কাছে। অতুল্যদা, প্রফুল্লদার বাঙলা গেল অজয়বাবু, জ্যোতিবাবুর হাতে। বীরেন মিত্রের উড়িষ্যা গেল সিংদেওর হাতে। জগজীবন রামদের বিহার গেল মহামায়া প্রসাদ, কর্পূরী ঠাকুরদের হাতে। ডি. পি. মিশ্রের মধ্যপ্রদেশ গেল গোবিন্দ নারায়ণ সিং-এর কাছে, সুচেতার উত্তরপ্রদেশ গেল চরণ সিং-এর কাছে।

এত পতনেও দিল্লিতে আর্তনাদ হয়েছিল কিনা জানা যায় নি। কিন্তু উনষাটের বি তে কোনো আর্তনাদ ছিল না। আতঙ্কও ছিল না। আতঙ্কের ছায়া নামল সেদিন বিমল, সুব্রত, সুমিত্রার মতো আরও অনেকের মুখে। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তৈরী ওরা নবজাতকের দল—শিশুতীর্থের যাত্রী।

নন্দীগ্রামের পুকুরের জলে চতুর্দশীর রাতে যে সর্বনাশ দেখেছিল বিমল তাই যেন বাস্তবে প্রতিবিম্বিত হলো। এখন উনষাটের বি তে নিয়ন আলোটাও ম্লান, মোজেইক করা ফ্লোরেও যেন পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। লিফ্‌টে করে নামতে কেউ যেন আর চাইছে না।

কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে এই বাস্তবটাকে যেন মেনে নিতে পারছে না অনেক নেতা। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার থেকেও অঘোর ঘুমুচ্ছে হাইকম্যাণ্ড। আর মুখরিত রাজপথে পিপলস্ ব্র্যাণ্ড বিরোধী দলেরা।

ঘন ঘন ফোন আসছে। অনেকে যেন আরও সিওর হতে চায় রেজাল্ট সম্বন্ধে। গালি গালাজ দিয়েও ফোন আসছে—

কি রে শালা—অমুক বাবু কোথায়রে শালা—তোরা মন্ত্রী হবি না রে শালা! বিরোধী পক্ষের সমর্থকরা ফোনের মাধ্যমে যা ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল এদের জন্মাবার পর এদের পিতামাতা এদের মুখে মধু দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত টেলিফোন রিসিভ করা বন্ধ করতে হলো।

জগদ্দলের বিনয় সমাদ্দার মালা নিতে এসেছে ভবনে, তার ক্যানডিডেট ভোটে জিতেছে বলে নেতাদের অভিনন্দন জানাতে। সঙ্গে বিজয়ী ক্যানডিডেটও। কিন্তু মালা পরাবার মানুষগুলো যেন মনের দিক থেকে আর তৈরী নয়। দোতলার ঘরে ঢুকতেই বলা হলো—ওগুলো রেখে দাও—সবাই তো জিততে পারে নি।

দিল্লীও স্তম্ভিত। তখনও দিল্লীর হাল ঠিকভাবে গুছিয়ে নিতে পারেন নি ইন্দিরা গান্ধী। তখনও নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজদের উঠোন পেরিয়ে কোনো কাজই হয় না। সুব্রত ঠিকই আঁচ করেছিল যে গণ্ডগোল এবার শুরু হবে। যেভাবে "বাঙলা কেরল লাল সেলাম" বলে মিছিল বেরিয়েছে পাড়ায় তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। তবুও সেবাদলের অমল, ভবানীপুরের ননীদা, কদমতলার শক্তি আর নৈহাটির গোলকেশবাবুদের চেষ্টায় অনেক ছেলে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল সেদিন রাতে যারা সবচেয়ে বেশী হৈ চৈ করেছিল ইলেকশানে। তারপর শুরু হলো ঘর ছাড়ার কাহিনী। এই কাহিনীর সূচনা ও সূত্রপাত বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম। এলাকা দখলের মহড়া শুরু হলো দ্রুত।

এদিকে ইউ-এল-এফ, পি-ইউ-এল-এফ, বাংলা কংগ্রেস মিলে সরকার তৈরীর উদ্যোগ সম্পূর্ণ করলেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা আসলে কে পাবে তাই নিয়ে একটু যা সময় নেওয়া হলো—তা না হলে পদ্মজা নাইডু তো শপথ করাতেই বসে ছিলেন।

তারপর সেই স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের মিছিলে মিছিলে একাকার ময়দান। বেশ নাম করা একজন মহিলার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান। হয়ত বা "আমাদের যাত্রা হলো শুরু" কিংবা "আগুন জ্বালো" এমন কিছু হবে। গর্ব

করে 'দিন বদলের পালা'র রূপকার নাট্যকারেরা দাবী করলেন দিন বদলের কাজ নাকি শুরু হলো। মার্কস, গান্ধী, নেতাজী প্রভৃতি সকল দর্শন একত্রিত হলো ষোল দফায়। এমন ঐতিহাসিক মহামিলনের রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিপূর্বে কেউ দেখার সুযোগ পায় নি।

রাজভবনের মন্ত্রীনিবাস থেকে খদ্দর বিদায় নিল। মন্ত্রীদের গাড়ীর চিরপরিচিত ড্রাইভাররা বিদায়ী মন্ত্রীদের শেষ দিনের সেলাম জানিয়ে গাড়িগুলো পুলে ফেরত নিয়ে এল। দু একজন মন্ত্রীর ভাগ্নীর নিউ মার্কেটের মার্কেটিং বাকি ছিল। বাকি ছিল রমা মিত্রের একটা শাড়ি, বাকি ছিল বারুইপুরের বাগান-বাড়ীতে একটা পার্টি। বাকি ছিল ফুলেশ্বরের ডাক বাংলোয় ইরিগেশনের একটা পিকনিক্। সবগুলোই বাকি রয়ে গেল। বাকির খাতা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গেল।

একদিন শ্লোগান ছিল স্বদেশী আন্দোলনের "ওগো ভদ্দর পরো খদ্দর।" চরকার গানে মুখরিত ছিল গ্রাম বাঙলার নদনদী। আজ যেন তাড়াহুড়ো করে "কেবা প্রাণ আগে করিবেক দান"-এর মতো খদ্দর ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেল। বেশ নাম করা একজন মন্ত্রী তো হঠাৎ করে হ্যাণ্ডলুমের গেরুয়াকে খদ্দর বলে ম্যানেজ করে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। বাকি কয়েকজন ছাড়া অনেকেই মিলের কাপড়ের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠলেন।

এই প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে অবিচল প্রত্যয় নিয়ে বিমল, সুব্রতর মত হাজার ছেলের চোখের জল আর নিদারুণ পরিস্থিতির কথা জেনে যে দুটি মানুষ এগিয়ে এলেন তাঁর একজন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, অপরজন ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। কিন্তু তখন ধস এত জোড়ে নেমেছে যে বুলডোজার দিয়ে ঠেকানো দায়। প্রতাপ-বাবুরাই বা কি করবেন। বেহালার সত্যিকারের সর্বহারা সুবীর কুমুদের দল কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে এগিয়ে এল।

এর ক'দিন পরেই রাত একটা নাগাদ ফোন এল মহাজাতি সদনে বিমলের কাছে —সর্বনাশ হয়েছে। আমি উত্তরপাড়ার নির্মল বলছি শ্রীরামপুর থেকে। উত্তর-পাড়ায় অজয়দের বাড়ী পুড়ে গেছে। ত্রিবেণীর ব্যোমকেশদা, শিশিরদা এ্যাটাকৃড হয়েছে। কে মরেছে কে বেঁচেছে জানি না। আপনিই সকালেই চলে আসুন।

দু একজন নেতার নাম করে বিমল বলল তাদের ফোন করতে।

পরক্ষণেই নেই উত্তর এলো, সবাইকে ট্রাই করেছি কেউ ফোন তুলছে না।

বুঝতে আর বাকি রইল না বিমলের সে ফোন আর কোনো নেতাই তুলবে না।

তারপর এই রাতে অগত্যাই প্রতিশ্রুতি দিতে হলো বিমলকে যে সকাল বেলাতেই সে উত্তরপাড়া যাবে। শুধু নির্মলকে জানিয়ে দিল উত্তরপাড়ার অলক যেন খবর পায়। খবর পেলে ছুটে সে আসবেই। দূরে থাকবে না।

শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। চিরকালের রাজার দল প্রজার কাছাকাছি চলে এলো রাজ্যপাট হারিয়ে। অথচ যে মহামানবটি ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও সারা জীবন সবরমতীর আশ্রম, ওয়ার্ধার আশ্রম আর গ্রামের মানুষটির সবচেয়ে কাছে রইলেন তার কোনো নির্দেশও যদি রাজ্যপাটে থাকা মানুষগুলো শুনত তাহলে এমন করে প্রজার কাছে এসেও বঞ্চনা ভোগ করতে হতো না।

॥ বারো ॥

আকাঙ্ক্ষিত না হলেও অপ্রত্যাশিত ভাবেই যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়ে গেল। এত প্রতিবাদ মিছিল আর সমাবেশ সত্ত্বেও কিন্তু প্রেসিডেন্সীর বহিষ্কৃত ছাত্র ফেরত নেওয়া হলো না। ইউনিভার্সিটি খুলে গেল। প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বের সঙ্গে হয়তো বা বিপ্লবের প্রশ্নে কিম্বা চীনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিপর্যয় ঘটে গেল। কিছু দিনের মধ্যেই পি. সি. এস. এফ. হিসেবে (প্রেসিডেন্সী কলেজ ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন) যে ছোট্ট শক্তিটি আত্মপ্রকাশ করল তাই কালে কালে বাংলায় নকশাল আন্দোলনের প্রথম জ্বালামুখ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এত উলট পালট সত্ত্বেও ছেষট্টির এম. এ. পরীক্ষা কিন্তু সাতষট্টিতেই হলো। ক্যারিয়ার কাদের নষ্ট হলো জানা না গেলেও সুমিত্রার যে ক্ষতি হয়েছিল এটা জেনেছিল বিমল।

পাঁশকুড়ার স্কুলের চাকরিটা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি সুমিত্রা। ম্যানেজিং কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের রক্ষিতা—কাম—ভাগিনী—কাম—দুঃস্থা তরুণীকে সাহায্য করার ব্রত নেওয়াতে অকস্মাৎ সুমিত্রার চাকরীতে ছেদ পড়ল।

স্কুলে গিয়ে টেন ও ইলেভেনের ছাত্রীদের পড়াবার দায়িত্ব পেয়েছিল সুমিত্রা চিত্তবাবুর ব্যাকিং-এ। কিন্তু রাজনীতিতে উত্থান-পতনের স্বাদ পেয়েছিল পাঁশকুড়ার স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। সেখানে বাংলা কংগ্রেসী প্লাবনে অন্যান্য শরীকদের যে প্রতিচ্ছবি ক্রমশ ফুটে উঠেছিল, তার ফলে জমির মালিক বা জোতদার-মার্কা কংগ্রেসী অথবা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টরা খাদি ছেড়ে

হ্যাঁগুলুম-মার্কা নিরপেক্ষ হয়ে গেলেন। সুযোগ বুঝে তাঁদের খুশি করতে যাওয়া একদল স্তাবকের আত্মীয়-স্বজনরা চাকরী দাবি করে বসল।
অগত্যা সুমিত্রাকে পাঁশকুড়ার ছোট্ট স্কুল কোয়ার্টার্সের কুঁড়ে ঘর ছাড়তে হলো। সে দিন বোধহয় স্কুলের কোন পরীক্ষা চলছিল। বিকেল নাগাদ হেড মিস্ট্রেসের ঘরে ডাক এল সুমিত্রার।
—আপনি নিশ্চয়ই অভাবগ্রস্ত হয়ে চাকরি করতে আসেননি? হেড মিস্ট্রেসের মুখ থেকে কথাটা শুনে একটু অবাক হল সুমিত্রা। হেড মিস্ট্রেসের পাশে বসে সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্কিম দাস।
না, মানে অভাবগ্রস্ত না হলেও শখ করে যে আসিনি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সুমিত্রার ছোট্ট জবাব।
এবার একটু কেসে নিয়ে বঙ্কিম দাস বললেন, আমাদের স্কুলের প্রায় প্রতিটি হায়ার ক্লাসের ক্ষেত্রেই আমরা এম. এ. নেব ঠিক করেছি। তাছাড়া আপনি তো এম. এ. নন। আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে। সব এম. এ. পাশ টিচার দেখাতে না পারলে গ্রান্ট পেতে অসুবিধে আছে।
কিন্তু বিজ্ঞাপনে অনার্স অথবা এম. এ. এমন কিছু লেখা ছিল না।
সুমিত্রার মুখ থেকে কথাটা শুনে হেড মিস্ট্রেস একটু যেন চটলেন। বললেন, তর্ক করার কি আছে? ম্যানেজিং কমিটিরও তো বক্তব্য থাকতে পারে। ওঁরাও তো সিদ্ধান্ত পালটাতে পারেন।
হ্যাঁ, তা পারেন বৈকি, তবে যে ভাবে বলছেন সে ভাবে হয়তো পারেন না—সুমিত্রার কথায় বঙ্কিম দাস একটু রেগেই গেলেন। বললেন, চিত্তবাবুর তদ্বিরের দিন শেষ। চাকা ঘুরেছে। সরকার পাল্টেছে। এখন ওসব বলে লাভ নেই। তাছাড়া আমাদের খবর হচ্ছে ইলেকশনের সময় আপনি কলকাতায় আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন!
এসব খবর আপনি কোত্থেকে পেয়েছেন জানি না। আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করি না। তবে লাইনে আমার কিছু সহপাঠী বা বন্ধু-বান্ধব আছে। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অস্বীকার করি না। তবে ইলেকশানে আমি কোন দলাদলি করিনি বঙ্কিমবাবু।
হেড মিস্ট্রেস এবার বললেন, আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের আরো বেশী কোয়ালিফায়েড লোক এসেছে। বঙ্কিমবাবু তাকে কথা দিয়েছেন। সুমিত্রা ইচ্ছে করেই কোন কথা না বাড়িয়ে বলল, বেশ তো, পদত্যাগ আমি আজই করে দেব। কিন্তু অন্ত কোন অভিযোগ দেবার চেষ্টা করবেন না।

ঘর থেকে বেরিয়ে সুমিত্রা নিজের কোয়ার্টারে চলে এল। কতক্ষণই বা লাগে গোছাতে। রাতেই পাঁশকুড়া-হাওড়া লোকাল ধরে চলে যাওয়া যাবে। সুমিত্রাকে যে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে এ খবরটা জানাজানি হয়ে যেতে বেশী সময় লাগল না। অন্যান্য শিক্ষিকাদের মধ্যে সাবিত্রীদি, বকুলদিরা চলে এলেন সুমিত্রার ঘরে। ওরাও কষ্ট পেয়েছিলেন মনে মনে।

বকুলদি তো বলেই ফেললেন, এত লেখাপড়া শিখে সরকারের গ্রান্টের টাকায় আমাদের মাইনে, তাও কৃতদাসের মত থাকতে হয়। ম্যানেজিং কমিটির খুশিমত চলতে না পারলে আমাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এটা কি একটা জীবন? সাবিত্রীদিও একই সুরে বললেন, বছর বছর টীচার্স ডে করে ধন্য ধন্য করে কত গল্প কত বক্তৃতা যে হয় তার শেষ নেই। এই ধরনের ম্যানেজিং কমিটির পাষণ্ডদের অত্যাচারে আমরা যে জর্জরিত তার খবর রাখে ক'জন।

তুমি মন খারাপ কর না সুমিত্রা। আমরাও তোমার জন্য প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমাদের ঘরে এত অভাব যে কাজটা গেলে আর কোন কাজ জুটবে কিনা সন্দেহ।

না না সাবিত্রীদি, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। বরং ভালই হলো। গিয়ে পরীক্ষাটা ভাল ভাবে দেওয়া যাবে। তাছাড়া আমার চেয়ে বেশী কোয়ালিফায়েড মেয়ে যখন পাওয়া গেছে তখন আমার কি দরকার এখানে?

আরে রাখ তো, কোয়ালিফায়েড না হাতী। একটা বিচ্ছিরি চরিত্রের ডাইনী মত ওই সবিতা পাণ্ডা। বঙ্কিম দাসের সঙ্গে ওর কাব্য-কাহিনী তমলুক মহকুমায় গাঁথা হয়ে আছে। এখন ওকে এখানে বসিয়ে বঙ্কিমবাবু দিব্যি রাজ্যপাট চালাবেন।

বকুলদি বললে সুমিত্রার জিনিস গুছিয়ে দিতে দিতে।

কিন্তু চিত্তবাবু থাকতেও ওদের এত আস্পর্ধা কি করে হলো বুঝতে পারলাম না! সাবিত্রীদির কথা শুনে বকুল জবাব দিল, সরকার পালটেছে বলে ক্ষমতাও পালটেছে। বঙ্কিমবাবু রাতারাতি কেমন খদ্দর পাল্টে হ্যাণ্ডলুম পরে নূতন সরকারের সমর্থক হয়েছেন দেখছেন না?

সুমিত্রা রেজিগনেশন দিয়ে কলকাতা চলে আসবার পর আবার ইউনিভারসিটিতে যাতায়াত শুরু করল। প্রথম প্রথম বিমলদের খোঁজখবর করে পায়নি। প্রথম দিকে নূতন সরকারের রমরমা ভাব। হাওয়া গরম। শুধু সম্বর্ধনা আর উত্তেজনা। এর মাঝে বিমল সুব্রতকে ওদের আশেপাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হচ্ছিল বার বার। তাই কলেজ স্ট্রীটের চারধারে খুব একটা বেশী

ওদের দেখা মিলছে না।

ইউনিভারসিটির দেওয়ালগুলো যেন বদলে গেছে। ট্রামে বাসে যেন এক নূতন গণচেতনার হিল্লোল। শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে যেন এক নূতন অধিকার পাওয়ার তৃপ্ত ও দৃপ্ত চোখের চাউনি। যারা এতে যোগ দিতে পারল না, নানা কারণে তারা যে নিঃসন্দেহে মর্মাহত অথবা এদের বিরুদ্ধে একথা বুঝতে বাকী রইল না কারো। ট্রামে বাসের মুখর আলোচনায় সম্পূর্ণ নিরুৎসাহের ভাব প্রকাশ করত যারা, তাদের মাঝে মাঝে ধরে ফেলত অনেকে।

—কি দাদা, শব্দটি নেই যে? কংগ্রেসী মাল নাকি?

এমন ধরনের উক্তি একটি মুখরোচক ভাজা বাদাম আর নুনের মত নিত্যনৈমিত্তিক বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সুমিত্রার সেই গান্ধী কলোনীর সুধীরবাবুর মত অবস্থা। আরো অনেকেই দেখল রোজকারের যাতায়াতের পথে। রাজনীতির পরিভাষায় একে ডেমোক্র্যাটিক হেকলিং বা পপুলার আইসোলেশন ট্যাকটিস বলা যেতে পারে তখনকার গণচেতনার মানদণ্ড অনুযায়ী।

কোন একজন বিশেষ নেতাকে আঘাত করার জন্য পোকা ধরা বেগুন আর কাঁচকলার তোরণ হল কয়েকটি জায়গায়। বারোমিশালী তত্ত্বের সংমিশ্রণে এই ধরনের অবস্থার কোন্‌টা ভালো তা বিচার করার সময় রইল না।

সাধারণ খিস্তি বা খেউড়ীকে জনগণের নিষ্পেষিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হল অনেক জায়গায়।

জিন্না-গান্ধী বা নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির ভালমন্দের খাতিরে যে দাঙ্গাগুলো হতো এদেশে তার হাঁতিয়ারগুলো পুকুরের তলা আর দেরাজের ভেতর থেকে বের করে আনল কেউ কেউ।

শান দিতে হবেক—যদি একটু ব্যবহার করার সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাহলে সেটা মন্দ হবে না।

সত্যিই কিন্তু ধারালো চকচকে হাতিয়ারগুলো উদ্যত হয়ে উঠেছিল সরকার গড়ার কিছুদিন পরেই। তেলেনীপাড়ার করিম মিঞা আর বাবু সিংদের ঘরের শান্তি শেষ হয়ে গেল। আবার সেই রক্ত। গঙ্গার ধারে জগদ্ধাত্রী বিসর্জনের মিছিল শুরু না হতেই হুগলির তেলেনীপাড়ায় শান দেওয়া হাতিয়ারগুলো ঝলসে উঠল। ভদ্রেশ্বর বৈদ্যবাটি রিষড়া তেলেনীপাড়ায় করিম শেখদের কবর যখন খোঁড়া হলো তখন তাকে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বলে শিয়ালদার হকারদের পরিবেশন করার জন্যে অনেক টেলিগ্রাম আর কাগজ ছাপা হয়েছিল। তখনকার 'ইসক্রা' বসুমতীর গতি মন্থর হয়ে এল। অপর পক্ষে যারা ক্ষমতায় আসতে পারল না

তাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ও আশেপাশের খাদি ব্র্যাণ্ডের কেউ কেউ তেলেনীপাড়ায় করিম শেখের কবরস্থানেই চোখের জল ফেলে শপথ নিতে চাইল—না, এই সরকারকে আর থাকতে দেওয়া যায় না, বাংলার বুকে এত বড় সর্বনাশ আমরা সহ্য করব না। যাত্রার আসরের অস্ত্রহীন বিদূষকের বৃথা আস্ফালনের মতই শোনাচ্ছিল তাদের এ শপথ।

নিঃসন্দেহে কুম্ভীরাশ্রু ছিল সেই কবরের কাছে নেতাদের কান্নাতে। তাই হয়তো করিম শেখের পরিবারও তাতে বিভ্রান্ত হলো না। বেলজ্জ চেহারার মত জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্টকে সরাতে তেলেনীপাড়াকে হাতিয়ার করতে গিয়ে জোর চোট খেয়েছিল কংগ্রেস তখন। তথাকথিত নিরপেক্ষ ডালহৌসি ফেরত কমিটেড এ্যান্টি গভর্ণমেণ্ট কেরানীকুল ভাজা ছোলা ও আম লজেন্স খেতে খেতে বাড়ি ফেরার পথে বলতে বলতে যেত—হলই বা একটা ছোট খাট মারামারি তেলেনীপাড়াতে। তাতেই কি সরকারকে যেতে হবে? কংগ্রেস আমলে বুঝি এসব ঘটনা ঘটেনি! তখন তো গুলজারিলালরা ছুটে এসে মধ্যরাত্রে কলকাতা পরিদর্শন করে পরদিন সকালে বলতেন, সব শান্ত! চক্রান্তকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে।—এ ধরনের ডেলি-প্যাসেঞ্জারী মুডের কথায় যুক্তি থাক বা না থাক তা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগ্রাহ্য হত।

তেলেনীপাড়ার আসাদ আলির জুটমিলের মাইনে বাড়লেও করিম শেখের মেয়ে বানুর সঙ্গে যে নূরজাহানী প্রেম হয়েছিল তার সমাধি রচনা হয়ে গেল।

করিম শেখকে কবর দেওয়া গেলেও বানুর নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। হয়তো বা গঙ্গায় ভেসে গেল জগদ্ধাত্রীর বিসর্জনের আগেই।

কার্ফুর পারমিট না থাকায় ভদ্রেশ্বরে আসতে পারল না বিমল।

শ্রীরামপুরের শঙ্করীদার আশ্রম—কাম—কংগ্রেস অফিস—কাম—সেই রেল-স্টেশনের পাশে ছোট্ট যে রিসেপসন—কাম—পিপলস্ কণ্টাক্ট সেণ্টার ছিল সেইখানেই রয়ে গেল বিমল। এরই মধ্যে কলকাতার আশেপাশে একটু একটু করে কাজ করে মাথা তোলবার জন্যে চেষ্টা করছে বিমলরা।

ইউনিভারসিটির পরীক্ষা শেষ। কলেজগুলোতে পরীক্ষা শেষে নূতন দিনের উত্তেজনার নূতন নূতন 'হাতিয়ারী' ভাষা আর বেলোয়ারী চাল মিছিলে মিটিং-এ ময়দানে সর্বত্র।

ভদ্রেশ্বরের ছেত্রী পাঞ্জাবের ছেলে। দিদি দিল্লীতে। ছেত্রীর ওখানেই বিমলের যাবার কথা ছিল। ছেত্রী ভদ্রেশ্বরের জুট মিলের হিন্দুস্থানী ভাইদের কাছ থেকে কিছু চাঁদা তুলেছিল। বিমল সুব্রতর রাহা খরচ সহ একটা লিফলেট

ছাপাবার টাকা জুটবে।

কিন্তু এ পথে আসা এখন বারণ। কারণ এদিকে কার্ফু। দিন বদলের পালায় এ দৃশ্য না থাকলেও দুঃস্বপ্নের এই রাতের জন্য কাকে দায়ী করবে বিমল খুঁজে পেল না। ক'দিন বাদেই অবশ্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ হওয়াতে দু'পক্ষই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।

পাশকুড়ার স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মডেলে শিক্ষক মনোনয়ন ও শিক্ষক বিতাড়ন পর্বের ক্ষেত্রেও 'ডিস্টালিনাইজেশন'-এর পথ একটা নূতন চেতনার নামে বিশেষ বিশেষ অথরিটিগুলো যখন কায়েম হতে লাগল তখন বাজারে চালের দাম বাড়তে শুরু করেছে।

এসব ঘটনার সাক্ষ্য গঙ্গা। সাক্ষী করিম শেখের কবর। সাক্ষী পাঁশকুড়ার বঙ্কিম দাস। সাক্ষী আসাদ আলি।

সুমিত্রার চাকরি যাওয়াতে সুমিত্রার দাদার বোঝা হয়তো বেশী বেড়ে গেল। কিন্তু তার থেকে রক্তের মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব বাড়ল সরকারের লোকেদের। আর রক্ত দেবার অবস্থা সৃষ্টি করার কৈফিয়ৎ দিতে ঝুঁকি নিতে হলো কংগ্রেসের নেতাদের।

অসহ্য ঘৃণা, মর্মান্তিক আর্তনাদ আর অন্যায়ের জন্য তীব্র দহনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল হয়তো মাত্র কয়েকজন মানুষ, যাদের গাড়ির থেকে সরকারী পতাকাটা খুব কম সময়েই নেমেছিল। কিন্তু এর পরিণাম হিসেবে কেমন যেন ধিকি ধিকি করে ছাইয়ের গাদায় আগুন সারা সমাজ ও সংসারটাই জ্বালাতে চাইল। তেলেনীপাড়ার ঘটনায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সাময়িক কলঙ্কিত হলেও এ প্রসঙ্গে কেউ কিছু সমালোচনা করলে অজয়বাবু থেকে জ্যোতিবাবু সবাই কেমন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। শ্রীরামপুরের গোপালদাস নাগ, জেলার পুরোনো মানুষ শান্তিদা, শঙ্করীদা ব্যাপারটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদের ঝড় বহাতে চাইলেও উপর তলায় নিষ্ক্রিয়তা হুগলির সে ডাকে সেদিন সাড়া দিতে পারেনি। দিল্লীতে ডজন খানেক টেলিগ্রাম গেল তেলেনীপাড়ার ব্যাপারে। আশে-পাশের জুট-মিলে আই-এন-টি-ইউ-সি'র জোর ভাল থাকলেও সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করতে পারেনি তার কারণ হলো প্রথমতঃ ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক নয়। দ্বিতীয়ত আই-এন-টি-ইউ-সি'র বড় একজন সংগঠক কালী মুখার্জী এখন অজয়বাবুর সমর্থক হবার কারণেই যুক্তফ্রন্টের সমর্থক।

তেলেনীপাড়ার অশান্তি যদিও বা শেষ হলো, কি রাজনৈতিক আক্রোশ আর প্রতিশোধের বীভৎসতায় উত্তরপাড়া শহর, কোন্নগর, কোতরং কলোনী আর

হাওড়ার বালী নিশ্চিন্দায় রাস্তগুলো হয়ে উঠতে লাগল বীভৎস।

এই ভয়াবহতার মধ্যেও যারা খদ্দরের মায়া ত্যাগ করতে পারলেন না অথবা নূতন করে প্রতিবাদের মঞ্চ তৈরী করতে চাইলেন তাঁদের অনেককেই গৃহত্যাগী হতে হলো। টালিগঞ্জের বিজয়গড় থেকে হুগলির কোন্নগর সর্বত্র একই চেহারা।

॥ তেরো ॥

যথারীতি আর সবার সঙ্গে তারিণীবাবুও মন্ত্রী হলেন। তারিণীবাবুর বিপ্লবী নাগরিক পরিষদে মাত্র পাঁচজন থাকলেও তাঁকে মন্ত্রী না করলে সরকারের মেজরিটি থাকে না। তারিণীবাবুর সব ট্রেড ইউনিয়নে রাতারাতি পোষ্টারের ভাষা বদলে গেল। অতিরিক্ত উৎপাদন আর শ্রমিক মালিক সহাবস্থানের মহাজান পন্থী বৌদ্ধদের নীতি প্রচারিত হলো। একজন সাংবাদিক একদিন ঠাট্টা করে স্যাটারডে ক্লাবে তারিণীবাবুকে বলেছিল—এসব যে করছেন বেস চলে যাবে যে। সেদিন তারিণীবাবুর জন্মদিন পালন হচ্ছিল তারিণীবাবুর এক কণ্ট্রাক্টর বন্ধুর দয়ায় স্যাটারডে ক্লাবে। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে জবাব দিয়েছিলেন তারিণীবাবু, "ওসবের তোয়াক্কা করে কে! বেসফেস্ সব বাজে কথা—বুঝলেন সবটাই হাওয়া। যতক্ষণ হাওয়া আছে ঘুড়ি উড়বে। তা না হলে সবটাই নামিয়ে রাখতে হবে। বেসটেস করে কিছু হয় না। আমরা যেটুকু যা করি তা নেহাত এক্সিসটেন্স শো করাতে—মানে যাতে আপনারা আমাদের মনে রাখেন।

তারিণীবাবুর এই নিশ্চিন্ত বিলাস ফ্রণ্ট সরকারের ভিটেয় ঘুণ ধরাবার জন্যই বোধহয় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারিণীবাবুর চমৎকার দেখতে শিশিরকুঞ্জে তরুণবাবু, সুন্দরীমোহন এভেনিউতে আশুবাবু, রাজভবনে ধর্মবীর অনেকক্ষণ অ[illegible] অপেক্ষা করতেন। তারিণীবাবু দরে বেশী হাঁকলেও খবর দিতেন একেবারে পুরো তাজা। ক্যাবিনেট সিক্রেসি থেকে ফ্রণ্টের সিক্রেসি কোন কিছুই গোপন রাখতেন না। এসব ধরনের নানা কাজে তারিণীবাবুর যোগ্যতাকে কেউ অস্বীকার করত না।

তারিণীবাবুর কাজে যোগাযোগের মিডিয়াম ছিল রমা মিত্র। মানে বিমল সুব্রতর রমাদি, আর বিশেষ এক আপজনের ম্যাডাম বা মিস রমা দেবী।

সেদিন শনিবার বিকেলের আগেই ডালহৌসি খাঁ খাঁ করছে। লিফটে করে তারিণীবাবু আর রমা দেবী নামলেন। পুলিশের লোকেরা চিনেও না চেনার ভান করলে। ভি-আই-পি গেটের সার্জেণ্টের এমন সব দেখার অভ্যেস অনেকদিন ধরে করতে হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে। তাই এসব দেখলেই এরা খুব স্মার্ট

হয়ে মন্ত্রীকে অভিবাদন জানাতেন—ভাবটা এমন যেন কোনকিছুর প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ নেই—শুধুই কর্তব্যপালন ছাড়া।

গাড়ী চলে গেলে নিজেরা পরস্পর বলতেন যে সাহেব বা অমুকবাবু কুলীন হলেন। এসব ব্যাপারে না জমে গেলে নাকি নেতা কুলীন হতে পারে না, ফলে জনগণের দুঃখ ও যন্ত্রণা বোঝবার যে হৃদয় দরকার তা সচরাচর কাজ করতে পারে না যদি না এই কৌলিন্য দ্রুত আসে। এমন কুলীন হওয়া অনেকের তিথি নক্ষত্র সার্জেন্টের ডায়েরীতে আছে।

তারিণীবাবু আর রমা মিত্র যখন প্রথম পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব মজবুত করতে চাইছেন তখন অরবিন্দ সেনেরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে পরিষদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ তুলে বাংলার দেওয়ালে তাদের বিপ্লবের পঞ্জিকা লিখতে এবং গ্রামে সংগ্রামের ধ্বনি পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে।

কিন্তু রমা মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেও তারিণীবাবু চরিত্রভ্রষ্ট হননি। সে অপবাদ স্বয়ং ঈশ্বরও দেবেন না। ওদিকটায় পাকা সনাতন হিন্দু সংস্কারের মত খাঁটী মানুষ তিনি।

রমাদেবীকে নিয়ে যখন বেলভেডিয়ারের এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে কথা বলছিলেন তখন সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন—আচ্ছা আপনাদের নেতারা কি মেয়েছেলে? ষড়যন্ত্র করতে হলে বুকের পাটা চাই। আপনাকে পাঠায় কেন? নিজেরা আসতে পারে না?

মুচকি হেসে রমা মিত্র বলেছিল, তার আমি কি করব বলুন।

বলুন এবার কি জানতে চান? তারিণীবাবু বললে।

শরীকি বিবাদের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই তবে ঘেরাও নিয়ে মালিকরা যে অবস্থায় পড়েছে সে ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ভেতরের অবস্থা কি? রমা জানতে চাইল পাকা সাংবাদিকের মত।

ঘেরাও-এর ব্যাপারে ক্যাবিনেট ডিভাইডেড। এ ব্যাপারে আমাদের অনেকেই তাড়াতাড়ি মালিকদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজে আসতে চাই। কিন্তু কয়েকটা শরীক বাধা দিতে পারে। আপনারা ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে প্রেসারটা বেশী ফলাও করে প্রচার করলে আমাদের কয়েকজনের সুবিধে হয়—

তাহলে ইমিডিয়েট গভর্নমেণ্ট চলে যাওয়ার কোন পশিবিলিটি নেই তো? রমা বললে।

নেই, আবার আছেও। আমাদের দিক থেকে নেই। সবে মন্ত্রী হয়েছি। লড়ালড়ি করলেও গাদাগাদি করে থেকে যাব। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,

মানে দিল্লীশ্বরী যে কি ভাবছেন, তা জানি না। সেটা আপনারা জানেন। মোটা টাকা চাঁদা পাবার ও দেবার কতগুলো সোর্স যা এই গভরমেণ্টের কেউ কেউ পাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য নিয়ে রমা চলে গেল।

তারিণীবাবু ততক্ষণে নিজের জায়গায় পৌছে গেছেন। তারিণীবাবুর এসব কাজের খবর যে কেউ রাখত না তা নয়—কিন্তু তবুও ওকে রাখা হতো অনেকের নিজেদের প্রয়োজনে।

রমা মিত্রর সঙ্গে তারিণীবাবুকে পরিচয় করানো হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মার্কাস স্কোয়ারের মণ্ডপে। রমা সেদিন অসাধারণ ভাল গান গেয়েছিল। ল্যান্সডাউনের সেই নেতাবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রমাকে। পরে বলেছিল তারিণীবাবুকে, মাঝে মধ্যে কিন্তু বিরক্ত করতে যাবে আপনার কাছে। তারিণীবাবু সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে সম্মতি জানিয়েছিল। রমা জানত আসলে আমার খবর সংগ্রহ করতে হবে। সরাসরি সরকার পক্ষের চোখের নজর বাঁচিয়ে এদের নেতাদের সঙ্গে দেখা করা দুরূহ ব্যাপার তারিণীবাবুর পক্ষে। তাই বেষ্ট মিডিয়াম হল রমা মিত্র। তখনও পলিটিক্যাল মহলে উর্বশী খ্যাতি রমা মিত্র অর্জন করে নি। কাজেই অনেকটা কভারে থেকে তার পক্ষে কাজ করা সুবিধে।

রমা সেদিন সোজা ল্যান্সডাউন মার্কেটের সেই বাড়িতে চলে এল। সেদিন সেখানে বসে বিমল ও সুব্রত। বিমলের সাথে কমিটির মিটিং সেদিন তেজেশ সেনের বাড়িতে হচ্ছে। আর এই তেজেশ সেন হলেন সেই বিখ্যাত, সম্ভ্রান্ত শৌখীন উঠতি তুনম্বর সারির নেতা, পি-সি-সির সদস্য যিনি রমা দেবীর জন্য অস্থির। তেজেশ সেনের খাতির বেড়েছে দলে তার অর্থ, উদারতা, সাংস্কৃতিক মহলে যোগাযোগ আর কর্তাদের সব হুকুমে হ্যাঁ বলার জন্যে।

রমা সেখানে পৌছেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। একতলার ঘরে মিটিং চলছিল, সুব্রত বিমলকে চিমটি কেটে ইশারায় দেখাল রমাদেবীকে। এই তৃতীয় দর্শন। বিমলের কাছে গোটা ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এল। তাহলে তেজেশদার সঙ্গেই……।

বিমলদের সভাও শেষ হয়েছে কি একটা কমিটি বানিয়ে। তার পরেই যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে। একটু বাদেই তেজেশবাবু নামলেন ওপর থেকে রমা মিত্রকে নিয়ে। নীচে এসেই পরিচয় করিয়ে দিলেন বিমল-সুব্রতর সঙ্গে। রমা মিত্র শান্ত স্বরেই বললে—এঁদের আমি চিনি। ওঁরাও আমায় চেনে। তেজেশবাবু একটু থেমে গেলেন, তার পরেই প্রসঙ্গ পালটে বললেন—তা তোমাদের সব ঠিকমত হয়েছে তো? কোন অসুবিধে হয়নি? আমরা একটু বেরোচ্ছি।

তোমরা এসপ্ল্যানেড অবধি গেলে—চল নামিয়ে দিচ্ছি।

বিমল বললে—না, আমাদের ভবানীপুরে একটু কাজ আছে। আপনি আসুন।

ল্যান্সডাউন মার্কেট থেকে সাদার্ন সমিতি হয়ে বেলতলা দিয়ে সুব্রত আর বিমল চলে এল আশুতোষ কলেজের পেছনে স্বপনের খোঁজে। তখন স্বপন শ্যামাপ্রসাদের খুব লড়াকু ছেলে। পথে সুব্রত বললে—তেজেশদার সঙ্গে রমাদির খাতিরটা বেশ ইনটারেষ্টিং নয়। আজ একেবারে কট্ হয়ে গেছে।

বিমল বললে, এর মধ্যে আবার নূতন কি আছে? তেজেশদা মানুষটা কিন্তু ভাল। যাই বলিস ভাই সে যদি কাউকে ভালবাসে তার মধ্যে অন্যায়ের কি আছে। তাছাড়া রমাদিও তো ভীষণ ভালো মেয়ে।

আশুতোষ কলেজের কাছে আসতেই ট্যাক্সিতে বিভাদির পাশে বসে বর্ধমানের হাওয়াইদি। বিমলকে হেঁকে বললে, কোথায় যাচ্ছ?—

বিমল পিছন ফিরে চেয়ে দেখে হাওয়াইদি।

হাওয়াইদি ট্যাক্সি থামিয়ে বললে—কলোনীর ছেলেরা আর পূর্বস্থলীর ছেলেরা ভীষণ মার খাচ্ছে, তোমরা একদিন চল। সওকতদের গ্রামে সভা ডাকব।

বিমল বললে—ঠিক আছে হাওয়াইদি সামনের রোববার যাব।

আভা চ্যাটার্জী, হাওয়াইদি, বিভাদি এরা সেদিন প্রচণ্ডভাবে স্নেহ, মমতা, সামর্থ্য দিয়ে এই বিমল সুব্রতদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলেই অনেক আঘাতের প্রলেপ সামলে নেবার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু এদের স্বীকৃতি আর মর্যাদা কোনকালেই হলো না, যেহেতু এরা তোষামোদ-প্রিয়তার দলে নাম লিখিয়ে সম্ভ্রমহীনতার পরিচয় দিতে পারেনি।

স্বপনের বাড়িতে এসে স্বপনকে পাওয়া গেল না—সে মিণ্টু দাশগুপ্তের সঙ্গে গানের রিহারর্স্যালে পুঁটিয়ারী গেছে।

অগত্যা সেবার কমনকেয়ারের দাদা অজাতশত্রু বুলবুলদার ভিটেতে চা খেয়ে মহাজাতির দিকে রওনা হল বিমল।

ওদিকে তেজেশ সেন গিয়ে গভরমেণ্ট শরীকদের চাঁদা দেবার যে লোকগুলোর নাম জানতে পেরেছে সেগুলো সব দিল্লীতে পাঠাবার জন্য এক বিশেষ নেতার বাড়িতে বসে।

তেজেশ সেন থেকে আরও অনেকেরই তখনও ধারণা যে দিল্লী থেকে চাপ দিয়ে অথবা ক্রমাগত এসব অভিযোগ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের চাপ দিয়ে এ সরকারের পতন ঘটাবে। কুড়ি বছর শাসন করার পর সদ্য বিরোধি হবার স্নায়বিক ধৈর্যটুকু পর্যন্ত হারাতে বসেছে কয়েকজন। এদের অনেকেরই আবার যুক্ত-

ফ্রণ্টের প্রতি যতটা না রাগ তার থেকে বেশী রাগ অজয়বাবুর প্রতি। কংগ্রেস ভবনে প্রায়ই এরা বলতেন—"কপাল করে এসেছে বুড়ো। কেমন মজা মারছে বল—আমাদের সঙ্গে বিশ বছর মন্ত্রী আবার লাল পার্টির সঙ্গেও মন্ত্রী—
কে একজন বাধা দিয়ে বললে, না হে পুরো কুড়ি বছর নয়, কামরাজ প্ল্যান…।
বাধা দিয়ে তেজেশদা বলেছিলেন, ওটা আবার কেউ ধরে নাকি।
সাম্রাজ্য পতনের পরেও রাইটার্সের একশ্রেণীর অফিসার এমনকি গোয়েন্দা-বাহিনীর অনেকে কিন্তু বুঝতে পেরেছিল ফ্রণ্ট টিকবে না, তাই তাদের পুরোনো প্রভুদের মাঝে মাঝে কিছু গোপন সংবাদ দিয়ে প্রভুভক্তি জীইয়ে রাখত। এদের লিঙ্কম্যান ছিলেন তেজেশদা আর সমরবাবু।
তেজেশদা ও সমরবাবু এদের মাধ্যমে যে খবর সংগ্রহ করতেন তার অনেকটাই প্রমাণিত হয়েছিল সত্য বলে। স্বভাবতঃই এর ফলে অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুবেলা বিবৃতি দিলেও এদের টিকিটি পর্যন্ত কোনদিন ধরতে পারেন নি। এর উপর খোদ দিল্লীর গোয়েন্দাগিরিতো ছিলই।
মোটামুটি স্থির ছিল নির্বাচন হোক বা হোক কংগ্রেস সরকার, বিরোধী আন্দোলন আর কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে যে সংগ্রাম চলার কথা তাকে বন্ধ করা হবে না। এ ছাড়া এই সংবিধান সবটাই মার্কসীয় দর্শনে অগ্রাহ্য ও অস্পৃশ্য এবং যার মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ঘুরে ফিরে কংগ্রেসই ক্ষমতা দখল করে। এর চার ধারে বা এর ভেতরে থাকার জন্য কোন বাসনাই আর কোয়ালিশানের নেই—এমনটাই যেন শোনা যাচ্ছিল। তাছাড়া প্রেসিডেন্সীর ছোট্ট ঘটনায় যে দাবানল জ্বলে উঠল প্রিন্সিপাল সনৎবাবুর বিরুদ্ধে তার মধ্য থেকেই কিন্তু দেখা দিয়েছিল অনেক স্ফুলিঙ্গ যাদের চিন্তায় ছিল বিপ্লব—পথ ছিল দারুণ কঠোর—বিশ্বাস ছিল মার্কসবাদী নেতৃত্বের। কিন্তু নির্বাচনের ঢাক পড়তেই আর প্রফুল্ল সেন সরকার-বিরোধী সেই মারাত্মক জনরোষ-এর সামনে ভোটের বাক্সটা যে পুকুরে মাছের চারের মত এসে পড়ল এ টোপ খেতে সামান্য বিলম্ব করেন নি সেদিনের কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলো এবং বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব। ছাত্রদের যারা তখনও রাজপথে যারা সংগ্রামে তারা বললেন, আন্দোলনকে মাঝপথে বন্ধ করে কোনমতেই নির্বাচনের কাজে যোগ দেওয়া চলবে না। কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আর দেশের পরিবর্তন সম্ভব নয় এমন কথাই শুনে আসছিলেন এদের অনেকে। তাই তাদের দিক থেকে উপরতলার নেতাদের কাছে সরা-সরি 'না' পৌছে গেল। উপরতলা তো চটবেই। এমন সর্বনাশ যারা করে

তাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? সেদিনের ছাত্র ফেডারেশনের একটা অংশ কিন্তু উপরতলার রোষকে উপেক্ষা করে সরে দাঁড়ালেন এবং তারাই কোনক্রমে "পার্লামেন্ট যে শুয়োরের খোঁয়াড়" লেনিনের এই উক্তিকে নিয়ে প্রথম আঘাত হানতে চাইলেন উপরতলার দিকে। "নকশালের" আন্দোলনের উৎকৃষ্ট, সাচ্চা এবং সত্যনিষ্ঠ শক্তির কিন্তু এই সময়েই জন্ম হলো। যদিও আন্দোলনের পরিভাষায় এর জন্ম নকশালবাড়ি খড়িবাড়ি অঞ্চলে জঙ্গল সাঁওতালদের উপস্থিতিতে। কিন্তু এর যৌবন প্রথম ডাক দিয়েছিল প্রেসিডেন্সীর গেট থেকে সেই সময়ে। এদেরকে বিপথগামী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে উড়িয়ে দিলেও তদানীন্তন কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের বিবেক অন্তর থেকে স্বীকার করতে আজও পারেন নি যে তারা নীতি ও চিন্তার দিক থেকে ভু া করেছিল।

চন্দ্রভান গুপ্তার উত্তরপ্রদেশে তখন কায়স্থ ও বানিয়াকুলের আধিপত্যে ব্রাহ্মণ সমাজ রীতিমত বিরক্ত হয়ে কমলাপতি ত্রিপাঠীর বারাণসীতে মালা জপছে। বি-পি চালিহার আসামে তখনও কিছু বিধান রায়ের ইমেজ নিয়ে তিনি ক্ষমতায় আবার প্রত্যাবর্তনের জন্য নিশ্চিন্ত। অনিশ্চিত বাংলা, অনিশ্চিত বিহার, অনিশ্চিত উড়িষ্যা। নেহেরু কেবিনেটে যত ভাল প্রোপোজাল থাক না কেন কাজের বেলায় পাবনা আর কোলকাতার গঙ্গায় গঙ্গাজল নিয়ে দরিদ্র নর-নারায়ণের পূজো তেমন বেশী হয়নি। কল্যাণী কংগ্রেস ও দুর্গাপুর কংগ্রেসের পর মানসকন্যা নদীয়ায় জঙ্গল কেটে দুধের প্রকল্প আর লালমাটিতে ইস্পাত নগরী করেছে মাত্র। সেখানে ভীড় করেছে ভারতের সব জায়গার লোক। আর করবেই তো—কেননা জাতীয় প্রকল্প এবং জাতীয় কংগ্রেসের ব্যবহারও তাই। কিন্তু বাংলায় লাখো যৌবনের হাহাকার করা মরুভূমিতে একটা ছোট্ট মরূদ্যানের জন্য যেটুকু জায়গা দরকার তাও কিন্তু একটা দুর্গাপুর প্রকল্পে নেই। আর এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়েই সেদিন ক্লেমব্রাউন হলে হাতাহাতি হয়ে যায় আর কি? রেলওয়ে মেনস কংগ্রেসের দয়ালবাবুদের ডাকে একটা সভায় গিয়েছিল বিমলরা। সেখানে একজন পঞ্চাশের দশকের কংগ্রেসনেতা বাংলার কল্যাণে কংগ্রেসের ভূমিকার তাৎপর্য ব্যখ্যা করছিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই গুঞ্জন উঠল। শেষটায় নানা প্রশ্নবাণ এবং একেবারে হাতাহাতিতে পৌঁছে গেল। প্রশ্নকর্তাদের বক্তব্য ছিল যদি সবটা হয়েই থাকে হাওড়ার শিল্প কমে যাচ্ছে কেন? বাংলা কেন পিছিয়ে? ভদ্রলোক দুর্গাপুর টেনে আনতেই আরো বেশী উত্তেজনা হলো।

কোনমতে ধামাচাপা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে শিয়ালদা থেকে এইট বি ধরে

বিমলরা বেকবাগানে পিণ্টুদার পাড়ায় এল একটা সভা করতে। সেখানেই এসে এসব কথা বলল কেন দেরী হলো ইত্যাদি। বেশ বয়স্ক একজন ভদ্রলোক বললেন—

তা ভাই ঠিকই তো বলেছে—বাংলা আর কত ত্যাগ করবে। পার্টিশনের যন্ত্রণা থেকে হাজার যন্ত্রণা—আর ইংরেজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী রক্ত দেবার পরও নেহেরু ক্যাবিনেট কি বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেছে এই বাংলার জন্ম? তা যদি একটু কেউ একথা বলে তা হলে রাগ করার কি আছে?

অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে কথাগুলো বন বন করে ঘুরতে লাগল বিমলের। তাহলে সব মিলিয়ে এই প্রচণ্ড বঞ্চনার বিরুদ্ধে যদি প্রাসাদে একদিন আগুন লাগে তাহলে দমকল পাওয়া যাবে না নেভাতে। আর সবচেয়ে আগে তাতে পুড়বে কংগ্রেসের ঘর। শেষের সেদিন তাই বড় ভয়ংকর হয়ে আসবে।

একদিকে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে ক্ষোভ ও অন্যদিকে রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্সীর গেটে যে আদর্শবাদের ক্ষোভ শুরু হল তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই কংগ্রেসের ইউ-এল-এফ ও পি-এল-এফ-এর নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরী হয়ে গেল।

বিমলরা নির্বাচনী প্রচারে দায়সারা গোছের কাজ করতে নেমেও জবাব দিতে পারল না কেন এই দারিদ্র্য। নেতাদের কাছ থেকে শোনা অন্য দেশের তথ্য আর নিজেদের দেশে ছুঁচ ছিল না ছুঁচ হয়েছে এই সব আবোলতাবোল বলে কোনমতে কাজ সারতে চাইল। তার ফলে স্বভাবতই হালে পানি পাওয়া গেল না।

পুলিশেরও ধারণা ছিল না কংগ্রেসের পাটাতন সরে যাবে। তাই গ্রাম বাংলায় ও শহরে কর্তাস্থানীয় অনেকেই তখন কংগ্রেসের মন্ত্রীদের তোষামোদ করতে ব্যস্ত। খোদ কোলকাতার পুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দাবাহিনীতো সেন মহাশয়ের মিষ্টি মুখে পুড়ে রিপোর্ট সই করতে লাগলেন সেন সরকারের চিন্তা নেই—তারাই আবার আসছেন বলে।

পোষ্টারগুলোতে লালবাহাদুরের ছবি আর পাকিস্তানের যুদ্ধে জেতার ব্যাপারটা এমন একটা হাস্যকর প্রচারে নিয়ে দাঁড়াল যেন মনে হচ্ছিল যুদ্ধে পাইলট বা কম্যাণ্ডার লাগেনি। একজন কংগ্রেস নেতা গিয়ে দশটা করে প্লেন নামিয়ে এসেছিল। লম্বামতন সুপুরুষ একজন তো হাবরায় এমন বক্তৃতা করলেন যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ট্যাঙ্কে বসে প্রতিদিন তিনি সব সরেজমিনে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু এদিকের যুদ্ধে তখন অস্ত্র বারুদ তৈরী। কাজেই পাক-ভারত যুদ্ধের বীরত্ব নিয়ে

কেউ মাথা ঘামাতে চাইল না। তারপরে লালবাহাদুর ইহজগতে নেই। সুতরাং যার নেতৃত্ব ছিল এর জন্য কৃতিত্বের অধিকারী তার জায়গায় সদ্য আসা ইন্দিরা গান্ধী আর গুলি চালনার সরকার দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান গেল না।

॥ চোদ্দ ॥

দুপুর বেলার রোটাণ্ডা!

গরম পড়তে শুরু করছে। সব কিছুই যেন নতুন করে তাপ সঞ্চার করছে। হোম সেক্রেটারী, ডি-আই-জি, আই-বি. আরও সব পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে অবহেলিত অনাদৃত খড়িবাড়ীতে হাতে খড়ি দিয়ে গলা কাটার প্রথম পর্ব শুরু করেছে চারু মজুমদার। শিলিগুড়ির কানু সান্যাল, ফাঁসীদেওয়ার জঙ্গল সাঁওতালরা সরাসরি বিদ্রোহ করেছে এস, এস, পি সমর্থক একাধিক জোতদারের বিরুদ্ধে। এস, এস, পি মানে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, নেতা যাদের এককালে ছিলেন নেহেরু বিদ্বেষী রামমনোহর লোহিয়া। এস, এস, পির সঙ্গেও জোতদার, কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনের সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের পরেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোতদার—আর তাদেরই কারো কারো সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রণ্ট—সবটাই যেন কেমন একটা হুতোম প্যাচার নকসার মত, কিংবা বেতাল রহস্যের মত—গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের আরকাইভ্‌সে বদমায়েস বইকাটা ইঁদুরের মত—থুরি, ধেড়ি ইঁদুরের মত মনে হচ্ছিল! কিন্তু হলেই বা কি। মার্বেল পাথরের মেঝেতে—মোরাদাবাদী কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে যে শপথ দেশ চালাবার জন্য রাজভবনে নেওয়া হয়েছে—তা অতি কঠিন ব্রত। এ ব্রত অনেক সীতা, দময়ন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীষ্মরাও পালন করতে পারত না।

কারণ তাদের তো তথাকথিত জনগণের কাছে কোনো কমিটমেণ্ট ছিল না। সীতার ছিল রামচন্দ্রের কাছে, দময়ন্তীর ছিল নলের কাছে, যুধিষ্ঠিরের ছিল শ্রীকৃষ্ণের কাছে, ভীষ্মের ছিল তাঁর বিবেকের কাছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্রত পালনের কমিটমেণ্ট হলো জনগণের কাছে। শিক্ষিত জনগণ, মূক জনগণ, বধির জনগণ, অসহায় জনগণ, না খেতে পাওয়া ফ্যাকাশে পাটকাঠির স্পেসিমেন মার্কা জনগণ, জণ্ডিস হয়ে যাওয়া বাসন্তী রঙের জনগণ, এবং টি-বি-তে আক্রান্ত রাজা মার্কা জনগণের কাছে এই বিরাট কমিটমেণ্টের মানে প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে ভবেই এগুতে হবে। এক পা আগে বা দুই পা পিছে অথবা হাঁটি হাঁটি

পা পা ভঙ্গীতে কিংবা একেবারে জোড়া পায়ে লাথি মারার ভঙ্গীতে সরকার এগুতে হবে।

রোটাগুার দুশ্চিন্তার কারণ আপাতত নকশালবাড়ীর সম্পত রায় বনাম কানু-সান্যালদের নিয়ে নয়—তাদের মোকাবিলার জন্য পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর সোনাম ইয়াংদিয়া নির্দেশ পেয়ে গেছে।

রোটাগুার আপাতত অস্থির চিন্তা প্রেসিডেন্সী কলেজ নিয়ে।

বাঙলার নামী ভদ্দরলোক ও ইনটেলেকচুয়াল এবং বিজিনেশ একজিকিউটিভ বা খাঁটি কথায় বিদ্বান বানাবার কারখানা প্রেসিডেন্সীর হাওয়া কেমন যেন বিষিয়ে পড়েছে। সেই যারা ছেষট্টির শেষে প্রমোদবাবুর নির্দেশ মতো ইলেকশানের কাজে না নেমে প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যে পি, সি, এস, এক তৈরী করে কি সব করেছিল তারা বোধ হয় নকশালবাড়ীর বারুদ, ফাঁসী-দেওয়ার তীর আর খড়িবাড়ীর মাটির গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করছে এটাই অনুমান হোম ডিপার্টমেণ্টের।

সরকারের চিন্তা, দেশের চিন্তা, আর রোটেগুার সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর চিন্তা কি তা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও কয়েকজন অফিসারের পুত্র কন্যা ভাই বোনেদের যে ভদ্দরলোক হবার মুখে একটা বিপদ এ:স গেছে এটাকে প্যারামাউন্ট ইম্‌পরটান্স দিয়েছেন কেউ কেউ। অতএব কিছু করা দরকার।

সভার মূল কাজ শুরু হবার আধ ঘণ্টা পরেই ডেপুটি হোম সেক্রেটারী ম্লান মুখে লিখিত মেসেজ পাঠাল ঘরে যে সোনাম ওয়াংদি মারা গেছে। এন কাউণ্টারে তরুণ উপজাতি সমাজের তিনশ' পাঁচশ গ্রেডের ইন্‌স্‌পেকটার সোনাম ওয়াংদির রক্ত তরাই-এর উপত্যকায় শালপাতা, ঘাস, আর পাথর কুচি মেশানো পাগলা ঢেকির গাছগুলোয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ল। সোনাম ওয়াংদির জন্য কেউ সাদা, লাল বা গেরুয়া সেলাম জানাতে আসবে না। পুলিশের সামান্য শ্রদ্ধা আর সরকারের মৃদু দুঃখ প্রকাশের বাইরে কিছু না। কোনো স্কুল বা কলেজ সোনামের মৃত্যুতে ছুটি হবে না।

ওয়াংদির মৃত্যু, থানায় সংঘর্ষ সব মিলিয়ে যে খবরগুলো আসতে লাগল তাতে রোটাগুার স্বস্তি পরিষদ দুশ্চিন্তামগ্ন যে হলেন তার প্রমাণ সদলবলে মন্ত্রী মিশনের নকশালবাড়ী যাত্রা।

তেভাগা আন্দোলনের রক্ত, কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানার রক্ত—সাঁওতাল ও চুয়ার বিদ্রোহের রক্ত কিংবা সেই স্বদেশী যুগের চম্পারনের রক্তের কোনো মর্যাদাই রক্ষিত হলো না সোনাম ওয়াংদির রক্ত নিয়ে। সম্পত রায়েদের সম্পত্তি রক্ষার

শরীক আছে যুক্তফ্রন্টে। কানু সান্যালদের মহান দেশের মহান নেতা বানাবার জন্য সারা বাঙলার দেওয়াল, কচি যুবকের আঙুল, তুলি আর রঙ রইল কিন্তু সোনাম ওয়াংদির জন্য খবরের কাগজের একজন ফটোগ্রাফারের শেষ রিল ছাড়া আর কিছু রইল না।

রোটাণ্ডার আলোচনা সেরেই হোম সেক্রেটারী ঘরে এসে ডেকে পাঠালেন কোলকাতা পুলিশের কর্তা ব্যক্তিদের। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই জবাব এসেছিল—কিছুই হয় নি—একটা সিম্পল এন্ কাউণ্টার হয়েছে। আর জমি নিয়ে মারামারি হয়েছে। নাথিং সিরিয়াস।

কোলকাতা পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের কি নির্দেশ দেওয়া হলো সম্পূর্ণ জানা না গেলেও তার কিছুক্ষণ পরে লালবাজারে একটা জরুরী মিটিং বসেছিল। সেই মিটিং-এ সুমিত্রার দাদা পেনসিল দিয়ে ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার বলে কি সব যেন নোট নিচ্ছিল। প্রেসিডেন্সীর উপর ওয়াচ রাখতে হবে। নকশালবাড়ীর ঘটনায় ওখানকার রিঅ্যাকশান বুঝতে হবে। এস-বি-র এই কাজে প্রধান সহযোগিতার দায়িত্ব এল সুমিত্রার দাদার।

কয়েক মাস যেতে না যেতেই ছোটোখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেলেও কোলকাতায় যেন একটা তরঙ্গ বইতে শুরু করল।

'নকশাল বাড়ী লাল সেলাম' এই নামে যেন কি খেলা শুরু হলো।

'যুক্তফ্রন্ট লাল সেলাম' এই ধ্বনি এত বেশী উঁচু স্কেলে সোচ্চার ছিল যে নকশাল-বাড়ী লাল সেলামের ধ্বনি হারমোনিয়ামের স্কেলে চড়ায় উঠতে পারল না।

তারপর কত কি হলো। কংগ্রেসের খাদ্য মিছিল, পদ্মজার বিদায়, ধর্মবীরের ধর্মরাজ্যে যুধিষ্ঠিরের দায়িত্ব পালন করতে আগমন, কানু সান্যালদের নতুন আলোর বন্যা।

কানু বিনা শ্লোগান নেই—জ্যোতি বিনা সভা নাই—অজয় ছাড়া নেতা নাই—কংগ্রেস ছাড়া নিন্দা নাই—এমনই অবস্থা আর কি।

সেদিন রোববারের বিকেল।

বনগাঁ লোকালে অধীরদের সঙ্গে আলোচনা সেরে ফিরছে বিমল। রোববারের বনগাঁ লোকালে ভীড় একটু কম। তা না হলে নর্মাল ভীড়ে বিমলকে কেউ চিনতে পারলে মেরেই খাদি করে দেবে এটি জানে বিমল। কাঁধের ঝোলাতে বস্তাপচা যুক্তি দেওয়া বঙ্গবাবুদের পাণ্ডিত্যের একখানা পাণ্ডুলিপি—"যুক্তফ্রন্ট আসলে কি?"

সেই নানা রকম যুক্তি। একটা গরুর গাড়িকে গরু ছাগল ভেড়া গাধা দিয়ে

টানলে গাড়ি চলবে কিনা এসব যুক্তি। মোটামুটি শিশুমেলায় এসব গপ্পো! বলে গ্যাস্কো-খাওয়া ছেলেদের কাছে লজেন্সের বিনিময়ে কিছু হাসি পাওয়া যেত। সিঙ্গল লাইনের ঘামে-ভেজা কেরানীকুলের, বনগাঁর মানুষের কাছে এসব যুক্তি কি খাটে? তবুও বইটা ঝোলায় না রাখলে নয়—তাই রেখেছে।

যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে গরুর গাড়িকে অনেক পশুতে টানার যুক্তি শুনে প্রতিবাদ করে একদিন সুব্রত বদুবাবুকে বলেছিল, আমাদের যদি ওরা প্রশ্ন করে যে এতদিন গরুর গাড়িটা মানুষ টেনেছিল না গরু টেনেছিল তাহলে আমরা কি জবাব দেব?

তার মানে? লাল চোখ করে বলেছিল বদুবাবু।

সুব্রত বলেছিল, যদি বলি মানুষে টেনেছিল তাহলে সবাই হাসবে। কারণ গাড়ি আবার মানুষে টানে নাকি? আর যদি বলি গরুতে টেনেছিল তাহলে বলবে আমাদের নেতারা গরু ছিল?

তুমি থাম—! এসব কথা তোমরাই বলো, বুঝলে? কংগ্রেসের বদনাম কংগ্রেসী লোকেরাই বেশী করে—

সুব্রতও ক... ... না। এক রকম চেঁচিয়ে বলল, থামুন, থামুন, ভালো যুক্তি ও তথ্য দেবার যোগ্যতা না থাকলে এসব বলে পার পাওয়া যায় না।

হাতাহাতি হয় আর কি। কালীঘাটের মলয়রা এসে না থামালে সেদিনই ওখানে সুরাট কংগ্রেস হয়ে যাচ্ছিল।

ট্রেন থেকে নেমে অধীর আর বিমল একসঙ্গেই হাঁটছিল হ্যারিসন রোড ধরে মহাজাতি সদনের দিকে! বিরাট একটা মেয়েদের মিছিল যাচ্ছিল। সেই একমাত্র ধ্বনি—যুক্তফ্রণ্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার।

অধীর বলল, দেখ বিমলদা! কত মেয়ে ওদের। আমাদের মহিলা ফ্রণ্টে কিন্তু কেউ নেই।

—আছে, আছে। ইন্দিরা গান্ধীকে দেখবার জন্য আর তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবার জন্য কংগ্রেস ভবনে কয়েক পীস আছে। তার মধ্যে তিন চার জনের যা সুনাম আর খ্যাতি তা মুখে আনা যায় না। সবাই তো আর পূরবীদি, বিভাদি, ফুলদি নয়। বাকি যা আছে তাদের নিয়ে বের হলে ইঁট পাটকেল আরও বেশী করে পড়বে।

দমদমের অনিমা, শিলিগুড়ির গীতিকা, খোকাদার পাড়ার বৌদি আর পূর্বস্থলীর হাওয়াহদিদের দিয়ে কিছু করা যায় না? অধীরের প্রশ্ন বিমলের প্রতি।

যাবে না কেন? কিন্তু ওদেরকে কাজ করার স্কোপ দেবার কথা ভেবেছিল কি আমাদের নেতারা? ওদের কোনো পাত্তাই দেয় না।

আমি বলি কি বিমলদা, তুমি বরং একবার প্রতাপদাকে বলো। অনিমাদি দমদমে আমাদের যা সাহায্য করছে তা বলার নয়। নিশ্চয়ই ওরা কিছু করতে পারবে।

তার চেয়ে ভাবছি সুমিত্রাকে রাজি করিয়ে নামানো যায় কিনা। লেখাপড়া জানে। আর বেশ বুদ্ধি রাখে। বিমল বললে।

মন্দ কি, দেখ না চেষ্টা করে। মোট কথা মেয়েদের একটু একটু করে নামাতে না পারলে আমার একলা পেরে উঠব না বিমলদা।

মহাজাতি সদনে পৌঁছেই দেখে চন্দননগরের বিমল ঘোষ দাঁড়িয়ে। ওদের বাড়ির সবার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে চন্দননগরের চন্দন-চর্চ্চিত মন্ত্রীর সাঙ্গপাঙ্গরা। সাদা বাঙলায় বিমল এখন উদ্বাস্তু। বাবা-মাকে আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে একা এসে দাঁড়িয়ে আছে মহাজাতিতে।

চন্দননগরের বিমল ঘোষেরা এখনও স্বপ্ন দেখছে যে কংগ্রেস আবার ফিরে আসবে। সমাজবাদ আসবে। বনগাঁর অধীর ভাবছে অত্যাচার থামবে।

বাদাম চা আর মুড়ি খেয়ে রাত কাটাতে হবে আজ বিমলদের। পয়সা নেই। একটু পরেই সুব্রত এসে হাজির হলো।

কি রে, এদিককার খবর কি? সুব্রতকে প্রশ্ন করল বিমল।

খবর ভালো নয় বিমলদা। প্রেসিডেন্সীর বেশ কয়জন এ্যারেস্ট, অনেকে বেপাত্তা। ডি-ওয়াই-এফের একটা ছেলে কাল খুন হয়েছে গড়পারে। মনে হচ্ছে নকশালরা মেরেছে। কিন্তু উদ্বাস্তু হয়েছে আমাদের ছেলেরা। ওদেরকে মানিকতলায় নির্মলদার সেলটারে রেখে এসেছি।

কাল সকালে একবার সুমিত্রার কাছে যাব বুঝলি, ওকে বুঝিয়ে দেখা যাক নামানো যায় কিনা।

মুড়ি খেতে খেতেই সুব্রত বলল, কাল তো দিল্লী থেকে পাতিল আসছে ভবনে। সকালবেলায় নাকি মিটিং হবে। তুমি যাবে না?

না, ওসব করে লাভ নেই। হাঁড়ি পাতিল আমাদেরই সব ভাঙছে, আর দিল্লীর পাতিল দেখে কি হবে? বিমল একটু বিদ্রূপ করেই বলল।

॥ পনেরো ॥

লাগ্ ভেলকি লাগ্—আচ্ছা করে লাগ্!

চাটনি খাবার মতো জিহ্বা দিয়ে টক্-টক্ শব্দ করতে করতে মন্ত্রী হবার জন্য প্রস্তত একজন কংগ্রেসী এম-এল-এ এসে হাজির হলেন ভবনে। পড়বি তো পড় একেবারে সুহৃদদা, বিজয়ানন্দদার ঘরের সামনে। বিজয়ানন্দদা তখন একটা বড় গ্লাসে চা নিয়ে মাথা ঝুঁকে অমৃতবাজার পত্রিকা পড়ছিলেন। এম-এল-এ-র আহ্লাদ দেখে বিজয়ানন্দদাই বললেন, লাফিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? পুলকটা কিসের?

জানেন না বুঝি, আমার এলাকায় সি-পি-আই, সি-পি-আই (এম)-এ শুরু হয়ে গেছে লড়াই। সকালে যে তুলকালাম কাণ্ড গণকমিটি নিয়ে—তারপর মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তি, পুলিশ। বেশ জমেছে বিজয়ানন্দদা। পান খাওয়া মুখে চুন লাগিয়ে বোঁটা ভেঙে বলল সেই এম-এল-এ-টি। বিজয়ানন্দদা বোধ হয় সন্তুষ্ট হলেন না। বেশ তীক্ষ্ণ সুরেই বললেন, ওদের ঝগড়ায় তোমার আনন্দ কেন বাপু? নিজেরা হেরে গেছ এটা মেনে নেওয়াতেই সার্থকতা থাক।

কি যে বলেন, ওরা দেশে থাকলে দেশটা ছারখার করে দেবে। আমাদের একটা দায়িত্ব নেই। এমন ভাবে কথাটা বললে সেই এম-এল-এ-টি ভাবটা যেন এই—ওঁরা সরকার পেলে চব্বিশ ঘণ্টায় ঘরে ঘরে সমাজতন্ত্র পৌঁছে দিত। বেলা বাড়তেই একটু একটু করে লোক আসতে শুরু করল। এখন যেন একটু জোয়ার আসছে আবার।

সঙ্গে আছে একশ সাতাশ—তার ওপরে শরিকী লড়াই! কোনমতে গোটা কুড়ি সদস্য ভাঙাতে পারলেই সরকার হবে। পদ্মজা বিদায় হলেও ধরমবীর তো বসেই আছে শপথ নেবার ঘরে। কখন তাঁরা আসেন—সেই আজন্ম মন্ত্রী থাকার বাসনায় গদগদ, মন্থর গতি, চব্য চোষ্য লেহ্য পায়ী, দ্বিপদ বিশিষ্ট, চর্বিমার্কা সাদা খদ্দরের—নেহেরু গান্ধীর বেনামদার কয়েক পীস্ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পক্ক কেশবিশিষ্ট কলপ-লাগানো ভদ্রমহোদয়গণ।

অজয় মুখার্জীও নাকি খুশি নন এখন সরকারের উপর—এসব কথাও বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। কোলকাতার উপকণ্ঠে কোনো এক বাগানবাড়ি থেকে কালো গাড়ি ভায়া উত্তর কোলকাতা—সন্ধ্যাবেলা রাজভবনে যাতায়াত শুরু করে দিল।

'ডালহৌসি পাড়ার মধ্যবিত্ত কেরাণীকুল, দুপুর রোদে টিফিন করবার সময় সিঙ্গাপুরী কলা—ছোলা আর শশার সঙ্গে দেশহিতৈষী, গণশক্তি, কালান্তর জাতীয় নানা কাগজের উপর নির্ভরশীল সত্যাসত্য নিয়ে এই বিরাট বিপ্লবের হাতিয়ার যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বিপদ ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া। মরিয়া ট্রেড ইউনিয়ান, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, মার্কেনটাইল ফেডারেশনান, এ-বি-টি-এ— সবাই।

শুধু মেমারীর গ্রামে, বাদকুল্লা রাজগঞ্জ থানার গ্রামগুলোতে নিরন্ন চাষী আর ক্ষেতমজুরের দাবী, চাহিদা পূরণের জন্য—একখণ্ড লাল রুমাল তার গলায় বেঁধে তাকে শোভাযাত্রায় নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো প্রোটেকশান রইল না।

রাজগঞ্জে একজন শিক্ষিত যুবক প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা শুধু মিটিং-এ গিয়ে রেড স্যালুট করে লাভ কি? আমাদের জমির বণ্টনের ব্যাপারে পপুলার কমিটির কাজের কি হবে?

চট্ করে উত্তর দিয়েছিল শহর থেকে আসা শিক্ষিত, টেরিলিনের বুশসার্ট-পরা কমরেড, আগে আমাদের শিক্ষিত সচেতন হয়ে উঠতে হবে পার্টির চিন্তায়, দীক্ষায়—তারপর শ্রেণী শত্রুকে চিনতে হবে। তারপর লড়াই। সেই লড়াই থেকে আসবে আমাদের মুক্তি!

রাজগঞ্জের গ্রামের প্রি-ইউ পাশ করা কৃষক পরিবারের ছেলের কাছে এই ডায়ালগটা একটা থ্রিল! মনটা যেন ফাগুন মাসের আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই পপুলার কমিটির মিটিংটা রাজগঞ্জের জোতদারের বাড়িতে যখন অনেক রাতে হলো, ধর্মগোলার নামে জোতদার বাড়িতেই লেভির ধান মজুতের ব্যবস্থা হলো তখন চেতনার রঙে কিছু আর সবুজ বা রাঙা হয়ে উঠল না।

সব যেন ফিকে হয়ে গেল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অত সুন্দর লাল টকটকে পতাকাটার প্রতিবাদ মুখর একটা প্রতীক যেন কেমন ঝাপ্সা হয়ে গেল। গোলমাল হয়ে গেল অনেক শ্লোগান—অনেক কিছুই।

সেই গোলমালের সুযোগে আই-সি-এস ধরমবীরার এস্রাজে ঝন্ঝন্ করে শব্দ হলো। কংগ্রেস ভবনের তানপুরাটা নিয়ে দু' একজন সুর সাধতে লাগল—

বল মা কবে মন্ত্রী হব/মন্ত্রী বিনা কেমনে রব?

তাদের সুর ও তানকে জমিয়ে তোলার জন্য সরবৎ, পান সরবরাহের জন্য যেসব সাকরেদ কাজ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন একালের বাঙলা সাহিত্যের, রাজনীতির পরিভাষায় আর ক্ষমতার রাজনীতির ইডিয়ম বা ফ্রেজ শ্রীযুক্ত শ্রীল

শ্রীশ্রীআশুতোষ ঘোষ। সুন্দরীমোহন এভিনিউর সবচেয়ে অসুন্দরের উপাসনায়-রত তদানীন্তন সার্কাসের রিং মাষ্টার!

বিমল সুব্রতর দল এ সবের বাইরে।

ওদের নিজেদের মনেই ঘেন্না এসে গেছে এইসব লোকগুলোর প্রতি।

খড়দায় আহত হলো বিমল। নিহত যে হয় নি নেহাৎ বাপের ভাগ্যি। তা না হলে আর একটা ভাল জাতের শোকসভার মোটা রজনীগন্ধার মালার জন্য কংগ্রেসের প্রোব্যাবল মিনিস্টারের পাঁচ টাকা খসত। সে চান্স দিল না কোলকাতা মেডিকেলের ডাক্তাররা—ব্যারাকপুরের ট্যাক্সি ড্রাইভার আর বিমলের ভাগ্য। পানিহাটির শক্তসামর্থ্য কিছু রাতের-বেলার নওজোয়ান দিনের বেলায় এই কাণ্ড করল সবার চোখের সামনে।

সেদিনই মেডিকেল কলেজে ছুটে এসেছিল সুমিত্রা। বিমলের কাছে দাঁড়িয়ে অসহায় হয়ে দেখছিল ওকে।

বিমল বলেছিল, কিছুই হয় নি সুমিত্রা। ভাল হয়ে যাব। সুব্রতকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। ওর ওপরও টার্গেট আছে।

আস্তে করেই বলেছিল সুমিত্রা, এগুলো করে কি যে আনন্দ ওদের।

ওদের আনন্দ নয় সুমিত্রা। আমরা প্রায়শ্চিত্ত করছি আমাদের পিতামহ, পিতামহীদের পুরনো কৃতকর্মের। লাঙ্গল যার জমি তার বলে মাতিয়েছি আকাশ বাতাস, আর টাকা যার ভোগ তার—এই নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করেছি ঘরে ঘরে একটু আঘাত পেতে হবে না। লাঙ্গলের নামে মিথ্যা কথা বললে আঘাতটা লাঙ্গলের ফলার মত হওয়া দরকার।

সুব্রত এসে যখন জানিয়েছিল বিমলকে যে সরকার নাকি পাল্টে যাবে, সে শুনেছে তখনও জবাব দিয়েছে বিমল, পাল্টালে আরও ভয় রে সুব্রত আরও বেশী মার খেতে হবে। কারণ পাবলিক সাপোর্ট এখনও আমাদের দিকে পুরো-পুরি আসে নি।

সেদিনকার বিমলের আহত হবার মত একটাই লাভ বা এ্যাচিভমেণ্ট—সেটা হলো সুমিত্রার ডিরেক্ট পলিটিক্স করার সম্মতি।

স্নেহ, প্রেম, অনুরাগ, ভালোবাসা বা কিসের ভিত্তিতে সুমিত্রার এই সিদ্ধান্ত বোঝা না গেলেও একটু বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে শুধু হামলা হানাহানি আর রক্তপাতে মা-বোনেদের সহজ সরল মন আর স্থির থাকতে পারে না, তাদের হয়ে কেউ কেউ বোধ হয় ভাবছিল একটা প্রতিবাদ করা দরকার।

এর পেছনে তত্ত্ব নেই, যুক্তি নেই, সামনের দিনের জন্য কোনো পরিকল্পনাও নেই

—শুধু ছিল অন্যায় আক্রমণ আর এখানে, ওখানে প্রচুর রক্তপাতের বিনিময়ে কিছু অশ্রুজলের সমর্থন—সহানুভূতি। কংগ্রেস ভবনে যখন বিজয়ানন্দদার ঘরের সামনে বসে পান চিবিয়ে চিবিয়ে শরিকী ঝগড়ার কথা তুলে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেই এম-এল-এ-টি, তখন সুব্রত এসেছে সুমিত্রাকে নিয়ে কি একটা বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ করতে। ওদের আসা-যাওয়া অনেকে পছন্দ করত না। অনেকেই চাইত না ওরা আবার এর মধ্যে কিছু কাজ করুক। কারণ দাদাদের কাছে ওটা ছিল এক ধরনের মাতব্বরি। কিন্তু ভবনের নিমাই, জগা, বুলবুল, অসীমরা দাঁড়াত ওদের পাশে। কারণ কালীঘাটের বুলবুলের সংসারেও মন্ত্রীর গলার রজনীগন্ধার মালা জীবনে পৌঁছবে না এটা সে জানত—আর সুব্রতদের জীবন মৃত্যুটাই এখন নিশ্চিত এটাও অনুমান করেছিল কেউ কেউ।

সেই এম-এল-এ-কে পান চিবোতে দেখেই চটে উঠল সুব্রত—এখানে বড় বড় বাত মারছেন আর এলাকার ছেলেদের কলেজের পোষ্টার লিখতে দুটো টাকা দেন নি। আপনারা আবার নেতা?

ভীষণ চটে উঠলেন সেই-এম-এল-এ-টি। তোমরা কে হে? দুদিন বন্দেমাতরম করে বড় বড় কথা বলছ? কলেজে কলেজে পলিটিক্স করার বিরুদ্ধে আমি। লেখাপড়া শিখে মানুষ হও।

এবার এম-এল-এ-র জ্ঞান শুনে ফোঁস করে উঠলেন বিজয়ানন্দদা, ওসব বললে চলবে না বাপু। যা করার ওরাই করছে। তোমার দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কোন ডিসিপ্লিন নেই। আমি কলেজ কমিটির সেক্রেটারী আর আমার বিরুদ্ধে এরা হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেছে গত সাতদিন— জানেন আপনি?

করেছি বেশ করেছি। টাকা ঘুষ নিয়ে আপনি লেকচারারের চাকরী দেন, কলেজের ফাণ্ড তছরূপ হয়েছে—আমরা তাই এসব করছি এবং আরও করব। এসব কথা বলেই সুব্রত বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে। অপ্রস্তুত হলেও এম-এল-এ সামলে নিয়ে বলল, যত সব ইন্‌-ডিসিপ্লিন ছোকরার দল।

একটু পরেই বড়কর্তার ঘরের কয়েকজন নেতা বেরিয়ে এলেন। অপারেটারের কাছ থেকে জানতে পেল অরূপরা যে দিল্লী, আশু ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষেদের সঙ্গে নাকি কি সব কথাবার্তা হলো।

বেশ খুশি খুশি ভাব সবার। এর পর বেশ কদিন কেটে গেল। কোলকাতার আর বাঙলার সাধারণ জীবনে খুন খারাপি ঘেরাও চালু থাকলেও অন্য কোনো বৈচিত্র্য নেই। শুধু অনেক রাতে সুন্দরীমোহন এভিনিউর কিছু দূরে দুটো কি একটা গাড়ি এসে দাঁড়াত। নেমে আসত দুজন একজন লোক চোরের মত।

আর সুন্দরীমোহনের বিরাট একটা বাড়ি থেকে আসত দু' একজন দূত। তার পরই এরা যেন কোথায় চলে যেত।

রাতের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। শরিকী তাণ্ডব সমান তালে শুরু হলো!

কে জিতবে?

বিমল সুব্রত একটা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে 'অন্ধকারের দিনগুলির' প্রদর্শনী শুরু করেছিল। অবশ্য পুরো আইডিয়াটি সুমিত্রার। সুমিত্রাই বললে বিমলকে, একবার অন্ততঃ কিছু একটা করে মানুষকে আবার ফেস করি না কেন? রিয়্যাকশানটা বোঝা যাবে।

সুমিত্রার প্রস্তাবই তথাস্তু। কিন্তু বিমল সুমিত্রারা জানত না যে আরও অন্ধকারের দিন আসছে, যার ছবি প্রদর্শনী করেও শেষ করা যাবে না।

এদিকে কোলকাতা ইউনিভারসিটির হলে সেই প্রদর্শনীর কাজ শুরু হলো··· অন্যদিকে অন্ধকার রাতে শুরু হলো যুক্তফ্রন্ট ভাঙার মহড়া।

॥ ষোল ॥

এখন অনেক রাত!

লাশঘরে রাত! সেখানে কর়োনারের ফেলে রাখা ছুরি কাঁচি সদ্য কাটা বেহালার একটা লাশের পাশেই পড়ে আছে। সকাল হলেই মিছিলের জন্য নিবেদিত হবে। কার লাশ কে জানে? হয়ত বা কোনো পার্টির কিংবা কোনো দলেরই নয়। হোক না হোক এর ওপর মা-বাবার কোনো ক্লেইম নেই। হয় যুক্তফ্রন্টের শরীকের লাশ—না হয় যুক্তফ্রন্ট বিরোধীদের লাশ। মর্যাদা শহীদের। স্মৃতিস্বরূপ একটুকরো মার্বেল পাথরে একটা ছোট্ট নাম—আর কিছু অশ্রুজল। বেহালার সুনীল বোসের তাজা প্রাণ দুপুর বেলাতেও ডালহৌসির দুপুরে সতেজ ছিল। তখনও মার্কেনটাইল ফেডারেশনের মিছিলে সোচ্চার ধ্বনি "আমাদের হাতিয়ার যুক্তফ্রন্ট সরকার।" তখনো 'রাষ্ট্রদূত,' 'দেশহিতৈষী', 'যুগের ডাক', 'দর্পন', 'যুগবাণী'র দেওয়ালে সাঁটা গরম নরম খবরের জাল দিয়ে মিছিল চলেছে —চক্রান্ত রোখার মিছিল। দিল্লী, কোলকাতার যোগাযোগ হয়ত রাজভবনের টেলিফোনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মহাকরণের যোগাযোগ তখনও বিহারের মহামায়া প্রসাদ, ইউ-পির চরণ সিং আর কেরালার নাম্বুদ্রিপাদকে নিয়ে রীতিমত চঞ্চল! অস্থির!

সুনীল বোসেদের লাশঘরে স্থান সঙ্কুলান হবার পরও বেহালার গান্ধী সুবোধ

দাস বোঝাতে চেষ্টা করছে অনেককে গান্ধীবাদের মাহাত্ম্য কত নিখুঁত আর উজ্জ্বল। কে শোনে কার কথা। তখন "অন্ধকারের দিনগুলির" প্রদর্শনী দেখতে যাদের আগ্রহ তাদের বুকের পাটা অনেক। যারা করেছে আয়োজন তারাও কম নয়।

অন্ধকারের দিনগুলি অন্ধকার রাতে লাশঘরের ভয়ঙ্কর অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল চক্রান্তের পরিণতি! সকালবেলা কাগজ পড়তে পড়তেই সুমিত্রা একটা দুটো প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল ওর দাদার কাছে-এস-বি খবরগুলো। ওর দাদা বেশ গম্ভীরভাবেই জবাব দিয়েছিল যে রাজনীতি নিয়ে অহেতুক নাক গলানোটা কোনোমতেই লোভনীয় হবে না সুমিত্রার পক্ষে। সুমিত্রা অবশ্য বলেই দিয়েছিল মনের কথা—"একটু নেমেই দেখি না এর মধ্যে মন্দটা কি আছে জানতে—"

প্রথমটায় হেসে দিয়েছিল ওর বৌদি। সিরিয়াসলি নেয় নি। তারপর কিন্তু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সুনীল বোসের খুনের খবর, মিছিল ও শোকের সব বিবরণ যখন বাসি হয়ে গেল তখন বিধানসভার কয়েকজন জনগণ-মন-ধন্য সদস্য একে একে নিরাপদ আশ্রয়ে—তেজ—ত্যাগ—দেশপ্রেমের পরকাষ্ঠা দেখাতে সুন্দরী মোহন এভিনিউর প্রাসাদে প্রসাদ ভক্ষণে ব্যস্ত।

একটা বেসরকারী কোম্পানীর প্লেনে সকালবেলা জলপাইগুড়ির যজ্ঞেশ্বর যখন এসে পৌছালেন তখন তাঁকে সুন্দরীমোহনের মোহনভোগ খাওয়াতে ব্যস্ত ইদানিং কালের একজন এম-পি এবং তদানীন্তন কালের একজন দল ভেঙে যাওয়া শরীকের জনপ্রতিনিধি। অপর দিকে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যজ্ঞেশ্বর রায়কে রাখার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের পুরোহিত হিসেবে যিনি সেই সকালে এসে বিমানবন্দরে হাজির হলেন তিনি ইদানিং কালের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এবং তদানীন্তন বাঙলা কংগ্রেসের একজন নেতা।

এই টানা হ্যাঁচড়ার খেলা দেখতে সুমিত্রা হাজির ছিল এয়ারপোর্টে ওর দাদার সঙ্গে। সেদিন সকালবেলা একটু বাদেই দিল্লীর একজন নামজাদা শক্তিমান মন্ত্রীর নামবার কথা কোলকাতায়। বিমল সুব্রতদের সঙ্গে তাঁকে রিসিভ করতে গিয়েছিল—অন্য দিকে দাদার সঙ্গে থেকে যদি একটা অটোগ্রাফ নেওয়া যায়।

চোখের সামনেই বাদামী আর কালো রঙের এ্যামবাসাডার গাড়ির এই ছোট্ট প্রতিযোগিতায় বাঙলা কংগ্রেস নেতা হেরে গেলেন। যজ্ঞেশ্বর রায়কে রাজসূয় যজ্ঞের জন্য পাওয়া গেল না। তিনি যুক্তফ্রন্ট ভাঙার অশ্বমেধ যজ্ঞের

শিকার হলেন।

"অন্ধকারের দিনগুলিতে" ভীড় যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তার মধ্যেই ফিস ফিসিয়ে কেউ বলছে—"জোর নাকি চক্রান্ত চলছে? সরকার নাকি ভেঙে যাবে? আচ্ছা, পুরো কংগ্রেস হবে তো? নানান রকম খবর। এত সব খবর কেমন করে দেবে সুব্রত বিমল। ওরা তখন কোনমতে ছাত্র পরিষদের আহত অবসন্ন মার-খাওয়া দেহটাকে সঞ্জীবনী খাওয়াতেই ব্যস্ত। এত ছোট লাগছে গায়ে যে বলা যায় না। ছোট্ট উত্তর দিল সুব্রত, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না। নিজের ছেলেদেরই ধরে রাখতে পারছি না তার আবার গবরমেণ্ট।

সুমিত্রা টেবিল নিয়ে কাউণ্টারে বসে বোধ হয় কয়েকটা বই বিক্রি করছিল। বেশ কয়েকজন ওরই মধ্যে টিটকিরি দিয়েছিল—দালালী হচ্ছে—এরপর ফেসটা ঠিক থাকলে হয়।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সীর চার দেওয়ালে সাবলীল সামর্থ্য আর বেকার লাইব্রেরীর নিভৃত অবসর আর হিন্দু হোস্টেলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নকশালবাড়ীর পথ অনেক প্রশস্ত। কলেজ স্ট্রীটের সামনে পুলিশের জীপ থামতেই ওখান থেকে একজন ইন্‌সপেকটার এসে খবর দিল সুমিত্রাকে দ্রুত বাড়ি যেতে। ওর দাদার নাকি মেসেজ। সুমিত্রা টেলিফোন বুথ থেকে লর্ড সিন্‌হা রোডে ওর দাদাকে ফোন করল। একটু বাদেই ফিরে এসে সুব্রত বিমলকে বললে, তাড়াতাড়ি প্রদর্শনী গুটিয়ে বাড়ি যেতে। কি নাকি একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। বিমল সুব্রত নাছোড়বান্দা। ওরা প্রদর্শনী গোটাতে রাজি নয়। যা হয় হবে। ওরা পালাতে চায় না।

সুমিত্রা যখন বাড়ি চলে এলো তখন রেডিওতে ফ্রন্ট সসকার ডিসমিস্ হবার সংবাদ চলে এসেছে। অজয়বাবু নাকি তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটা আলোচনার জন্য ব্যস্ত। ব্যাপারটা হঠাৎ করেই সব হয়ে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয় লনে অনেক আশা নিয়ে বিমল সুব্রত 'অন্ধকারের দিনগুলির' ছবি সাজাতে যখন ব্যস্ত তখন আর এক অন্ধকারে রাজভবনের মার্বেল হলে শপথ হয়ে গেল অনেকের। পোয়া, সিকি, হাফ, ফুল সব রকমের মন্ত্রীদের। জ্ঞানী, গুণী, প্রবীণ, নবীন অনেকেই চান্স পেলেন।

সুন্দরীমোহনের আশীর্বাদপুষ্টদের মধ্যে চান্স পেলেন খুব কম মহাপুরুষ। রাতের বেলায় সরকার বানাবার সাক্ষী ধর্মবীরের দায়িত্ব ধর্মবীর পালন করলেও দিনের আলোতে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আর জনরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে

এলো মহানগরীর উত্তাল জনতা।

তখন ঘড়ির কাঁটাও যেন দ্রুত চলছে। দ্রুত বোমা বারুদ পাইপগানের প্রস্তুতি—দ্রুত মিছিল। দ্রুত পুলিশ ভ্যান।

পি-ডি-এফ সরকারের বিলম্বিত লয়ের সুর হলেও ত্রিতালে প্রচণ্ড গতিতে বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল এখানে ওখানে।

একশো চুয়াল্লিশ ধারার বাধা ভাঙতে ছুটে গেলেন অজয়বাবু নিজে নেতৃত্ব দিয়ে। ফটোগ্রাফারদের বিরাম নেই। কত মিছিল, কত ছবি, কত রক্ত, কত গ্রেপ্তার আর কত না হা হুতাশ!

সর্বনাশের আগুন জ্বলল বিমল সুব্রতদের সদ্য গড়ে-ওঠা বাহিনীর কয়েকজন যুবকের কপালে। কেউ জানতে চাইল না, বুঝতে চাইল না ওদের কথা। ভাববার চেষ্টাও করল না যে চক্রান্তের আশে পাশে বিমল সুব্রতরা ছিল না। যে কেউ নীরবে অথবা সরবে পি-ডি-এফের সমর্থনে আছে কিংবা প্রতিবাদের মিছিলে সামিল হতে চাইছে না তাদের প্রতি আক্রমণ শুরু হলো আর এক অমানুষিক জিঘাংসার মত। হিসাব রাখার সময় নেই তখন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালগুলির এমার্জেন্সীতে। শুধু কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির শ্মশানগুলোতে হিসেব থাকল মোট লাশ-কাটা ঘর-ফেরৎ মৃতদেহগুলোর। সেখানে সুনীল বোস থেকে আর সবারই একই নাম—একই পরিচয়। "আমরা শরিকী লড়াই বা রাজনৈতিক হানাহানির সামান্য সাক্ষী থাকতে নীরবে নিভৃতে ছোরা, বোমা ও বন্দুকের সামনে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছি। আগামী পৃথিবী যদি পার তাহলে গণতন্ত্রের ভালোমন্দের পাতায় আমাদের সামান্য জায়গা দিও।"

চোখের জল ফেলছিল সুমিত্রা বালি স্টেশনের ছোট্ট মিছিলের উপর সশস্ত্র একটা আক্রমণ দেখে। হায় হায়, গেল গেল রব করে উঠেছিল অনেকেই। সুমিত্রাও। সুব্রত চোখের সামনেই দেখল চাল বিক্রি করা বিধবা বুড়ির পা হড়কে পাইপগানের নিশানার লক্ষ্যস্থল হয়ে গেল। সবাই পালাতে শুরু করেছে। কে কাকে দেখে। পুলিশ এসে লাশটা নিয়ে যাবে লাশ কাটা ঘরে।

"বাঙলা বন্ধ" শুরু হলো লাগাতার। আনাজ নেই, বাজার নেই। রক-গুলোতে ফাঁকা গুলতানির আসরেও চক্রান্তের আলোচনা। অথচ অতুল্যবাবু এর সমর্থনে ছিলেন না। এই তাড়াহুড়ো করে মন্ত্রী হবার তিথি নির্দিষ্ট করে রাজসূয় যজ্ঞের নামে নরমেধ যজ্ঞ করার বিরুদ্ধে আর যে কয়জন

সেদিন ছিলেন তাতে অতুল্যদাও ছিলেন।

তবু কি জানি কেন পি-ডি-একের কলঙ্ক কংগ্রেসকে বইতে হবে এর উত্তর সেদিন খুঁজে পায় নি তারকেশ্বরের বলাই, বর্ধমানের তুহিন, বোলপুরের কুমুদ আর পানিহাটির রূপক, সুভাষ, নান্টুবাবুর দল। বুঝতে পারে নি বা গ্রাহ্য করতে পারে নি বিমল-সুব্রত-সুমিত্রা। মহাজাতি সদনে কার্ফুর রাতে এসে একশো চুয়াল্লিশের দাপটে বসে থেকে শুধু ফোনের পর ফোন রিসিভ হচ্ছে কান্না আর চোখের জল আর হামলা ও খুনের। চলুক না কত চলে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

মাদ্রাজের মোহন কুমারমঙ্গলমের কাছেও মনে হয়েছিল বোধ হয় এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই বিধানসভা খুলে গেলে স্পীকার কি ভূমিকা পালন করবেন সে কাগজের খসড়া তৈরী করতে কামরাজের প্রিয়, মজদুরের প্রিয় প্রগতিশীল নির্ভীক আইনজীবি মোহন কুমারমঙ্গলম তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন।

একশ সাতাশের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে বাইরে মোতায়েন পুলিশ আর সুন্দরী-মোহন এভিনিউর স্পেশাল ক্যাটাগরীর দেশভক্ত মিলিয়ে যে কম্পোজিশান হলো তা নস্যাৎ করে দিল—স্পীকার তার সেই রুলিং দিয়ে। যে রুলিং-এর জন্য মাদ্রাজের কুমারমঙ্গলমকে যুক্তি জোগাড় করতে হয়েছিল। বাঙলা ও গোটা দেশের গণতন্ত্রের কাছে এক নতুন অধ্যায়, নতুন বিস্ময়।

বাইরের জনরোষ ও চাপকে উপেক্ষা করে গালাগাল হজম করতে করতে বিমল, সুব্রত, সুমিত্রারা বেরিয়ে সোজা চলে গেল গঙ্গার ধারে। সুব্রতই বললে কিছুক্ষণ চুপ থেকে—এবার কি হবে বিমলদা, সব গুলিয়ে গেল না?

আরো কিছু রক্ত বুঝলি। আরও কিছু লাশ যাবে লাশ কাটা ঘরে। আর কিছু হবে না। বিমল যেন ক্ষুব্ধ।

সুমিত্রা বললে, আমি বলি কি, নকশালদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করলে কেমন হয়?

পাগল নাকি তুমি। ওরা তো এসবের থেকে হাজার মাইল দূরে। ওরা কি আমাদের স্পেয়ার করবে নাকি?

কিন্তু আমার দাদা বলছিল যে ওদের অ্যাপ্রোচ যুক্তফ্রন্টের প্রতি খুব বিরাট হয়ে উঠেছিল।

সুমিত্রার এই কথা শুনে সুব্রত বললে, পুলিশ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রাজনীতি করা যায় না। রাজ্য জুড়ে শ্লোগান উঠল, ধর্মবীর বাঙলা ছোড়ো, আভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো।

আই-সি-এস ধর্মবীরকেই লক্ষ্য করা হলো শত্রু হিসেবে। সঙ্গে অবশ্য আশু ঘোষকেও বাদ দেওয়া হলো না। কিন্তু ধর্মবীরের যোগ্যতা আর বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারলে বাঙলার খুব সর্বনাশ হত এমন ভাবার কোন কারণ ছিল না। আসলে বেচারার কি দোষ? যদি গণতন্ত্রের বাজার দর আর কলাকৌশল ঘন ঘন পাল্টায় তাহলে তার আর কি করার থাকতে পারে। সে তো নিমিত্ত মাত্র। গণতন্ত্রের বুকে এই সামান্য চপেটাঘাতই ঘনিয়ে আনল কালো মেঘ। এই মেঘে বৃষ্টি হলো না। শুরু হলো রক্ত ঝরার দিন। অবিশ্রান্ত ধারা। কোথাও বিরাম নেই।

॥ সতের ॥

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমক সেনাদের অবস্থা কেমন হয়েছিল সে কথা ইতিহাসে আছে। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষমতা অবসানের পর দেশের তথাকথিত কংগ্রেসীদের কি অবস্থা হয়েছিল সে কথা রক্ত দিয়ে অনেকে অনুভব করেছে। পি-ডি-এফ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানের মত পুণ্য কাজ শেষ হলেও মহাকরণের ফাইলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সই করার মেয়াদ কিন্তু কমে আসতে লাগল!

হোলসেল এম-এল-এ স্টকিস্ট এবং সাপ্লায়ার শ্রীআশু ঘোষের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ অনুকম্পা ও কৃপা প্রদর্শন করলেন না বঙ্গদেশীয়—পূর্ববঙ্গীয় মেজাজের কঠোর পুরুষকার শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ। স্বভাবতই হোলসেল ডিলারের আপত্তি হবারই কথা। এত মেহনত করে একাধিক চেষ্টায় বিধানসভার বিবেকবান সদস্যদের ইম্পোর্ট করে আবার কয়েকদিনের মধ্যেই এক্সপোর্ট করে তার যদি দাম না পাওয়া যায়, তাহলে দুঃখ হওয়াটা স্বাভাবিক। ইম্পোর্ট করা জিনিস স্বভাবত ফিনিশ প্রোডাক্ট করে এক্সপোর্ট করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্টো হলো। এখানে ফিনিশ প্রোডাক্ট বানাবার আগের মালকে এক্সপোর্ট করার বোধ হয় দাম পাওয়া গেল না। যাকগে—তার জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ হলো এই যে ব্যবসায় নেমেই বুদ্ধিহীনতার জন্য এবং পাওয়ার পলিটিক্স ও ডিসেকসনের সফিস্‌টিকেটেড টেকনোলজি না জানায় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ যে কখনো কখনো ফেল করে—এটা তারই দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। পরবর্তীকালে গুজরাটের চিমন ভাই প্যাটেল আর হরিয়ানার রাও বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র সিং এবং মণিপুরের আলীমুদ্দিন মন্ত্রীসভা এই একই টেকনোলজির অভাবে ব্যবসায়ে

মার খেল। অথচ কেরালার অচ্যুত মেনন গভরমেণ্ট, উত্তর প্রদেশের চরণ সিং সরকার এবং কংগ্রেসের ত্রিপাঠী সরকার এই টেকনোলজি আয়ত্ত করেছিল বলে টিকে গেল।

মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নানে—গঙ্গাসাগরে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গে আরও অনেকে। একজন খবরের কাগজের ক্যামেরাম্যান তো বটেই। গঙ্গাস্নানের সাক্ষী ছিল গঙ্গাসাগর মেলার লোকেরা—পুণ্যার্থীরা। কিন্তু সেদিন সকালেই আগরপাড়া, কুলটি, বাঁশদ্রোনী আর গোমো হাবড়ায় রক্তস্নান হয়ে গেল কয়েকটি ঘরে। কে দালাল, কে দালাল নয়—কে পি-ডি-এফের পক্ষে আর কে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে তাই নিয়ে চায়ের দোকান, খেলার মাঠ, ক্লাবের আঙ্গিনায় যে বচসা শুরু হলো তাতে মকর সংক্রান্তি তিথি অনেক মা-বধূ-ভাই-বোনদের শিরে সংক্রান্তি হয়ে দাঁড়াল।

আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে তখন মিছিল করার প্ল্যান—একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে বারশ' চুয়াল্লিশ জনের গ্রেপ্তারের আলোচনা। তথ্য মন্ত্রণালয়ে নলিনাক্ষ সান্যালের ডেস্কে পি-ডি-এফের সমর্থনে বিপুল জনসমর্থনের সংবাদ নিয়ে প্রেস বুলেটিন কিংবা রেডিওর খবরে তারই পুনরাবৃত্তি। যদিও গঙ্গাসাগরের স্নানে প্রতিবছরই একটা ভীড় হয় তবু তার মধ্যেও যেন একটা প্রচারের আভাস। মগারহাটের একটা বাড়ির দাওয়ায় যে সভা তারই ছবি এমন করে দেওয়া হলো যেন উচ্ছ্বাস।

মকর সংক্রান্তির নিয়ম মেনে স্নান আহ্নিক সেরে—বামন সেজে ছাতু দই খাবার রীতি মানার সুযোগ তখন সুমিত্রার নেই, বিমলের নেই—সুব্রতরও নেই। অশোকা মণ্ডল, সুমিত্রা, সুপ্রিয়া, বিমল, সুব্রত সবাই গেছে বরানগরে অনশন-কারীদের সঙ্গে দেখা করতে। ওদের ওপর নাকি হামলা হয়েছে। আশ্চর্য পুলিশ প্রশাসন। ক্ষমতায় প্রফুল্ল ঘোষ থাকলেও—ওদেরও মনে মনে অস্থিরতা রয়েছে। ভাবছে এই বুঝি আবার যুক্তফ্রণ্ট চলে আসে। তাই হামলাকারীদের দমনের জন্য শক্তি তেজ প্রকাশ না করে, হামলা করা অন্যায়—এই ধরনের বৈষ্ণব মন্ত্র উচ্চারণ করেই তারা ক্ষান্ত রইলেন।

প্ল্যান হলো মহাজাতি সদনে এসে সুপ্রিয়া সুব্রতরা দেখবে ইউনিভারসিটি, অশোকা শঙ্কর দেখবে বরানগর। বিমল সুমিত্রা যাবে বনগাঁ।

সুমিত্রা এখন অনেক চটপটে। নম্র স্বভাবের সুপ্রিয়া মডার্ণ হিস্ট্রির এম-এ। শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে অনেকটা সুমিত্রাকে। শঙ্কর আর অশোকার পার্টনার-শিপ জমল না।

বাঙাল শঙ্করের টীকা-টিপ্পনী আর ছোটখাট মন্তব্যে অস্থির অশোকার তখন ক্রোধোন্মত্ত অবস্থা। অবশেষে বিমলের হস্তক্ষেপে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলো। সুমিত্রা বিমল শ্যামনগরের মোড় থেকে বাসে করে দু'একজন সাথীকে নিয়ে রওনা হলো বনগাঁ। পথে যেতে যেতে প্রশ্ন করল সুমিত্রাকে, কেমন লাগছে?

ভালই তো—বেশ থ্রিল আছে!

থ্রিলটার জন্যই কি এসেছ? না অন্য কোনো কমিটমেণ্টের জন্য? বিমল যেন একটু সোজাভাবেই প্রশ্নটা করল!

না, মানে ভায়োলেন্স হানাহানি এগুলোর বিরুদ্ধে একটা পজিটিভ স্ট্যাণ্ড আর কংগ্রেসের সেই বেসিক কমিটমেণ্ট সমাজবাদেও রয়েছে। সুমিত্রা বেশ গুছিয়ে থেমে থেমে উত্তর দিল।

ইতিমধ্যে কণ্ডাকটার এসে টিকেট চাইতেই বিমল পকেট থেকে পয়সা দিতে যাচ্ছিল। সুমিত্রা বাধা দিয়ে ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিল।

রোজ রোজ এত টাকা পাবে কোথায়?

যেদিন থাকবে না সেদিন দেব না। সকালের দিকের ডাউন বাসে ভীড়টা একটু কম। বিমল সুমিত্রা বাসে পাশাপাশি বসে কথা বলছিল।

এত দামী ঘড়ি পরে ওয়ার্কার্স মিটিং-য়ে যেতে নেই। ছেলেরা পছন্দ করে না। বিমল বলল সুমিত্রার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

ঘড়িটা সুমিত্রার বৌদি দিয়েছে। ওর বৌদির ভাই জার্মানীতে থাকে। সুমিত্রার জন্য পাঠিয়েছে। এ ঘড়ির সঙ্গে আমার কমিটমেণ্টের কি সামঞ্জস্য? তাছাড়া এটা একটা গিফ্ট।

না, তা নয়, গান্ধীজীর পার্টিতে যে যত সহজ সরল বা এক কথায় সিম্পল তার এ্যাকসেপ্ট্যান্স তত বেশী দলে।

একটু হেসে বলল সুমিত্রা, এটা বোধহয় ঠিক নয়। আমাদের দল ও সরকারের এমন লোককে আমি দেখছি যারা একেবারে এ সবের উল্টো। কিন্তু তাদেরকেও তো আপনারা এ্যাকসেপ্ট করে মালা চড়িয়ে জিন্দাবাদ করেন বিমলদা।

না, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি না, বিমল বলল, এসব তো আছেই। সে জন্যই তো বলেছি আমাদের দুরন্ত লড়াই। ভেতরে এবং বাইরে লড়াই।

আসলে আমি যা করতে চাই, বা আমার যা করা উচিত সেটার প্রতি কমিটমেণ্ট থাকলেই কি যথেষ্ট নয়? আমি কি পরছি বা না পরছি অথবা লোক দেখবার জন্য, কর্মীর মন জয় করবার জন্য একটু গরীব সেজে গেলাম—

এসব বোধহয় হিপোক্র্যাসি। সুমিত্রা একটু মুখ খুলেছে এবার।

পাশেই বিশু বসেছিল। ভোরের হাওয়ায় বাসে বসে ঢুলছিল আর কথাগুলো শুনবার চেষ্টা করছিল। রাজনীতির কথা, না প্রেমের কথা শুনতে দোষ কি? একটা জোর ব্রেক কষাতে বাসটাতে ঝাঁকুনি এল। বিশুরও ঘুম ভেঙে গেল।

বিমলকে বললে, তুমিও পারো বিমলদা, একটা ঘড়ি নিয়েই তোমার সেমিনার শুরু হয়ে গেছে। আর এদিকে যে কেউ কেউ রাঘব বোয়াল হজম করার পরেও নেয়াপাতি ভুঁড়িতে খদ্দর চড়িয়ে বসে আছে সেটা দেখতে পাওনা?

সুমিত্রা হেসে উঠল। বলল, না, বিমলদার কথাও একদিক থেকে ঠিক। আমরা যারা চেঞ্জ আনতে চাই তারা যতদূর সম্ভব পারফেক্ট হবো। তবে হিপোক্র্যাসি করে নয়—এটাই বলতে চেয়েছি। কম ঝুঁকি নিয়ে স্যাক্রিফাইস করে, অসীম, বিপ্লব, রনবীররা নকশালের দলে নাম লিখিয়েছে। তবুও কি চেঞ্জ আনা সম্ভব হচ্ছে?

বিমল বলল, আমি হার মানছি বাপু, আমি কমপ্রোমাইজ করছি।

যে জায়গায় ওদের নামবার কথা তার দু' স্টপ আগেই নেমে পড়ল বিমল সবাইকে নিয়ে।

এত আগে নামলে যে বিমলদা, বিশু বলল।

হেঁটে মাঠ দিয়ে ঘুরে যাব। স্কুল বাড়িতে মিটিং। স্কুলটাও ভেতরে। ওখানে নামলে, বাজারের স্টপে, আমাদের কেউ না থাকলে বা ফ্রন্টের যদি কোনো গ্রুপ থাকে আমাদের সন্দেহ করতে পারে।

সুমিত্রা বললে, ভয়ের কি তাতে? চলুন আমরা যাব।

বিমল বেশ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করল সুমিত্রাকে। বেশ সাহস বাড়ছে। একটু ভেবেই বিমল বলল, বেশ চলো, ভয় আমারও নেই।

বিশু বললে, আসলে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের সুমিত্রাদি। বিমলদা আমাদের নার্ভ দেখছেন। একটু হেঁটেই সবাই যখন বাজারের কাছে পৌছল তখন সেখানে বনগাঁর রাধা, কমল, রাম বসু দাঁড়িয়ে। সঙ্গে কোনো লোক নেই। ওখানে সুমিত্রারা পৌছতেই অধীর রাম ইশারা করে বললে, এই চায়ের দোকানটায় বসুন। চায়ের দোকানের পেছনে বোধ হয় দোকানের কর্মচারীদের থাকবার জন্য একটা মাচার মত আছে। চারদিকে আবর্জনা। সেখানটায় দেখিয়ে রাম বললে, বসুন আপনারা এখানে। একটু পরে বের হবো।

কেন বলতো? বিমল বললে।

পুলিশের গুলি বোধ হয় লেগেছে একটার। ফ্রন্টের ছেলে। ওকে হসপিটালে দিতে গেছে দলবল। এদিক দিয়ে ফিরে আসবে। ওরা এখান থেকে চলে গেলে তারপর আমরা যাব।

সুমিত্রা আবার প্রতিবাদ করলে, এতে ভয়ের কি আছে। আমরা তো গুলি করি নি। চলুন বিমলদা স্কুলে চলুন। ছেলেরা বোধ হয় বসে আছে।

ছেলে বেশী নেই। দশ বারো জনকে খবর দিয়েছি মিছিল চলে গেলে ওখানে যেতে। একটা টেনশনের মতো হয়েছে তো।

বিমল বললে, ছেলেটা কি কলেজের না স্কুলের—যার গুলি লেগেছে?

স্কুলের ছেলে, ক্লাশ ইলেভেনের।

কমল বললে, তাহলে আমাদেরও একবার হসপিটালে যাওয়া উচিত।

বিশু বললে, উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে পড়া ঠিক হবে না। ফ্রন্টের লোক। ছেলেটাও ফ্রন্টের।

তুই থাম্ তো। কোন ছেলের গায়ে লেবেল দেওয়া নেই, কে কি। কেউ ভালোবাসা, কেউ হুজুগ, আর কেউ সামান্য নীতি আদর্শ নিয়ে এক একটা দল করে। গুলি খেলেই বুঝি তার আর কোনো জাত নেই। শুধু পার্টির জাত। আমি এটা মানি না। আমরা ছাত্র—আমরা সব ছাত্রের দুঃখে এক। এটাই আমাদের নীতি। বিমল ছোট মত ভাষণ শুনিয়ে দিল।

কিন্তু ওসব কথা কি ওরা বুঝবে বিমলদা? রাধা বললে।

এখানে লুকিয়ে থাকার চেয়ে চলো হসপিটাল ঘুরে আসি। সবাই শয়তান নয়। সুমিত্রা রাজি হলো। অগত্যা বিশুকেও যেতে হলো। রাম দুটো রিকশা ডেকে দুজন করে চড়ল। ভাগ্যে স্ট্যাণ্ডে আর রিকশা ছিল না তাই কমল আর রাধার যাবার প্রয়োজন হলো না। ওরাও বোধ হয় বেঁচে গেল। উদাস নয়নে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রাম।

হসপিটালের সামনে অনেক লোক। একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে, কিছু পুলিশও রয়েছে। হায়রে মকর সংক্রান্তি। গঙ্গাস্নান আর রক্তস্নানের খেলা একই সঙ্গে।

রামকে সবাই চিনল, ছাত্রদের অধিকাংশ বিমলকে চিনল। ওদের দেখতে পেয়েই টেনশান চরমে উঠল। শ্লোগান উঠল—দালাল গো ব্যাক। পুলিশ বিমলদের ভেতরে যেতে দিতে চাইল না। সুমিত্রা পুলিশের বেষ্টনী ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ওকেও কেউ কেউ টিটকিরি দিল।

ভীড়ের মাঝখানে এসে সুমিত্রা বললে, আমার ভাইয়ের গুলি লেগেছে—

আমারও দেখবার অধিকার আছে। আপনারা ভেবেছেন কি? সবাই কি শুধু পার্টির নাকি?

বেশ একটু শান্ত হলো সবাই।

সুমিত্রা ভেতরে ঢুকে যেতেই আবার কেউ কেউ মন্তব্য শুরু করল, সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে! বুলেট দিয়ে সহানুভূতি! যত্তো সব। ফ্রন্ট সমর্থক মেয়েরাও মন্তব্য করতে বাকি রাখল না।

সুমিত্রা ছেলেটাকে দেখতে যেতেই ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণ বাদেই বাইরে ভীষণ হৈ চৈ শুরু হলো। বিমলদের নিয়ে টেনশান চরমে উঠেছে। পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছে উত্তেজিত ছেলের দল। কিল, চড়, লাথি বেমালুম চলতে লাগল। ইতিমধ্যে সুমিত্রা বেরিয়ে এসেছে হসপিটালের বারান্দায়। দেখতে পেয়েই ছুটে এলো। একবার শাড়িতে পা হড়কে পড়েও গেল। ঘড়িটা ভেঙে গেল। টের পেল না সুমিত্রা।

কি করছেন কি আপনারা! ছাড়ুন, ছাড়ুন! চিৎকার করে সবাইকে সরাতে সরাতে প্রায় ভেতরে চলে এলো বিমলের পাশে সুমিত্রা। পুলিশ এবার একটু সক্রিয় হলো উদ্ধার করতে।

পুলিশকে যা তা বলল সুমিত্রা।—ছেলেটাকে গুলি করেছেন, এদেরকেও বাঁচাতে পারেন না। আছেন কি করতে আপনারা?

ইতিমধ্যে হসপিটালের ভেতর থেকে ফ্রন্ট সমর্থক একজন ছেলে বেরিয়ে এল। সম্ভবত ছাত্র ফেডারেশনের নেতা হবে।

নিজে এসে ধিক্কার দিল তাদেরকে যারা একাজ করেছে। সমস্ত ভীড় স্তব্ধ। ছেলেটি এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল সুমিত্রার কাছে। রিক্শা ছেড়ে বিমলকে ফার্স্ট এইড করিয়ে ট্যাক্সি ডেকে দিল।

রাম পরিচয় করিয়ে দিল, সনৎ রায়, ছাত্র ফেডারেশনের নেতা।

বিমল বলল সুমিত্রাকে, দেখলে সুমিত্রা, আমরা যারা ছাত্র আন্দোলন করি তারা যতই মারপিট করি না কেন আমাদের হৃদয় এক।

বলেই জড়িয়ে ধরল ছেলেটিকে বিমল। বলল, আপনি আমায় আজ বাঁচালেন। আসলে আপনাদের আসাই ভুল হয়েছে। জানেন তো অ্যাংরি মবকে কণ্ট্রোল করা কত শক্ত। ছেলেটি ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে ওদের রওনা করে দিতে দিতে বলল, এর পর আমার সমর্থকরাই হয়তো আমায় টিপ্পনি কাটবে। কিন্তু সবটাই ম্যানেজ করতে হবে। তা না হলে রাজনীতি করা যায় না। বাই, দি

'বাই, আপনাদের সঙ্গে টাকা আছে তো ?

সুমিত্রা বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ছেলেটি কেমন থাকে জানাবেন। আমরাও খুব দুঃখিত ওর এই অবস্থার জন্য, তাই দেখতে এসেছিলাম। ধন্যবাদ আপনাদের। এক্ষুনি চলে যান।

মিটিং করা হলো না। ডেটল তুলোর পট্টি লাগিয়ে ট্যাক্সি করে ফিরে এল বিমল, সুমিত্রা, বিশু।

সুমিত্রার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার বিশু বলে উঠল, একি ! এটার এমন অবস্থা কে করলে ?

কেউ করে নি—আমিই পড়ে গিয়েছিলাম।

কি খারাপ হলো তাই না বিশু। সুমিত্রা বেচারী আজই প্রথম আমাদের সঙ্গে বাইরে এলো, আর এসেই ঘড়িটা গেল। সকালবেলা আমার উক্তিটা এত খারাপ ভাবে ফলে গিয়ে ওর ঘড়িটা কেড়ে নেবে, এতটা ভাবি নি।

আমার ঘড়ির কথা না ভেবে নিজে সব কাজ বন্ধ করে আপাততঃ বিশ্রাম। বিশুর তো যা শরীর তাতে ওকে মেরে ওরাই ব্যথা পেয়েছে বোধ হয়। বাব্বা, কি এ্যাটেম্পটাই করলে।

তবুও দেখ সুমিত্রা, কি ভদ্র ঐ ফেডারেশনের ছেলেটি। আসলে কি জানো— ওদের মধ্যেও অনেক ভাল ছেলে আছে। কিন্তু হাঙ্গরি বা এ্যাঙ্গরি ক্রাউড আর সাপোর্টার যে ভাবে ঢুকে পড়ছে ওদের দলে—ওরাও সামাল দিতে পারছে না। বিমল বলল।

বিশু বলল, আসলে ওদের সাপোর্টে মব ক্রমশ বাড়বে যদি এই আশু ঘোষ, পি-ডি-এফ মার্কা কম্বিনেশন চান। কংগ্রেসের হয়ে মার খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু পি-ডি-একের জন্য ঘণ্টা মার খাব কেন ? আমাদের কি জানিয়ে পি-ডি-এফ হয়েছিল ?

কোলকাতা আসতেই সুমিত্রা বলল, বিমলদা, তুমি তো বেশ অসুস্থ, আমাদের বাড়িতে থাকবে ?

না সুমিত্রা, তা হয় না। আমাকে এবং বিশুকে বরং কমলা বোর্ডিং-এ নামিয়ে দাও। রঘুদার ঘরে থাকব কিংবা সদনে চলে যাব।

সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে সেদিন মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় বিমলরা যখন কমলা বোর্ডিং-এর তলায় নামল তখন পি-ডি-এফ ভাঙার শেষ মুহূর্ত প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। কারণ আশু ঘোষ এই যজ্ঞ থেকে সরে আসবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ধর্মবীরের ধর্মচক্র ধর্মরাজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হতে বসল। পুলিশ মহলে

জয়ালটি চেঞ্জ ও ব্যবসায়ী মহলে আবার নতুন খাতায় চাঁদা দেবার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল।

অরূপের হাতেই সুন্দর কায়দা করে লেখা, "সমাজবাদ আসছে, আসবে", ফ্রন্টের ছেলেদের লেখা "গরীবের হাতিয়ার যুক্তফ্রন্ট সরকার", গ্রীষ্মের রোদ, বর্ষার জল, শীতের শিশির পেয়েও ফিকে হয়ে গেল না। রেল স্টেশনের দেওয়ালে দেওয়ালে, অফিস পাড়ায় ষাটের দশকের চিরস্থায়ী বার্তা হিসেবে ঘোষিত হতে লাগল। কিন্তু যারা চেয়ে চেয়ে এ জিনিস দেখল তারা রাজভবন, কংগ্রেস ভবন, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, বৌবাজার, ধর্মতলার পার্টি অফিসের ভেতরের শলা-পরামর্শ আর দিল্লীর নর্থ ব্লকের হোম-মিনিস্ট্রির কনফারেন্সের কোন খবর রাখল না। কিছুটা আবেগ, কিছুটা আশা, কিছু উত্তেজনা, কিছু বিদ্রোহ মিশিয়ে মিছিলে, মিটিং-এ, কলেজে, স্কুলে, হাটে, বাজারে, বসুমতীর সঙ্গে এক কাপ চায়ের তুফানে সারা বাঙলার সুজলা, সুফলা রূপ যতই দেখতে চাক না কেন রক্ত আর শ্মশান ছাড়া মুখরোচক কিছু আর রইল না।

বনগাঁর সেই ছেলেটি গুলিবিদ্ধ হবার পর বিয়াল্লিশ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যখন সব ছেড়ে চলে গেল, তখন তার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক পিতা আর ক্যান্সারে রুগ্না মার কাছে পরিবর্তন অথবা বিপ্লবের কোনটারই সঠিক ব্যাখ্যা করা গেল না।

পরদিন খবরের কাগজে খবরটা পড়ে সুমিত্রার মন ভীষণ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেও মৃত্যু এসেছে অনেক—ডাইনে বাঁয়ে মৃত্যু। পঙ্গু বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু জীবনযাত্রায় রাজভবনের মার্বেল পাথরের মেঝেতে শপথ নেবার কম্পিটিশানে—অস্থির উন্মুখ কয়েকজনের কেউ খোঁজ নিল না, কোথায় চলেছে দেশ। এর শেষ কোথায়?

বড় ব্যবসায়ীগুলো পাটি গোটাবার কথা ভাবল। কারখানাগুলোর চুল্লীর ধোঁয়া কোথাও বন্ধ হলো রাজনীতির জন্য—কোথাও মালিকের সুযোগ ব্যবহারের জন্য।

বেকার পরিক্রান্ত অস্থি কঙ্কালসার কোলকাতা নগরীর কান-ফাটানো চিৎকার আর মিছিলে মৃত্যু পদধ্বনি দ্রুত হলো। রক্ত চাই, বদলা চাই, মারকা বদলা মার চাই, ধোলাই হবে, পিটাই হবে, মুণ্ড চাই, আরও অনেক দাবীর উগ্রতায় যৌবনের অনেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছা কুঁড়িতেই ঝরে গেল। দাস-ক্যাপিটালের কথা গোসাবার কৃষকের কাছে কিংবা গান্ধীজীর চরিত্র মহাকরণের চরিত্রকে বদলাবার আগেই ছুরি, কাঁচি, বোমা, বন্দুকের মহড়ায় বাঙলার

চালচিত্রে আলপনা শুরু হয়ে গেল। পি-ডি-এফের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে (পি-ডি-এফ???) যথেচ্ছ তছরূপ হওয়াতে বোধ হয় আর তাকে টিকিয়ে রাখা গেল না।

গঙ্গাস্নান রক্তস্নানের মাঝামাঝি দুটো সরকারের বিদায় স্নান হয়ে গেল। কিন্তু বিদায় লগ্ন এত নিষ্ঠুর, এত করুণ যে বিজয়া দশমীর মত কোলাকুলি হলো না। মিষ্টি মুখ হলো না। কারণ গণতন্ত্রের বেদী এখন পাষাণ! নির্মম!

॥ আঠারো ॥

কংগ্রেস ভবনের পোষ্টমর্টেম ডিপার্টমেণ্টে অবশেষে হিন্দুস্থানীদের হোলি খেলার মত দীর্ঘস্থায়ী কাদা ছোঁড়াছুড়ির খেলা হলো বেশ ক'দিন ধরে পি-ডি-এফের পতনের ফলে। দু' একজন যারা মন্ত্রী হয়েই আচকান শেরোয়ানী বানিয়েছিলেন, সেগুলো ঈদের দিন পরবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বাক্সে তুলে রাখলেন। নন্দাজী থেকে পি. সি. সেন আর রাজ্য ও কেন্দ্রের অতুল্য ঘোষ বিরোধীরা আর একটা চান্স নিতে চাইলেন অতুল্য বাবুকে ফাইনাল চার্জশীট দিতে, কিন্তু এই সরকার গঠন ও ভাঙনের খেলায় কোনো রকম অংশীদার না হওয়ায় কংগ্রেসের গোয়েন্দারা এই পর্বে অতুল্যবাবুকে আবিষ্কার করতে পারলেন না।

আশু ঘোষের আনন্দ হলো শুধু এই ভেবে যে, মহাজনের কাছ থেকে মাল নিয়ে ঠিক সময় মত দাম না দিলে মহাজন যে হুলিয়া জারি করতে পারে তারই অদ্ভুত অনুভূতিতে।

হোম-মিনিস্ট্রির্ স্পেশাল সেল, আই-বি এবং এস-আই-বির কাগজে কি রিপোর্ট ছিল সবাই না জানলেও তিনটি জিনিস দিল্লী বুঝতে পেরেছিল। প্রথমত ফোঁড়া না পাকিয়ে অপারেশন করার সেপটিক হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ধর্মরাজ্য স্থাপনে ধর্মবীরের ধর্মচক্র মাঝপথে গতি হারিয়ে ফেলেছে এবং পরিশেষে কংগ্রেস একটা হাসি ও তামাশার উপকরণ হিসেবে ডেলি-প্যাসেঞ্জার থেকে হকারের মুখ পর্যন্ত উপাদেয় চাট্নি হিসেবে কাজ করছে। অতঃ কিম্? নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি শাসনের পর নির্বাচন। এবং সেই অনুযায়ী আবার প্রস্তুতি। কংগ্রেস পক্ষ মশলা সংগ্রহ করতে লাগল প্রথম যুক্তফ্রণ্টের শরিকী দ্বন্দ্বের নমুনা জোগাড় করে, সেই সঙ্গে কিছু জুলুম আর অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করতে। যুক্তফ্রণ্ট চাইল কেন্দ্রের চক্রান্ত প্রমাণ করার মশলা সংগ্রহ করতে। "অন্ধকারের দিনগুলি"র প্রদর্শনী অবশ্য বিমল, সুব্রত, অরূপ, অসিত, গৌতম, সুকুমারদের নেতৃত্বে কিছুটা

মূর্ছা যাওয়া খদ্দর সেবীদের চাঙ্গা করলেও রাঙা করতে পারল না। কয়েক রাউণ্ড "অন্ধকারের দিনগুলির" প্রসঙ্গে খারাপ মন্তব্য বের হলো। মারের ও প্রাণের ভয়ে একদা কংগ্রেসের যুব ছাত্রদের নয়নমণি এবং অতুল্যদার প্রীতিভাজন এই প্রদর্শনীকে নিয়ে এমন ধরনের কিছু মন্তব্য কম্যুনিস্ট পার্টির কাগজ কালান্তরে করলেন যাতে প্রমাণ করা যায় এটা আমেরিকার সমর্থনে হচ্ছে ইত্যাদি। সেই অধ্যাপক-কাম-ছাত্রনেতা-কাম-কাপুরুষকারের খদ্দরের নির্ভেজাল যৌবনের প্রতিমূর্তি সেই মহান ছাত্রনেতা দ্রুতনিরপেক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজের চাকরীর নিরাপত্তা আর কলেজে যাতায়াতের পথের ধারের লাল-ঝাণ্ডার উত্তাপকে মানিয়ে নেবার সাধনায় ব্রতী হলেন। বিমল, সুব্রত, সুমিত্রাদের অথৈ জলে আর কংগ্রেসের কণ্টকাকীর্ণ, ঋণগ্রস্ত, বীর্যহীন ইতিহাসের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সংসার ধর্মে মন দিলেন।

"অন্ধকারের দিনগুলিতে" ক্যানিং-এর ভেড়ার মালিককে আগুন দেবার একটা ছবি ছিল। সুমিত্রাই এটি বদলে দিয়ে বিমলকে বলল, ভায়োলেন্সের দিক থেকে এটা দেখালে হয়তো আমাদের একটা সেন্টিমেণ্টাল এ্যাডভান্টেজ আছে, কিন্তু বিমলদা। রিয়্যালিটির দিক থেকে ভেড়ীর মালিকরা যে শোষণ করে এসেছে এটা তো ঠিক।

সুমিত্রার কথা শুনে বিমল বলল, ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমরা শুধু অত্যাচারকে হাই লাইট করতে চাইছি, অতএব আমাদের অন্য কোনো বিষয়ে কিছু করার নেই।

না বিমলদা, তা হয় না। সুমিত্রাদি ঠিকই বলেছে। এ ছবি দেখিয়ে আমাদের লাভ নেই। বরং বক্তৃতায় উল্লেখ করা যায় মাত্র। সুব্রত বললে।

বিমল ওদের যুক্তি মেনে নিয়ে ছবিটা খুলে নিল। পরে ভবনে চব্বিশ পরগণার কয়েকজন মৎস্যাধিপতি নাকি এসে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, এসব করে যুক্তফ্রণ্টকেই সাপোর্ট করা হচ্ছে। বিমলদের এ ব্যাপারে তলব হয়েছিল ভবনে। পরিষ্কার করেই জানিয়েছিল ওরা এসব ব্যাপারে প্রচার করতে গেলে ওদেরকেই ভেড়ীর মালিকের দালাল সাজতে হবে, সেটা সম্ভব নয়। এর পর এ নিয়ে কোনো কথা হয় নি। চব্বিশ পরগণার দীপকের কথায় পরে হাড়োয়া, বাসন্তী, ক্যানিং, বসিরহাট অঞ্চলে দেখা গেছে যে কি মর্মান্তিকভাবে কৃষকের সর্বনাশ করে ভেড়ীর সীমানা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেড়ীর কংগ্রেসের ভেরী-বাদকদের একদল সেদিন রাত থেকেই জাতীয় দল, বাঙলা কংগ্রেসে কিংবা অন্য কোনো বাহিনীতে যাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করেছিল।

ভেরী-বাদকদের একজনের সঙ্গে রীতিমত বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেল বিমলের। ভেরী-বাদকদের একজন বলেছিল, এত চাঁদা দিলুম, এত মাছ দিলুম আর আজ আমাদের এই অবস্থা, এই অপমান।

সেই মাছ খেয়ে কংগ্রেসের কলেরা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না? এর পরেও খাওয়াতে চান নাকি? রেগে গিয়ে বিমল বলেছিল।

অবশ্যই এসব ঝঞ্ঝাট কয়েকদিনের মধ্যেই মিটে গেল। ফিকে হয়ে গেল অতীত স্মৃতি। আবার ভোটের বাজনা বাজতে শুরু করল। সারা বাঙলার যতগুলো জায়গায় যাওয়া যায় ঘুরে এসেছে বিমল-সুব্রত।

সুমিত্রার দাদা সুমিত্রাকে সাবধান করে দিয়েছে চুপচাপ থাকতে বলে। নকশালদের ঘাঁটি আর সংগঠন ক্রমশই বিস্তৃত হতে শুরু করল। দেওয়ালগুলোতে টিনের টেন্‌সিল করা মাও-সে-তুং-এর ছবি এ পাড়ায় ও পাড়ায় পড়তে শুরু করল। দু একটা খুনও হয়ে গেল জগদ্দল, চন্দননগরে। ইণ্ডিয়ান চেম্বারের বণিকরা হিংসার বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইলেও ইন্‌ভেস্ট করার ক্ষেত্রে এককভাবে কংগ্রেসকে খুব প্রফিটেবল বলে মনে করল না। স্বভাবতই যুক্তফ্রণ্টের কলঙ্কবিহীন নিখাদ সোনার গহনার দোকান বন্ধ হয়ে গিয়ে চোদ্দ ক্যারেটের সোনার মত হয়ে গেল সব।

সুমিত্রা ওর দাদাকে বললে, বিমলরা তো কিছুটা দিল্লীর ফেভারে কাজ করছে। তাহলে ভয় কিসের?

কিছু বলা যায় না। আমরা পুলিশরা যেখানে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি সেখানে নকশালরা কাকে কি করবে বলা যায়? সি-পি-এম কংগ্রেস কোনো বাছবিচার ওরা বোধ হয় রাখবে না। সে জন্যই বলছিলাম এসব উট্‌কো ঝামেলায় যাওয়ার দরকার কি? ওর দাদা বুঝিয়ে বলল সুমিত্রাকে।

সে তো প্রাণের ভয়ের কথা বলছ। তা করেই বা নিরাপত্তা কোথায়। যারা মারবে তাদেরও নেই—আর যাদেরকে মারবে তাদেরকেও বাঁচাবার দায়িত্ব নেবে না তোমরা—সুতরাং যার যার কায়দায় তাকে বাঁচতে হবে।

সুমিত্রার এই কথায় সুব্রত বলেছিল, ঠিকই বলেছ তবে একটু মাও-সে-তুঙ-এর কায়দায় বলেছ। সেই 'আমি আমার কায়দায় লড়ি, তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়ো'-র মত ঠিক একইভাবে যার যার কায়দায় সেই বাঁচার কথাটাও যেন তারই প্রতিধ্বনি।

ইতিমধ্যে দু'একটা বাংলা বন্ধ করে জনমতের ভিতকে ধর্মবীর ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে করতে সক্ষম হয়েছে যুক্তফ্রণ্ট। অজয়বাবু একটু পরিবর্তন করে

"জ্যোতি বিনা নেতা নাই" এই গীতের দোহার হয়েছিলেন।

জ্যোতিবাবুরা ঠিকই বুঝেছিল যে বাঙলা কংগ্রেসরা চূড়ান্ত অবস্থায় একটা বোবা সম্পদ নয়। কিন্তু তাদের সামনে এখন বিপ্লবের চিন্তা সুদূর পরাহত। শুধু সেন্টিমেন্টের আগুনে জয় মা ভোট লক্ষ্মীর কপালে ফোঁটা লাগিয়ে ব্যালটের মালমশলা বোঝাই করার ব্রত তখন। এখন বাঙলা কংগ্রেসের দলকে জোতদার বলে বামপন্থী কম্রেডটা নিন্দে করলে নেতারা বলবেন, "ওয়ান স্টেপ ব্যাক এণ্ড টু স্টেপ ফরওয়ার্ড।" কিন্তু আলকাতরা আর ব্ল্যাক জাপান প্রিয় দেওয়ালের নামাবলী লেখায় অভ্যস্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মীরা জানতেও পারল না যে গাড়ি ব্যাক গীয়ারে চলছে এবং সামনের গীয়ারে আর চলবে না। বামপন্থীর ফ্রন্ট গীয়ারের সিলিণ্ডারটা ভোট আর রাইটার্সের ঠাণ্ডাঘরের মোহ-মুদ্গর দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাই ফরওয়ার্ড নেই। যেভাবেই হোক জিততে হবে এই শুধু প্ল্যান। বিমল ও সুমিত্রার প্রচেষ্টা রইল যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনা। আর যুক্তফ্রন্টের প্রচেষ্টা রইল পুরনো অস্তিত্বে ফিরে আসা। মাঝখানে নকশালবাড়ীর বিপ্লব, অসীম, দীপঙ্কর, প্রদীপ, রণবীরের দল সকল বাধা তুচ্ছ করে একটা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনায় মেতে উঠল শ্রেণী সংগ্রামের নেশায়। কিন্তু রেডিও পিকিং-এর নির্দেশের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান রিয়ালিটিকে বুঝতে না পারায় আচমকা দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

ওদিকে লড়াই কে খাঁটি বামপন্থী। আর এদিকে লড়াই কে খাঁটি কংগ্রেস। এখানে লড়াই ভেরী-বাদকদের সঙ্গে—ওখানে লড়াই লালের সঙ্গে লালের। এখানে লড়াইয়ের প্রথম জাতক বিমল, সুব্রত, সুমিত্রার দল, ওখানে শৈবাল, অসীম, বিপ্লবের দল। সব যেন কেমন ক্রমেই গোলমাল হয়ে গে।

গোলমালের মধ্যেই চিতা আর কবরগুলোতে নামহীন, গোত্রহীন আততায়ীর লাশ পৌছতে লাগল।

লাশ যার ভোট তার। রক্ত যার জিত তার। শহীদ যার নেতা তার। এমনি একটা অদ্ভুত পৈশাচিক সেন্টিমেন্টের হাওয়া এ-পার্টি ও-পার্টির অফিসে বইতে শুরু করল।

মেদিনীপুরের সুকুমার কর, কোলাঘাটের বিপ্লব, কাঁথির শৈলজারা এ জিনিস দেখেছে ঘাটালে গড়বেতায় প্রতিদিন। সেদিন শনিবার, অফিস ছুটি হয়েছে তিনটের মধ্যেই। হাওড়ার রেল কাউণ্টারে বিনে টিকিটের যাত্রীর সঙ্গে বচসা হতেই মারপিট, পুলিশ আরও কত কি। তারপরই আহত দেহটার

এ্যাম্বুলেন্সের পাশে ডজন দেড়েক নেতা। খদ্দর দেখলেই আঘাত করছে। যুক্তিটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় চক্রান্তে নাকি রেল পুলিশ ফ্রণ্ট সমর্থকদের মারছে। একবার যখন বলা হয়ে গেছে তখন অন্য সব যুক্তি অগ্রাহ্য। কারণ জনতার রায়ে গণরাজ দলরাজে পরিণত হলো।

হাওড়ার স্টেশন মাস্টার পরে বুঝেছিলেন যে এ এমন দুনিয়ায় আসা হলো যে পার্টির নামে কাউণ্টার না খুলে বোধ হয় আর রেল চালানো যাবে না।

ঘটনা দিল্লীতে গেলেও তাঁরা তখন বিষ্ণুর যোগ নিদ্রায় মগ্ন। সে জন্যেই বাঙলার গ্রামে শহরে শেলটার বা আশ্রয়ের জন্য দুর্বল ও সবল একাধিক রাজনৈতিক কর্মীকে ঘর ছাড়তে হলো। ঘরে যেতে মানা নেই কিন্তু গ্রামে যেতে মানা আছে। এই হৃদয়বিদারক অবস্থার সাক্ষী রইল অনেকে। অথচ এ সবের কোনো দরকার ছিল না। কংগ্রেসের কিছু তালেবর শুধু কয়েকটা ভায়োলেন্সের নমুনা তুলে ধরে ভাবল এবারের ভোটে জয় জয়কার হবেই। কিন্তু ভোটের শেষে ফলাফল গোটা দেশের রাজশক্তিকে ভাবিয়ে ও কাঁপিয়ে তুলল। হোম-মিনিস্ট্রি আর একটা নতুন ফাইল খুলল নর্থ বেঙ্গল। নাম বেঙ্গল আণ্ডার ইউ-এফ।

সি-আর-পির কমাণ্ড্যাণ্ট মিঃ ভাটিয়াকে বাংলা পুলিশের রায় চৌধুরী সাহেব তিন চার দিন ধরে ভবানীভবনে কোচিং দিলেন বাঙলার মানচিত্র বোঝাতে। কলোনী আর কোলকাতা হাওড়ার শহরতলীর হিন্দুস্থানী সি-আর-পির ভাষায় 'খতরনাক রুস্তমবাজ'দের শায়েস্তা করতে ক'হাজার বেতের বা লোহার ঢালের টেণ্ডার দেওয়া উচিত তা নিয়ে স্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট তাদের এফিসিয়েন্সি দেখাতে চাইল।

কমাণ্ড্যাণ্ট মিঃ ভাটিয়া আর রাইটার্সের খুব নামকরা কোলকাতা ক্লাবের পরিচিত মধুবন বিহারিনী আমলার দোস্তী এত জমল যে 'প্রেসিডেণ্টস্ রুল লং লিভ' বলে হুইস্কি শেষ করার পর রেগুলার কোর্স চালু হয়ে গেল।

তখনও বড়শূলে, বামন্দী, লাভপুর, ইসলামপুর, চৈতন্যপুর, ঝাড়গ্রাম, পঃ দিনাজপুর-এর গ্রামে গঞ্জে আধা কালো আর পুরো কালো রাজবংশী এবং আদিবাসী চাষী ও ক্ষেতমজুরদের আশা তীব্র। তখন মাদলের উপরে টকটকে লাল পতাকা জড়ানো আর তীর ধনুক বল্লমের মিছিলে লাল বিপ্লবী নিশান। দুর্গাপুর,*কালনা, বোলপুর, বসিরহাট, বেহালার সব মাঠে ময়দানে মিছিল সোচ্চার। এক একদিন এমন গেছে যে অতি বিশ্বাস এবং উৎসাহের অনির্বচনীয় আনন্দে গৃহহারার গৃহ পাবার লটারী জাতীয় ভাগ্যের মোহ

কখনও কখনও তাদের শ্লোগান চিন্তার বিরুদ্ধে সামান্য মন্তব্যকে ট্রেনের কামরায় অথবা গাঁয়ের হাটে বরদাস্ত করতে চাইল না।

যুক্তফ্রন্টের মতে এসব ঘটনাগুলো বুর্জোয়া কাগজের প্রচার এবং আমেরিকার চক্রান্ত। যদিও ফ্রন্টের শরীক হিসেবে আমেরিকান সোসালিস্ট, পি-এস-পি-রাও একই সুরে সুর মেলাত সর্বত্র, তবুও চক্রান্ত শব্দের ব্যবহার ইতিপূর্বে বাঙলা ভাষায় আর কোন সময়ে বা কোনো সাহিত্যে বা যাত্রা থিয়েটারের পালায় এতবার ব্যবহৃত হয়েছে বলে কেউ শোনে নি। আসলে গোটা ব্যাপারটাই একটা চক্রান্তের মত লাগছিল। কংগ্রেসের মতে এসব হলো ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্র বিরোধী কাজ। দিল্লীর চোখে এগুলো হলো ডিস্‌লয়ালটি টু কনস্টিটিউশান। কিন্তু বিমল-সুব্রতর কাছে এগুলো হলো অনেক প্রবঞ্চনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বা প্রায়শ্চিত্তের পালা। হিংসাকে সমর্থন না করেও জাগ্রত আদিবাসী যৌবনের তীরের ফলার লাল ঝাণ্ডার প্রতি জমি পাবার বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারে নি কেউ।

বিনোবার ভূদান আর বিমল সিংহের অত ভাল মাইনের পরও যখন জোতদারা কায়দায় গ্রাম বাঙলায় কংগ্রেসের জোড়া বলদ হেলে দুলে চলত, তখন জমি থেকে উচ্ছেদ বর্গাদার আর ক্ষেতমজুরের ভেঙে যাওয়া আশাহত বুকে একটু করে আশার আলো জাগাতে সামান্য কয়েকজন যুক্তফ্রন্টের কর্মী প্রথম দিন গান বেঁধেছিল তা অসত্য বা চক্রান্ত নয়। তা সত্যই ঘুম ভাঙার গান। কিন্তু সামাল দিতে পারে নি। মহুয়ার নেশায় মাদলের জোর তালে পূর্ণিমার চাঁদের আলো যখন তাল তমালের ফাঁক দিয়ে আলো আঁধারি আবছা পরিবেশ সৃষ্টি করছিল গ্রামে গ্রামে, তখন ধর্মগোলার নামে ধান্ধাগোলার পার্টি করা বান্দারা তাদের আখের গুছাবার ধান্দায় গলায় রুমাল জড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের নব আশার নবজাতককে শ্বাসরুদ্ধ করে আঁতুরঘরে মেরে অন্যের চুরি করা মৃত বিকলাঙ্গ শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দেখাতে চাইল যে শিশু জীবিত আছে।

মালদা কলেজের কাজ সেরে কণ্ট্রাকটর ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি থেকে অসিত, গৌতম, সুভাষ, প্রণবদের বিদায় দিয়ে সুমিত্রা আর বিমল যেদিন ফিরছিল সেদিন ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে জায়গা নেই। হরেকৃষ্ণবাবুর মিটিং শেষ করে লোকেরা ফিরছে দলে দলে কাতারে কাতারে। কেউ চাষাগ্রাম, কেউ ফারাক্কা, কেউ বেনিয়াগ্রাম বা অন্য কোথাও। কারও টিকেট নেই কিন্তু টিকেট কালেক্টারকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা আছে। কোনোমতে আত্মপরিচয় গোপন করে কয়েকজন চাষীর মুখে খদ্দরী জোতদারের বজ্জাতির কাহিনী শুনল বিমল আর সুমিত্রা।

পরস্পর পরস্পরকে ইশারা করে শুনছিল ওদের কথা। তারপর হঠাৎ ট্রেনের মধ্যেই কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি কাগজের লোক না মিটিং-এর লোক। তবু যা হোক বলে নি যে কংগ্রেসের লোক কিনা।
বিমল বলল, আমরা বেড়াতে এসেছিলাম, কোলকাতা যাচ্ছি। কিন্তু সুমিত্রা গোপন করবে কেমন করে। তখন ওর হাতে "যুগের ডাক" আর "ছাত্র জগৎ" রয়েছে। সামলাতে পারল না ওরা।
মৃদু জুতো আর হালকা নির্যাতন করে চেন টেনে ওদের নামিয়ে দিল ট্রেন থেকে। কোনমতে নেমে প্রায় চার মাইল রাস্তা হেঁটে মালদায় ফিরে এসেছিল সুমিত্রা বিমল। রাতে নর্থ বেঙ্গলের বাসে করে পি-ডি-এফদের পতন ও উত্থানের বোনাস সর্বাঙ্গে বহন করে ফিরে এল ওরা কোলকাতায়।
সুমিত্রার সান্ত্বনা, তবু যা হোক প্রাণে মারে নি বিমলদা।

পি-ডি-এফ-এর পতনের শেষ দিনের সকালবেলাতেও নলিনাক্ষবাবু পতন মানতে রাজী নন। নিজের দফতর ছেড়ে রাইটার্স থেকে আসতেই তাকে অনেক অসোয়াস্তি পোহাতে হয়েছিল। সবারই মুখে এক কথা—"আশু ঘোষের পাপে আমাদের এমন হলো।" বিমল কিন্তু বললে, না, আশু ঘোষকে দোষ দিতে চাই না। তার কি দোষ? শুধু তাকে বদনাম দিয়ে লাভ নেই। সে যেমন জিতেছে তেমন আর পাঁচজন। আর তাছাড়া তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিয়ে তাকে মন্ত্রীসভায় না নেওয়াটা কোন যুক্তির নয়।
কংগ্রেস ভবনের একজন বললে, কেমন করে নেবে? তার নামে সব অতীতের কতগুলো রিলিফ কমিটির অভিযোগ আছে না।
বিমল বেশ রেগে বললে, তাহলে সে ধরনের অভিযোগ আমাদের কোন নেতার নেই বল? রাতের অন্ধকারে এম-এল-এ পাচার করার ঝুঁকি নেবে আশু ঘোষ আর মন্ত্রী হবার সময় তার নাম থাকবে না এটা কেউ মানে না। তবু বরং অতুল্যদাকে বুঝি, সে আগাগোড়াই ব্যাপারটায় সায় দেয় নি। কিন্তু যারা সায় দিয়েছিল তাদের সবারই উক্তি ছিল আশুবাবুকে মানিয়ে নিলে এখন যে অত্যাচার হামলা শুরু হবে তা সইবে কে? প্রফুল্ল ঘোষ কি দেখতে আসবে সবাইকে। পাবলিক ক্ষেপে আগুন। ধরমবীরার তো সিকিউরিটি গার্ড আছে। আমাদের কি হবে? যত সব লোভীর দল মিলে জিনিসটা শেষ করে দিল।
অভয় আশ্রমের প্রফুল্ল ঘোষ কিন্তু আর কোন অভয় বাণী নিয়ে তারপর এই অগ্নিরোষের সামনে এসে দাঁড়াননি। সম্ভবতঃ সারাজীবনের গৌরবজনক রেকর্ডটা

পি-ডি-এফ সরকার করতে গিয়ে ম্লান হয়ে গেল। শিশিরকুঞ্জেও কুঞ্জ ভঙ্গের পর গান শুধু হয়েছে। কেন না ততক্ষণে রাইটার্সের নামকীর্তন শেষ।

আশু ঘোষের দোষ কি গুণ তার বিচার করবে ইতিহাস কিন্তু এক অর্থে তিনি ঠিকই করেছিলেন এই লোভী মনোভাবকে জব্দ করে। যদিও খগেনদার মত ভিন্ন। খগেন দাসগুপ্তর মতে যদি সরকারকে কোনমতে আশু ঘোষকে মানিয়ে নিয়ে রেখে দেওয়া যেত তাহলে স্থিরতা আসতই। এবং কিছু ভাল কাজ করে পাবলিকের মন জয় করা যেত। খগেন দাসগুপ্ত কিন্তু সেদিন হাইকম্যাণ্ড আর মাইকম্যাণ্ডের অনেক নেতাকেই বলেছিলেন একটা ভুল যখন হয়েছে তখন এটাকে সংশোধনের জন্য অন্য প্রোগ্রাম ভাবুন। যদি এখন মাঝপথে এটা ভেঙ্গে যায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব কিন্তু ধূলায় লোটাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? নির্ভেজাল নিরহংকারী এই ভালমানুষটি যেহেতু কথায় কথায় টাকা তুলে দিতে পারতেন না কণ্ট্রাকটরদের কাছ থেকে তাই হাইকম্যাণ্ড আর মাইকম্যাণ্ড অনেকেই এর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই খগেন বাবুই কিন্তু লালবাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ পঁয়ষট্টির শীতের প্রত্যুষে রাজভবনে আ-তেঙ্ক প্রফুল্লদার ঘরে সেই ভোরে গিয়ে বলেছিলেন, আর যাই করুন ইন্দিরাকে চট করে প্রধানমন্ত্রী করে বসবেন না যেন।

খগেনদার জলপাইগুড়ির বেসটাকে মাইকম্যাণ্ডের লোকেরা ধ্বংস করার জন্য একে ওকে অবলম্বন করে এগোবার চেষ্টা করতেন। একবার ছাত্রদের মিটিং-এ জলপাইগুড়িতে মুকুলের সঙ্গে গিয়ে বিমল সে দৃশ্য দেখে এসেছে। সেই রবিদা আর খগেনদার লড়াই। কিন্তু খগেনদা কোন দিনও বিমলকে গ্রুপ করার ইন্ধন জোগায় নি।

কংগ্রেসের ইতিহাসটা এক মারাত্মক জায়গায় এসে দাঁড়াল। গড়িয়ায় রাষ্ট্রপতি শাসনের বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে এমন আবস্থার সৃষ্টি হলো যে বিমলের প্রায় সব সাথীকেই গৃহহারা হ'তে হলো। যাদবপুর ব্লকের গোপাল, মনোরঞ্জনদা অনেক কষ্টে রাতের অন্ধকারে এসে প্রতাপাদিত্য রোডের খোকাদাকে যখন খবর দিল তখন সেখানে বিমলরা বসে—কেননা কসবার হরিরারা সব চলে এসেছে সেখানে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে। বিমল বললে, আমরা আগামী কাল বিকেলে যাব—সভা ডাকুন, যা হয় দেখা যাবে। বিমলের অদৃশ্য সাহসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সুব্রত। সুব্রতই সকাল থেকে তাগাদা দিয়ে একে ওকে জোগাড় করে যখন সুমিত্রার কাছে গেল, সুমিত্রা ওদের নিষেধ করলে। বললে, কারো যাওয়া হবে না—অবস্থাটা নিয়ে ছেলেমানুষী চলবে না। কোন

আইন নেই সেখানে—সি-আর-পি নেমে গেছে। প্রথমটায় সুব্রত গররাজী হলেও শেষে আবার মনোরঞ্জনদাই ফোন করল বিমলদাকে ভবনে না আসবার জন্য। অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে। অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে তখন পি-ডি-এফ মন্ত্রীসভার উদ্যোক্তারাও পুলিশের পাহারায় হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীর আয়ত্তের বাইরে। কেউ পুরিতে—কেউ সিমুলতলায় চেপ্পে রওনা হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে।

সুব্রত এই প্রথম একটু হেসে বিমলকে বললে, সুমিত্রার তোমার প্রতি এত আগ্রহটা কিন্তু কেমন কেমন লাগছে।

বিমল বললে—অমন ভাবার কোন কারণ নেই। ও সেরকম মেয়েই নয়। তাছাড়া আমাকেই তোরা কি ভাবিস।

—না মানে বললুম আর কি। আমি আবার চেপে রাখতে পারি না।

যা বলেছিস বলেছিস, এসব কথা যেন বেশী বলাবলি না হয়।

গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থায় কিন্তু শুধুমাত্র ফ্রন্ট সরকারের সমর্থকরাই নাজেহাল হলেন না—নিরীহ নিরপেক্ষ নাগরিকও রেহাই পেল না।

পুলিশ যেন নাছোড়বান্দা, আসলে কার স্বার্থে তারা এ কাজ করছে এ বোধ তাদেরও নেই। যদি দিল্লীর পরামর্শে কংগ্রেস বা পি-ডি-এফ নামক সর্বনাশা কোন কিছুর স্বার্থে এটা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে পাবলিক যে বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে এ ধারণা তাদের কেন হলো না সে কথা বুঝিয়ে বলবে কে? সবটাই বেপরোয়া।

সামান্য এই ধরনের মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রেস সিনেমার সামনে বিমলকেও গুঁতো খেতে হয়েছে সি-আর-পি'র সাব-ইন্সপেক্টারের। যে দিন কলেজ স্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড, আর্মহার্ষ্ট স্ট্রীট তোলপাড় হয়ে গেল তাদের সেই বীরত্বে।

রাত দশটার পরও কালীপুজোর বাজী পোড়াবার মত পি-ডি-এফ বা কংগ্রেস বিরোধীদের বোম ফাটিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার শব্দ টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বরানগর, দমদম, বেলগাছিয়া, বালী, নৈহাটি, পানিহাটিতে শোনা গেছে।

এখন যাদের রক্ত যাবে তাদের জন্য আলাদা করে শোক মিছিল বা নার্সিংহোমে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে না। কেননা এখন লাসের পর লাস জমবে—আঘাতের পর আঘাতে সবাইকে আক্রান্ত অথবা আহতের তালিকায় রাখতে গিয়ে নূতন কোন রাজনৈতিক বিশেষণ জোড়বার সময় নেই—পরে অনেক কাল পরে জল স্থির হ'লে তখন একটা পুস্তিকায় এদের জন্য হা-হুতাশ

করে একটা পরিচিত সুকান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের কাজ করা যাবে।

তেজেস সেন থেকে আরও অনেকে এতদ সত্ত্বেও ল্যান্সডাউনের বাড়ির বৈঠকখানায় তাসের আসর বসিয়েছে। ভাবটা এমন, আমাদের খেল আমরা দেখিয়েছি, দিল্লী এবার তোমার খেলা তুমি দেখাও। মোসাহেবী চালে এরই মধ্যে কেউ কেউ বলছিল, রমাদি এল না যে আজ? তাসের কার্ড ঠিক করতে করতেই উত্তর কোলকাতার আশীষ বললে, বেলঘরিয়ায় নিমতায় দক্ষযজ্ঞ চলছে, তার রমাদি আসবে কোত্থেকে।

তেজেশদা বললেন—ওসব আন্দোলন ফান্দোলন সব পুলিশের প্যাদানিতে টাইট বুঝলে। দিন তিনেক যাক দেখবে সবাই ঈশ্বর ভক্তর মত গুটি গুটি সব কিছু মেনে নিয়েছে। ধরমবীর একেবারে বাঘের বাচ্চা।

রাজভবনের এই বাঘের বাচ্চার কিন্তু খুব সোয়াস্তি নেই—কারণ দিল্লী এটাকে ভাল চোখে দেখছে না সেটা আঁচ করার শক্তি ধর্মবীরের আছে। তাছাড়া কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও তার পক্ষে স্ট্রং কোন সাপোর্ট নেই দিল্লীতে এখন। পি-ডি-এফ গড়ার যারা বিরোধী ছিলেন তারা মাইকম্যাণ্ডের ক্যালকুলেসন আর সুপরামর্শের তারিফ করে তাদের নিন্দে করছিলেন যারা এটা গড়ায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই দো-টানায় পড়ে বন্দেমাতারম্ বলা যারা জনরোষে গৃহছাড়া তাদের দেখার জন্ম মহাজাতি সদনের কয়েকজন সহ বিমল সুব্রত আর কংগ্রেস ভবনের অসীম, তৃপ্তি, বুলবুল, অমল শীল। ব্যস বাকী সবাই তাসের আসরে।

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন বা বকলমে দিল্লীর নিজস্ব জায়গীরদারী এই প্রথম। তাই সবটাই যেন কেমন নূতন লাগছে। তবে অন্য রাজ্যে কেমন হয়েছে জানিনা, এই রাজ্যে প্রথমটাই বিস্বাদের ও বিরক্তির। বারুদ, বন্দুক, অন্ধকার আর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে যেন রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেনস্ থেকে বেরিয়ে আসা সৈন্যদল ফরমান নিয়ে এসে বাংলার এখানে ওখানে বলছে হুঁসিয়ার—সব হুঁসিয়ার। বা—আদপ—বা—। দিল্লীর দস্তানা নিয়ে ধরমবীর এসে গেছে—হুঁসিয়ার।

হুঁসিয়ারী না মানার ঔদ্ধত্য দেখতে সহস্র যুবকের মন গঙ্গা, কংসাবতী, আত্রেয়ী, তিস্তায় তৈরী।

আজ বিশে ফেব্রুয়ারী উনিশ' শ আটষট্টি সাল বাংলায় রাষ্ট্রপতির ফরমান জারী করে রাজভবনের দরবারে ধ পুত্র ধর্মবীর বসে।

সেই কবে সব বড়লাট ছোটলাট দিল্লী দরবার জাতীয় কথাবার্তা শেষ হয়ে

গিয়েছিল। আবার সংবিধানের ধারাগুলো নামতার মত পড়ে আকাশবাণী থেকে ফরমান পড়ে শোনান হল। অফিসারেরা বেশ খুশী—জায়গীরদারী মনোভাব পুলিশ সাহেবদের। তারা এবার একচোট দেখে নেবে। বিরোধীরা একে 'ব' কলমে কংগ্রেসী শাসন বললেন—যা অংশত সত্য। বিবেকবান কিছু অফিসার ছাড়া আর সবাই দিল্লীকে বাদশাহের দরবারের চোখেই দেখত রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে খবর চলে গেল। তারা তাদের রাজ্যে এক একটি মনসবদারীর মত জায়গা পেলেন। এম-এল-এ মন্ত্রীর বালাই নেই—আপনা হাত জগন্নাথ। নির্বাচনের দাবী উঠুক বা না উঠুক এই স্বল্প সময়ের জন্য প্রশাসনের রাশভারী লোকদের একাংশ আবার দিল্লীতে ট্রান্সফার ডেপুটেশন নেওয়ার চেষ্টা করলেন। এরা হলেন খলিফা লোক। এরা না চাইলেন বিদায়ী সরকারকে চটাতে, না চাইলেন কংগ্রেসের সঙ্গে মাখামাখি করতে অথচ এ রাজ্যে থাকতে গেলে বারুদের ধোঁয়া আর পাইপগানের শব্দে কোন কোনদিন কাউকে নিন্দে করতেই হবে। তার থেকে গঙ্গা পেরিয়ে যমুনার তীরে কিছুদিন কাটালে কেমন হয়। তারপর যখন আবার সব শান্ত হয়ে আসবে তখন সোনার বাংলার জন্য কেঁদে "আমরা বাঙ্গালী বাস করি এই তীর্থে বরদ বঙ্গে" বলে রবীন্দ্রনাথের ছবিটাকে পালিশ দিয়ে নিয়ে চলে আসলেই হবে। ব্যবসায়ীদের অনেকে রাতারাতি রেজিষ্টার্ড অফিস হেড অফিসগুলোকেও সরাতে চাইলেন। অনেকেই সফল হলেন যাদের দিল্লীর কোম্পানী বোর্ডে ছিল মুরুব্বির জোর। বাংলার ধন একুশ বছর লুটে তার একাংশ আলিবাবার গুহায় রাখবার জন্য অনেকেই বাড়িতে দরওয়ান বসিয়ে রেখে আইন শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে বোম্বে-আমেদাবাদ-মাদ্রাজ-ফরিদাবাদ-ব্যাঙ্গালোর-গাজিয়াবাদের দিকে রওনা হলেন। এরাই একদিন মন্বন্তরের বাজারে কোম্পানীর আমলে, যুদ্ধের বাজারে সুদূর আরাবলী, শুকনো উত্তরপ্রদেশ থেকে এই বাংলায় এসেছিল ব্যবসা করতে।

রাষ্ট্রপতি শাসন জারী হতেই লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে অন্যত্র সরাবার চেষ্টা করে বাংলার ভাগ্যাকাশে আর এক মেঘ জমিয়ে দিলেন। সবটাই হয়ে গেল সবার চোখের সামনে কিন্তু রাতে তখন আমরা রাতকানা, দিনে আমরা মিছিলে মাতাল—বলবার সময় পাই না।

রাজ্য পাটের ক্ষণিক আশা গেলেও নূতন করে পাবার সম্ভাবনায় আবার সবাই অস্থির। সুবোধ বাঁড়ুজ্যের ঘেরাও-এ ক্লান্ত অস্থির মালিক পক্ষ এবার আর

ওদের বরদাস্ত করতে চায় না। লোকসান যাওয়া কারখানায় তালা পড়তে শুরু করেছে—ভারতের শেফিল্ড হাওড়ায় দাসনগরে একই হাওয়া। চট কলগুলোতে অশান্তি যা হয়ে গেছে তার জের টেনে মুনাফার নীট অঙ্ক চাপিয়ে শ্রমিক সর্বনাশের জাবদা খাতা ভাল করে দেখেছে বাজোরিয়ার দল। এক আন্দোলনের স্রোত স্তিমিত প্রায়—নূতন নির্বাচনের আগে জনমতকে ধরে রাখতে সভা সমিতি মিছিল আর এখানে ওখানে সামান্য কয়েকটা পোষ্টার প্রদর্শনী, বিজয় ব্যানাজীর রুলিং নিয়ে একটা বিতর্ক শেষ পর্যন্ত কোলকাতা শহর থেকে সুন্দরবনের লঞ্চ পর্যন্ত গিয়ে পৌছাল। বিজয়বাবু চাবি নিয়ে সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে লাগলেন চাবি তার হাতে—তিনি না খুললে আর খোলা হচ্ছে না। সংবিধানের মর্যাদা আর ক্ষমতাকে রাজনৈতিক দলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এর আগে আর এমন করে কেউ ভোলা ময়রার মত বলেছে বলে জানা যায় নি। বাগবাজারের কবির লড়াই-এর আসরের শেষ দিনের যারা বেঁচে থাকা দর্শক এই দশকের সন্ধ্যায় যাব যাব করছে তারাও বলতে পারেন নি। উৎপলবাবু নাকি বিজয়বাবুর কোমর বেঁকিয়ে "অথ চাবি কাহিনী"র রসিকতার মাদকতায় মাতিয়ে দিল ঢাকুরিয়া ব্রীজ থেকে টালা পার্ক। রমাদির ইমপরট্যান্স বেড়েছে। তারিণীবাবুদের কাছ থেকে যে সংবাদ রমাদি জানতে পেরেছে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বিমল বললে, না উনি কুলটী চলে গেছেন মিটিং করতে। অশোকের পরিচয় করিয়ে দিল বিমল। খুব ভাল ছেলে। কলেজটাকে ওই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদের গাড়িতে ছেড়ে দিতেই অশোক বললে—এ নেতাকে চিনলাম না বিমলদা। চিনে কাজ নেই—যখন মন্ত্রী হবে তখন চিনিয়ে দেব। বিমল বললে। মনে মনে রমাদিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলে। সত্যিই তো রমাদির কত গুণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন করে ঘোরে কেন? বিয়ে করলেত পারে। রমাদি কোন পেশার জন্য এমনটা হয়ে গেছে এসব কথা ভাবতেও কোথায় যেন বুকের মধ্যে বিঁধে যায় বিমলের। রমাদির মধ্যে কোথাও এক মুহূর্তের জন্য ভয়ের ছায়া দেখেনি কেউ। অথচ ভবনে বসে আর পাঁচ জন কত কথাই না বলে।

সেদিন বেশ মজার কথা হচ্ছিল অশোক আর বিমলে। কথাটা অশোকই তুললে। "আচ্ছা বিমলদা, ভেড়ীর মালিক থেকে বড় জমির মালিক এরা সবাইতো আমাদের সমর্থক বলে দাবীদার অথচ এখনো গাঁয়ের গরীব মানুষ-গুলো আমাদের ভোট দেয় কেন?"

এতদিন দিয়েছে কেন জানিনা—তবে আর বোধ হয় দেবে না। ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে, সেটা বোধ হয় এবার ছাড়িয়ে যাচ্ছে অশোক। গাঁয়ের কলেজ-গুলোতে এখনো যে প্রতিপত্তি সে ওই আমাদের মুখে শোনা প্রতিবাদের কথা আর পুরোনো স্বদেশীয়ানার টান। তাছাড়া কোন্ ভক্তিতে আর টানে এঁরা থাকবেন ?

হরিপদ বললে, গ্রামে গ্রামে অত্যাচার কিন্তু যুক্তফ্রন্টই চালিয়েছে।

বিমল বললে, যে অত্যাচারটা এবার হল এটাতো অনেক দিনের চাপা আগুনের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস জমিতে লোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ি বানানো আর দু' সন্ধ্যে খেতে দিয়ে পাঁচসিকে হাতে গুজে দিনমজুরীর বিনিময়ে মণ মণ ধান গোলায় তুলে যারা সুখে দিন কাটাল তারা কি নীরবে অত্যাচার করে যায় নি ?

হরিপদ বললে, এ কথা তো ওদের কথা।

ওদের অনেক কথাই মানুষের কথা। আর যা মানুষের কথা তাকে মেনে নিয়ে নিজেদের কথা করা অন্যায় নয় হরিপদ! আমি তো সেই ভাবেই চলব ভেবেছি।

অশোক হাসতে হাসতে বললে, তাহলে কি এখানে আর তোমার টেঁকা হবে বিমলদা ?

আমরা না টিঁকলে বিদেশ থেকে ভাড়া করা লোক আসবে নাকি এখানে ? ভেবেছিস কি ? যা বলছি সেই লাইনে চল। সামনে ভীষণ লড়াই আর দুঃখের দিন আসছে।

দেখতে না দেখতে সত্যিই সেই চূড়ান্ত দিন ঘনিয়ে এল। অনেক পরিশ্রম অনেক যুক্তি অনেক তথ্য দিয়ে অতুল্যদা থেকে প্রফুল্লদার বক্তৃতা শেষ হলেও, বিরোধীদের ঐক্যের বাঁধনে সেদিন নির্বাচনের হিসেবে একশ সাতাশের কংগ্রেস দল পি-ডি-এফ-এর পাশে ধর্মবীরার আশীর্বাদে আর প্রফুল্ল ঘোষের মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের জোরে পঞ্চান্নতে নেমে গেল।

মারাত্মক সেই পরিস্থিতিতে বেলতলা রোডের সিদ্ধার্থ রায়কে দায়িত্ব নিতে হলো পূর্বসূরীদের পাওনা লাঞ্ছনা বিধানসভায় সহ্য করতে। গণতন্ত্র যে কত সজীব হল রক্ত আর বারুদ বৃষ্টির মাধ্যমে শহর আর শ্যামলী বাংলায় তা আর একবার প্রমাণ হলো।

জনগণ যেন বলছে সত্যিই "ডেমোক্রেসি অব দি পিউপল, বাই দি পিপ্ল, ফর দি পিপ্ল।"

এবং আমরাই সব করব আমরাই ভাবব আমরাই বলব।

কংগ্রেসের রাজত্ব অথবা হাইকম্যাণ্ড থেকে মাইকম্যাণ্ডের ঠিকাদারী শেষ হয়ে গেল।

কাকদ্বীপের দিকে সেদিন একটা গাড়ি করে রমাদি, ল্যান্সডাউনের বাবু সাহেব যাচ্ছিলেন, সম্ভবতঃ সাগরে কোন সভা। তা ওসব দিকে রমাদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ায় দু'পাঁচ কথা হবার সম্ভাবনা কম।

সেদিনই হংসদার আশ্রম ঘুরে অরূপদাকে সঙ্গে নিয়ে বিমল, কাকদ্বীপ কলেজের অশোক আর সাগরের হরিপদ, মৃত্যুঞ্জয় ওরা বাজারটার কাছে বসে ছিল চা খেতে। তার পর যাবে কাকদ্বীপ কলেজে সভা করতে। এখানে এখনো কোলকাতার উত্তাল তরঙ্গ এসে প্রবেশ করে নি। ছিটে ফোঁটা যা উৎপাত তার মোকাবিলা করতে হংসদার নামটাই যথেষ্ট।

বাজারের কাছেই রমাদির গাড়িটা এসে থামল। দরজা খুলে নামতেই দেখে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বিমল বসে সেই দোকানে। শেষ পর্যন্ত রমাদি ভাবলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। বিমল কিন্তু সামলে নিয়ে বললে, আপনারা কত দূর?—

গাড়ির ভেতরে ততক্ষণে রমাদির কেয়ারটেকার দাদা বিমলকে দেখতে পেয়েছে। বললে, সাগরে যাব হে—সভা আছে। তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে হবে আবার রাতের মধ্যেই কোলকাতা ফিরব।

হরিপদ একটু ইতস্ততঃ করল। কারণ সে সভার কিছুই জানে না। সম্ভবতঃ দলাদলি রয়েছে। হংসদা এখানে নাকি? একটু যেন শঙ্কিত কণ্ঠেই বললে গাড়ির ভেতরের দাদাবাবু।

অবহেলিত সুন্দরবন! কতবার কত প্রস্তাব, কত কান্না, কত মিছিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। এখানকার নোনা জলের মত যেন মানুষের রক্তে হাড়ে মজ্জায় নোনা ধরে গেছে। আর কত লড়বে? আর কত সইবে? আবাদ আর লাট অঞ্চলে গরানের জঙ্গলে, আজ বাঘ দেখা মানুষগুলো কাকদ্বীপে কংসারিদার সঙ্গে অনেক রক্ত দিয়েছে। আর কত দেবে?

গঙ্গাসাগর মেলায় সাগর স্নানের পুণ্য দানে শান্ত দক্ষিণ দেশ নিরন্ন হয়ে এখন ক্লান্ত। লঞ্চে সারাদিন কাটিয়ে আলিপুরে এসে মামলা করা, সামান্য চিকিৎসার ওষুধের জন্য ক্যানিং-ডায়মণ্ডহারবারে ছুটে যাওয়া—তবুও এদের কাছে যাচ্ছে রমাদিরা দলের কথা বলতে। কিন্তু শুনবে কি "ার? এই কথাই বলছিল বিমল, অশোক আর হরিপদ।

এখানে গাঁয়ের কাহিনী নিয়ে, নদীর দৃশ্য নিয়ে ভাল ভাল বই লেখা হয়েছে—

তাতে মানুষের দুঃখ আছে। এইসব দুঃখী মানুষদের নিয়ে শহরের ময়দান সহস্র বার মিছিলে মিছিলে পূর্ণ হয়েছে। প্রস্তাবের প্রতিছত্রে এদের অর্ধাশন অনশনের জন্য অনুশোচনা ও প্রতিকারের দাবী হয়েছে কিন্তু সুন্দরবনের কুৎসিত জীবন-যাত্রায় সামান্য আনন্দের প্রলেপ এখানো লাগেনি। তাছাড়া প্রথম যুক্তফ্রন্ট পতনে সবচেয়ে যে এম-এল-এ'দের সস্তায় পণ্যের মত খরিদ করা হয়েছিল তাদের অনেকেই সুন্দরবন অঞ্চলের। সুন্দরবনের মানুষ এই কলঙ্কের প্রতিবাদ করতে চায় কঠোর ভাষায়। এর জন্য কোন ক্ষমা নয়—সবাই মিলে যেন সংঘবদ্ধ হতে চায় এরই প্রতিবাদ করতে।

ভেড়ী থেকে বড বাড়ি আর গোলাবাড়ির মানুষগুলোকে অস্পৃশ্য না করেও পাশে রাখা যেতো আসল সত্যকে বলে দিয়ে। কিন্তু সরকারী ক্ষমতার অনেকেই এদের প্রলুব্ধ করেছেন প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে—বিনিময়ে তারা নিজেরাও শহরের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছেন, দলের কোষবৃদ্ধি করেছেন। এখানে কোন নেতার বেশী ফারাক নেই। এরা অনেকটা জিজিয়া কর দেবার মত উৎকোচ দিয়ে সুবিধে নেওয়ার ব্যাপারটাকে যখন অধিকার বলে ভেবে নিয়েছেন তখন তাদের কাছে অন্য কথা ভাল লাগবে কেন? অথচ এদের বিরুদ্ধে যারা তারা কোনদিনই ভাল চোখে দেখে নি দু'দশকের সরকারকে। তাই একূল ওকূল দুদিক হারানোর ভয়ে এখন কংগ্রেসের নৌকো টলমল।

॥ উনিশ ॥

পশ্চিম বাঙলার উপর দিয়ে ঝড়ের পর ঝড়।

কোনটার গতিবেগ কত ছিল তা একমাত্র দিল্লীর নর্থ ব্লকের হোম-মিনিষ্ট্রিব ওয়েস্ট বেঙ্গল সেল জানত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের তথ্য শুধু গ্রাম বাঙলার থানা, আদালত ও শহরগুলোর লাশকাটা ঘর ও হসপিটাল জানে। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড কি করছে তখন? নেহেরুজীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের ভেতরে সবার অজান্তে সত্যিকারের একটা 'ক্যু' হয়ে গিয়েছিল। এরা স্থবির হয়ে আসমুদ্র হিমাচলের এত উত্থান পতনেও বিচলিত না হয়ে ক্রিকেটের পরিভাষায় স্টেডি ব্যাটস্‌ম্যানের মত খেলতে চাইলেন। কিন্তু খেলতে চাইলেই খেলতে দেয় কে? বাঙলায় অজয় মুখার্জি, উড়িষ্যায় মহতাব, বিহারে মহামায়া প্রসাদ, উত্তরপ্রদেশে চরণ সিং, মধ্যপ্রদেশে গোবিন্দ নারায়ণ সিং, পাঞ্জাবে গুরনাম সিং, হরিয়ানায় প্রকাশ সিং বাদল, মাদ্রাজে আন্নাদুরাই, কেরালায়

নাম্বুদ্রিপাদ চার দিক থেকে যেন চেপে ধরল। কংগ্রেসী হাইকম্যাণ্ডের দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প বুদ্ধি, দীর্ঘ মেদবহুল খাদি-সর্বস্ব কয়েকজন ওজনে ভারী জাহাজী নেতা আফিং-এর নেশার মত, মোগলদের ক্রাইসিস্ পিরিয়ডের নেতার মত, উন্মাদ হিটলারের মত হয়তো বা এ সব পরিবর্তন শুনেও নিকটবর্তী বশংবদকে বলতে লাগলেন, "সব ঝুট হ্যায়, সব ফালতু হ্যায়।" এদিকে পশ্চিম বাঙলায় অন্ততঃ অবস্থা তখন "সব সাচ্ হ্যায়।"—তা হাইকম্যাণ্ড মানুক বা না মানুক।

সূর্যাস্তের পর গ্রীষ্মের গোধূলিতে যে অস্তরাগ, অনেকটা সেই ধরনের বিষণ্ণ অথচ প্রচণ্ড আগুন নিয়ে মৃত্যুর নাচনে মাতোয়ারা বাঙলার তরুণ দল নেমে গেল যেন কিসের খেলায়। সেখানে দল মত পতাকার চেয়ে কেমন যেন শেষ হয়ে যাওয়া বা শেষ করে দেবার নেশা প্রবল। কেউ বলে এ সর্বনাশের খেলা। কেউ বলে এ খেলা ভাঙার খেলা। সায়াহ্নের পূরবী রাগ না হলেও কি একটা রাগে যেন সবাই গান ধরেছিল। হয়তো বা শেষ হয়ে যাবার বা ফুরিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে জ্বালিয়ে যাবার কোনো রাগ। যা শাস্ত্রে নেই কিন্তু বাস্তবে আছে, যার স্বর নেই কিন্তু ধ্বনি আছে, শোনা যায়।

ধর্মবীর, আশু ঘোষ, হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গীর কবীর, অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষের বাঙলায় অনেকেই মারা গেল। জ্যোতিবাবুর শ্রেণী সংগ্রাম প্রমাণ রাখতে পারল না কোনো একটা মৃতদেহের কোথায় আছে শোষকের চিহ্ন। প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি বোঝাতে পারল না ক্ষমতা লোলুপতা, হিংসা আর অহিংসার পার্থক্য কি। ধর্মবীর জাঁদরেল আই-সি-এস এবং দক্ষ প্রশাসক হলেও ভুলে গিয়েছিল যে এই মাটিতে দক্ষতাই শেষ কথা নয়, হৃদয় ও বিচার বোধই আসল জিনিস।

সব কিছুকে ছাপিয়ে যাদের মুহুর্মুহু ঢক্কা নিনাদে ও সাহসিকতার নামে সব হঠকারিতায় ফাগুন রঙের যৌবনগুলোর আগুন বসন্ত না আসতেই ঝরে গেল, তারা হলো 'নকশাল বাড়ী লাল সেলাম।' চারুবাবু, কানুবাবু, সত্যানন্দদা। আরও অনেকের মত অসীম, রণবীর বিপ্লব, প্রদীপের মত নিষ্পাপ কয়েকটি যৌবনের তেজস্বিতা ও আদর্শবোধের মূল্যায়ণ হলো না। ওদের ছিল সবই ঠিক, শুধু ভারতীয় মন ও জীবনটাকে যাচাই করতে ভুল করায় রক্ত ওদেরও কম যায় নি।

'রেভুলিউশান ইজ নিডেড, বাট রেভুলিউশান ইজ আপসেট' এমন একটা মানসিকতার কাছে নকশালবাড়ীকে ধীরে ধীরে এগুতে হলো। কিছু মস্তানের

মাতব্বরী শহরে ত্রাস সৃষ্টি করলেও অনেক আদর্শবাদী সাচ্চা নওজোয়ানের 'দিল দিমাগ আউর খুন কো' উচিত দাম নেহি মিলা। তার বড় কারণ ওদের সবটাতেই একটা বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। আর সেই ফাঁকা জানালা দিয়ে ভারতের আজন্ম কালের ধ্যান ধারণা ও সংস্কৃতির হাওয়া এমন ভাবে বইতে শুরু করল যে পাল রাখা দায় হলো নকশালবাড়ীর। তবুও ওরা মরেছে কিন্তু হারে নি।

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড যদি সেদিন চোখ মেলে চাইত তাহলে গোটা ভারতবর্ষের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর একটা ছোট ইশারা অনেক আগেই পাওয়া যেত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদিও বা অবস্থার গুরুত্ব মানতে চাইত তবুও গ্রামের বটতলার সাধুর মত বলতে পারত "সব ঠিক হো যায়েগা।"

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই নিতান্ত দুর্বোধ্য অবস্থা থেকে সরে এসে যিনি একটু নড়াচড়া করতে চাইলেন এবং বাঙলার ঝড়ের গতি অনুভব করতে চেয়েছিলেন তিনি গুলজারীলাল নন্দা। নন্দাজীর কোলকাতায় আসা-যাওয়া, এডহক কংগ্রেসে প্রফুল্ল সেনকে মনোনীত করা এবং আরও কিছু পরামর্শ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি অনেক আগেই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডকে বিব্রত করেছিল।

শেষটায় নন্দাজীর সদিচ্ছাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল হাইকম্যাণ্ড। ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ে সবচেয়ে কংগ্রেস দলের যে মাথা ব্যথা হবার কথা তাদের হাইকম্যাণ্ড নামক একটা অদৃশ্য, বায়বীয়, জড়, স্থবির, মেদ-সর্বস্ব অস্তিত্বের কিন্তু কোনো মাথা ব্যথা হলো না।

দিল্লীতে সরকার কায়েম আছে, রাজ্যে রাজ্যে যুক্ত মোর্চা চলছে। হয়তো ব সব টিকবে না, তখন চান্স নেওয়া যাবে—এমনই একটা আয়েসী মেজাজে সাত নম্বর যন্তর মন্তর রোড, দু নম্বর যন্তর মন্তর রোডের নেতারা দিন কাটাতে লাগল। কামরাজ সাহেবের সদিচ্ছা যাই থাক এবং পরবর্তীকালে লিজলিঙ্গাপ্পা সাহেবও এই অদ্ভুত মায়াময়, ছলনাময় কুহকের মধ্যে থাকা হাইকম্যাণ্ড নামক একটা সম্পদবিহীন পুরনো লোহার হাতলভাঙা সিন্দুকের ওজনকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। সামান্য একটু ব্যতিক্রম দেখালেন দিল্লীর ক্যানিং লেনের অতুল্য ঘোষ।

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেও বোঝাতে পারলেন না, আবার বোঝাতে চেষ্টা করলেও জনগণ তাঁকে শুনতে চাইল না। আবার কেউ শুনতে চাইলেও তার উল্টো অর্থ করে বসল। কারণ ততক্ষণে জনচিত্তের সবচেয়ে সূক্ষ্ম জায়গা থেকে তিনি বিতাড়িত। ভালোবাসার বদলে ভীতি, ব্যক্তিত্বের বদলে দম্ভের প্রতীক

হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীঘোষ বাঙলার জনমানসে। আর জনচিত্তের থেকে এবং অগণিত কংগ্রেস কর্মীর কাছ থেকে তাঁকে মুছে ফেলে দিতে সবচেয়ে তৎপরতার সঙ্গে যিনি সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন সেদিনকার বাঙলার এবং উনষাট-বি চৌরঙ্গী রোডের একমাত্র মেসিনগান শ্রীবতুবাবু। লালবাহাদুরের মৃত্যুতে যিনি বাঙলার কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে মালা দিতে গিয়েছিলেন দিল্লীতে। পাঁচশ পঞ্চান্ন নাম্বারের সিগ্রেট আর মিহি খাদির আঁটসাঁট জামার আস্তিন, আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ও চিবিয়ে কথা বলার মধ্যে নকল ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা এবং অতুল্যবাবুর কাছাকাছি থাকার একমাত্র কোয়ালিফিকেশান নিয়ে সাতষট্টি ও উনসত্তরের বিপর্যয়ের পরেও বতুবাবুর দাপট কমে নি। তিনিই তখন বাঙলার সিণ্ডিকেট বা হাইকম্যাণ্ড নামক অদৃশ্য ড্রাকুলার একমাত্র প্রতিনিধি।

জাল মেম্বারশিপে বোঝাই সক্রিয় সদস্যের একটা প্রকাণ্ড তালিকায় মনোনীত তথাকথিত বশংবদদের নিয়ে এক এক জেলা, এক এক প্রদেশ বানিয়ে বছরের পর বছর ধরে মৌরসী পাট্টা কায়েম করে বতুরাজ চলত তখন উনষাট-বি চৌরঙ্গীতে। তাদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে কথা বলতে না পারা মানুষ ও লোককে বলা হলো ডিসিডেণ্ট বা খারাপ অর্থে ইন্‌ডিসিপ্লিনড। সেই যে অজয় মুখার্জি বিতাড়ন পর্ব থেকে এ স্রোত চলেছিল তা সমানে রয়ে গেছে সর্বত্র। প্রফুল্ল সেন এর সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলার চেষ্টা করলেও তিনি জিততে পারতেন না কখনই। তার দুটি বড় কারণ হলো প্রথমত অতুল্যবাবুর প্রতি তাঁর অপত্যস্নেহ, আর দ্বিতীয়তঃ পেট পাতলা মানুষ মনের কথা সব খুলে বলতেন আর হাইকম্যাণ্ডের ফেলে রাখা বঁড়শী আর চারে ধরা দিতেন। এতৎসত্ত্বেও স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠত মাঝে মাঝে বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরী। কিন্তু সে আর কতক্ষণ—বুদ্‌বুদমাত্র।

বাঙলার যৌবন যখন বোমার শব্দে, কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়ায় আর পাইপ-গানের নলের সামনে জীবনের মহড়া দিচ্ছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে তখন দিল্লীর হাই-কম্যাণ্ড, কোলকাতার কংগ্রেসের যৌবনের প্রতিনিধিকে 'নেহাত বাচ্চা' 'ইম্‌ম্যাচিওর্ড' অ্যাখ্যা দিয়ে গাড়ি বারান্দার নীচে সেবাদলের চায়ের ঘরে মাসিক দেড়শ টাকা বরাদ্দে স্থির করে রাখা হতো। ওদিকে এয়োরার মাটিতে বিমল-সুব্রতর সহযোগী ভবানী শর্মা খুন।

জুলাইয়ের প্রথম দিকে কাটোয়া কলেজের ছাত্রনেতা মেধাবী ছাত্র স্বয়ম্ভু সিংহ খুন হলো নির্মমভাবে। স্বয়ম্ভুর রক্তে রাঙিয়ে গেল বৈষ্ণব পীঠস্থান কাটোয়ার মাটি।

আজ সাতই জুলাই! সারা বাঙলায় আজ ছাত্রদের হরতাল—বিমল-সুব্রত এবার মরীয়া। হাইকম্যাণ্ডের দিকে আর তাকিয়ে থাকা নয়—নিজেরাই এগিয়ে যাবে ওরা দিকে দিকে, গ্রামে শহরে, মৃত্যু কিংবা আঘাত সবটাই হবে প্রায়শ্চিত্তের সামিল।

তবুও লড়তে হবে। বন্দেমাতরম্ বলে স্বাধীনতার পর সারা বাঙলায় প্রথম যে ছাত্র ধর্মঘট সফল হলো, তা স্বয়ম্ভুর মৃত্যুর প্রতিবাদের ছাত্র ধর্মঘট। পতাকার রঙ যাই হোক, শ্লোগান যাই থাক, স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে এত সার্থকতা এর আগে কখনও দেখে নি বিমল। সুব্রতও যেন দশগুণ সাহস ও মনোবল ফিরে পেয়েছে। ফলে এমনি করে একের পর এক মৃত্যুর তালিকা দেখে মহাজাতি সদনের ছেলেরা এখন আর চমকে ওঠে না। ভয় পায় না! ওরা এগিয়ে যায়। শুধু অপেক্ষা কবে কার পালা!

হরতাল শেষে বিকেলবেলা সুমিত্রা বলল, সুব্রত একবার কংগ্রেস ভবনে যাবে না?

কি দরকার ওখানে গিয়ে, ওরা তো এখন ভাগাভাগির কথা ভাবছে। তার চেয়ে বরং নেক্সট্ প্রোগ্রামের কথা ভাবো, সুমিত্রাদিকে বিমলদা বলে।

ঠিকই বলেছে, তবে কি জানো, এমন অনেক মানুষ তো আমাদের দলে আছেন যাঁরা নানা কারণে নীরব, কিন্তু আমাদের এই কাজ দেখে উৎসাহী হয়ে পাশে এসে দাঁড়াবেন। সুমিত্রা বল।

যারা আসবার তারা ইতিমধ্যেই আসা শুরু করেছে সুমিত্রাদি, কিন্তু যারা আসবে না তারা যতক্ষণ গদি ফেরত না পাচ্ছে ততক্ষণ আসবে না—সুব্রত বলল।

ছাত্র-পরিষদ হলো নবজাতক। তার সানাইয়ের সুরে বাহারী রাগ বাজবে কেন? তার চলার ছন্দে, অত ছন্দ, অত ধ্বনি আসবে কেন? তবুও হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে যৌবনের ইশারায় বাঁচার তাগাদায় ও বাঁচাবার আগ্রহে অস্থির যারা এক দুই তিন করে আসতে লাগল, বা আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। স্বয়ম্ভুদের মৃত্যু দেখে তাদের কপালে তিলক পরিয়ে কাছে ডেকে নেবার জন্য কেউ ছিল না। কাকে ছেড়ে কার কথা ভাবা যায়? যারই প্রাণ যাচ্ছে সেই একজন যুবক কিংবা ছাত্র কিংবা শ্রমিক অথবা কৃষক।

বিমল যাচ্ছিল ডায়মণ্ডহারবার কলেজের মিটিং-এ দিবাকরদের ওখানে। বাসে করে যেতে মোথার একটু আগে এসে দেখল অনেক লোক দাঁড়িয়ে, পুলিস, ভীষণ উত্তেজনা! শরীকি লড়াইয়ে খুন হয়েছে দুজন। তারা দুজনেই

যুবক। তাদের শবদেহ নেবার মালিক হয়তো বিমল নয়, কিন্তু তাদের জন্য সেদিন ডায়মণ্ডহারবার কলেজের সব কিছু বন্ধ ছিল, কারণ তারা সেখানে পড়ত।

এসব ঘটনার গতি বাড়তেই বোধহয় অজয় মুখার্জি প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়া শুরু করলেন হিংসার বিরুদ্ধে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। জেনে শুনে বিষ পান করে যে, বিষ উদ্গার করা যায় না যে রাতারাতি!

মুখ্যমন্ত্রীত্বের তুলনায় বাঙলার যৌবনের জন্য যদি বেশী করে ভাবার চেষ্টা করতেন অজয়বাবু তাহলে তার দায়িত্ব অনেক আগেই পালন করা উচিত ছিল —বিমল বলল এই কথাগুলো একটা ছাত্রসভার কোন্নগরে। সেখানেও ভীষণ উত্তেজনা। ক'দিন আগেই রায়গঞ্জে প্রচণ্ড ছাত্র ঘর্মঘট হয়েছে শঙ্কর, তিলক, শিলাদিত্যদের চেষ্টায়। ওরাও সেই একই কথায় প্রতিধ্বনি করেছে।

কার্জন পার্কের অনশনে সুশীলবাবুরা অজয়বাবুরা যখন রয়েছেন তখন তোপখানার বারুদ আর পাইপগান শেষ না হলেও বাঙলার অর্থনীতি, যৌবন আর সম্ভাবনাময় হাজার জীবনের জীবন দীপ নিভে গেছে। অনশনটা তাই অনেকটা মৃত্যুর পর অশৌচ পালনের ব্রত বা বিধবার একাদশীর মত লাগছিল। যে কোনো মূল্য ক্ষমতা ধরে রাখাটাই যে গান্ধীজীর চিন্তার বিরোধী একথা তাঁদের সেদিন বোঝাবে কে?

টিটকিরি দিয়ে বামপন্থী কেরানীকুল অনশনকারীদের উপর ইঁটপাটকেল ছুঁড়লেও বিমল-সুব্রতর দল অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিল অজয়বাবুদের এই বলে যে, দেরীতে হলেও আপনাদের বিবেক জাগ্রত হওয়াতে ধন্যবাদ। যদিও বিমল-সুব্রতর দলকে কোনও এক নয়ই আগষ্ট শহীদ মিনারে পতাকা তোলার সময় অজয়বাবু কম লাঞ্ছনা করেন নি। এবং বিমলরা যে বৈষ্ণব নয় এ কথাও তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি।

সেদিন সদনে বসে সুমিত্রা বলছিল বিমলকে, শেষ পর্যন্ত অজয়বাবুও আমাদের সম্বন্ধে একথা বললেন বিমলদা?

বলতে দাও। চেয়ারে থাকলে গান্ধী দর্শনের ব্যাখ্যা এক রকম হয়, আর চেয়ার থেকে নেমে এলে আর এক রকম হয়, সেই জন্যই এই ব্যাখ্যা—বিমল বলল।

আসলে বিয়াল্লিশেই ৯ই আগস্ট পালন করতে গিয়ে বিমল-সুব্রত শোভাযাত্রা নিয়ে এসেছিল শহীদ মিনারে। যুক্তফ্রন্ট সরকার মনুমেন্টের নাম পালটিয়ে শহীদ মিনারে করেছে তার জন্য সরকারী উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাতে ও শহীদ দিবসে জাতীয় পতাকা তুলতে চেয়েছিল বিমলরা। সেদিন শহীদ মিনারে সব

দলের পতাকা ছিল। ছিল না শুধু সেই পতাকা, যার জন্য বিয়াল্লিশেই ৯ই আগস্ট হয়েছিল। সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। অজয়বাবু সেটাও উপেক্ষা করে লাঙ্গলমার্কা বাঙলা কংগ্রেসকে ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

শহীদ মিনারের এই অপমান সহ্য করা হবে না। গর্জে উঠেছিল বিমল, সেই সঙ্গে সুব্রত। জাতীয় পতাকা তুলতে চেয়েছিলেন ওরা। শহীদ মিনারে। কংগ্রেস পতাকা নয়। তুলতে ওরা পারে নি। মনুমেণ্টের বেদীতেই জাতীয় পতাকা রাখতে হয়েছিল। পুলিশ মেরে শোভাযাত্রাকে হটিয়ে দিয়েছিল। আহত হয়েছিল সবাই। অথচ কার্জন পার্কের অনশনব্রতীদের কাছে সেদিন এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত দেখা যায় নি। কারণ তখন দিকে দিকে আওয়াজ—"সরকার চলছে—চলবে। মন্ত্রীরা থাকছে—থাকবে।" অথবা সবার সব বন্দোবস্ত যখন পাকা, তখন বিবেক, জ্ঞান, গান্ধী দর্শনের মূল্য কি? শুধু শুধু সি-পি-আই-এমকে দোষ দিয়ে লাভ কি? বাকি যারা তাদের সবাই কি সাধু পুরুষ? তারা দুর্বল বলে নড়াচড়া কম করে। কিন্তু লোভের মাত্রা কম নয়। শরীকি ঠ্যাঙ্গানীর চোটে হয়ত আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তা না হলে কেউ কিন্তু কম যায় না বিমলদা—সুব্রত বলল।

আমাদের এতগুলো ছেলে মরে গেল অথচ সবাই নির্বিকার। দোষগুলো কি সব আমাদের? কংগ্রেসী চোর বলে যদি কেউ থেকে থাকে, গ্রাম শহর থেকে তাদের খুঁজে বের কর না বাপু। আমরা কি বাধা দিয়েছি! সুমিত্রা আক্ষেপের সুরে বলেছিল কথাগুলো একটা জীপে করে মেদিনীপুর থেকে আসতে আসতে। সুকুমার শৈলজা ছিল গাড়িতে। গড়বেতা কলেজের ইলেকশান শেষ করে আসছে ওরা। মৃগেনকে জিতিয়ে। খুব সাহায্য করেছিল পঞ্চাননবাবু সেবার। গাড়ির মধ্যেই কথা বলছিল আর বিমল সব শুনছিল।

সুকুমার বলল, আমাদের কিন্তু বাঙলা কংগ্রেসীরাই যা করছে তা সি-পি-এমের থেকেও চরম। যা খুশি তা করছে।

শৈলজা বলল, সি-পি-এম কম কিসে?

শৈলজার কথায় পরেই বিমল মুখ খুলল, তোদের হয়েছে জলাতঙ্ক রোগের মত। যেখানে যে-পার্টি শক্ত সেখানেই তাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছিস। একবারও ভাবছিস না যে এর সবগুলির জন্য আমরা কতটা দায়ী?

পাপটা কি এত বেশী বিমলদা যে প্রায়শ্চিত্ত এখনো শেষ হয় নি? সুমিত্রা বলল।

কেন? সুব্রত বলল।

আসলে কংগ্রেস মানে সবার আশ্রয়, মহাসভা, এটা হলো কথার কথা। বাস্তবে

চেহারাটা দেখ। আটাকল, সিনেমাহল, বড় লাইসেন্সধারী, স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান, ভেড়ীর মালিক, ষ্টিলের ব্ল্যাক মার্কেট করা লোক, সিমেণ্টের চোরা কারবারী, গোলমেলে কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান, এদের অধিকাংশই হলো আমাদের দলের আসল পিলার।

এদের বদান্যতায় কর্মী সম্মেলন, খানাপিনা, বৈঠক, চাঁদা, মহোৎসব, ফিতে কাটা, সম্বর্ধনা সব কিছু। মঞ্চের খুব কাছাকাছি এদেরই ভীড়। অথচ এরা তো আমাদেব লোক হবার কথা ছিল না—বিমল বলল।

বর্ধমানের তুহিন বলল, তুই একটু বাড়িয়ে বলছিস বিমল। যত দোষ সব আমাদের মধ্যেই দেখছিস। আসলে যারা ক্ষমতায় থাকবে তাদের সঙ্গে এরা থাকবে।

হয়ত কিছুটা সত্যি তুহিনদা। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে পারার চেয়েও, ক্ষমতা ধরে রাখার বিজ্ঞান যে আয়ত্ত করতে পারে না, পচে গেলে শেষ হয়ে যায়, তাকে দিয়ে কি কিছু হয়?—বিমল বলল।

গণতন্ত্রে সবাই তো আসতে হবে ক্ষমতায়, কাজেই ক্ষমতা ধরে রাখার বিজ্ঞানটা কি খুব ভাল কথা? সুমিত্রা বলল।

আমি সেভাবে বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি, যে কারণে মানুষ ক্ষমতা দিয়েছে সেই কারণটা মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করতে না পারলে ক্ষমতা রাখা যায় না। আমরা কুড়ি বছর ধরে তা কি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরেছি? পশ্চিম বাঙলা দিল্লীর রাজ্যসভায় আমরা শিল্পপতি ও টাকাওয়ালা লোক পাঠাই। লোকসভার বেশীর ভাগ আসনে মোটা টাকা দেনেওয়ালা লোক বসাই। এমন করে একটা ঘরের খুঁটি কতদিন শক্ত থাকবে? তাই ঘুণ ধরেছে সব জায়গায়। টোকা দিলেই ভেঙ্গে পড়ছে।

সুকুমার বলল, জোতদারগুলো এখন কিন্তু আবার কিছু সি-পি-এ-এম কিছু বাঙলা কংগ্রেসে ভিড়েছে।

হতে পারে। তবে কংগ্রেসে যারা ছিল তাদের সংখ্যা ও শোষণের পরিমাণ হিসেব করলে গান্ধীজীর নাম নেবার যোগ্যতা আমাদের থাকা উচিত নয় সুকুমার—বিমল বলল।

সুব্রত বলল, এ ব্যাপারে আমি একমত। ধান্ধাবাজগুলো লাইন করে আমাদের সঙ্গে ছিল বলেই আমাদের এই অবস্থা।

ড্রাইভার শিবু আন্দুলের মোড়ে আসতেই জীপের টায়ার পাংচার হয়ে গেল। গাড়ি থেকে গেল। আন্দুলের মোড়ে ওরা নামতেই সেই বিখ্যাত মিষ্টির

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাওড়ার ছবি, অজয়, সমর, কেষ্ট। ওরাও ফিরছিল বোধ হয় সভা করে। আন্দুল কলেজের ইলেকশান। কেষ্টরা জিতেছে।

বিমল তো ভীষণ খুশি। সুমিত্রাকে বলল, আমাদের পালে বোধ হয় হাওয়া লাগল। দেখছ একদিনে দুটো স্কোর। গড়বেতা জিতেছি, আন্দুল জিতলাম।

সুব্রত বলল, মন বলছে কাল সকালে বঙ্গবাসীও জিতবো, অশোক খুব লড়ছে। সত্যিই দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ করে বিমলদের থেমে যাওয়া নৌকোকে ডাঙ্গা থেকে টেনে টেনে স্রোতে ভাসিয়ে দিল বোধ হয় কেউ। সব জায়গায় জিত। বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ, শ্যামাপ্রসাদ, চারুচন্দ্র, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, এমন কি দীর্ঘদিনের ঘাঁটি যে আশুতোষ কলেজ ডি-এস-ওর—তাকেও ছিনিয়ে নিল বিমলরা, এবার বিমল আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু আনন্দ করার সময় নেই। কারণ জয়ের খবরের চেয়ে মৃত্যুর খবর অনেক বেশী।

কার্জনের অনশন শেষ হলো।

দিল্লীর হোম-মিনিস্ট্রির কর্তাব্যক্তিরা এসে আসল অবস্থা দেখে নিয়ে চলে গেলেন। এবার বোধ হয় অন্য খেলা শুরু হয়ে যাবে।

হলও তাই। কয়েক মাস যেতেই অজয়বাবু ইস্তফা দিলেন। সরকার ভেঙ্গে গেল। রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হলো। প্রতিবাদে সোচ্চার হলো এবারও যুক্তফ্রণ্টের কয়েকটি শরীক। কিন্তু এবারে উত্তাপ কম। আঘাতের ধার কম। দু'একটা বাঙলা বন্ধের মহড়া সার্থক হলেও মানুষের মনে বোধ হয় নতুন প্রশ্ন শুরু হলো। এরপর কি? এরপর কেমন করে?

এই খেলা শেষ হবার আগেই আর একটা বিরাট খেলা হয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। সেই খেলা হলো আবীর নিয়ে ফাগুয়া খেলার মতো এক বসন্তের মেলা। অনেক পাতা ঝরার মুহূর্ত এগিয়ে এল। তার মাতন হলো তীব্র। আকাশে-বাতাসে তার ভেরীর নিনাদ কম্পিত হলো। স্থবির অচল জড় শ্লথগতি অচলায়তনের কারা প্রহরীরা। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর সাথে সাথেই দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্ন নিয়ে হাইকম্যাণ্ডের কম্যাণ্ডররা যুদ্ধের মধ্যে এসে পড়লেন। এক দিকে সহস্র নারায়ণী সেনা নিয়ে কৌরবপক্ষের মত কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের মত বিশাল শক্তিশালী কিছু স্তম্ভ। অন্য দিকে গাণ্ডীব নিয়ে একা ইন্দিরা গান্ধী।

জামিয়া মিলিয়ার সমাধিতে ঘুমিয়ে ডঃ জাকির হোসেন। পণ্ডিত, স্বদেশ—

প্রেমিক, খাঁটি একজন ভারতীয় ডঃ হোসেন গোলাপের মত সুন্দর। সমাধির কাছে গোলাপের অস্তিত্ব তাই বেশী জীবন্ত।

এবারে মসনদে প্রথম আবর্তনের আর্তনাদ শুরু হলো। রাষ্ট্রপতি কে হবে? কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশ চেয়েছিলেন লালবাহাদুরের উত্তরাধিকারী হোক মোরারজী ভাই। কিন্তু মোরারজীর ব্যক্তিত্ব, একগুঁয়েমি এবং কোথাও কোথাও কিছুটা দৃঢ়তার জন্য কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বা সেদিনকার সিণ্ডিকেট চেয়েছিলেন এমন একজনকে যে অন্তত তাদের কথা শুনবে এবং চলবে। পুতুলের মত না হলেও আজ্ঞাবাহী দূতের মত। তাঁদের পছন্দ ছিল সেদিন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি জিতেও ছিলেন শেষ পর্যন্ত এবং হাইকম্যাণ্ডের ইচ্ছাই জয়ী হয়েছিল।

কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল, হাইকম্যাণ্ডের মনে হচ্ছে যে আজ্ঞাবাহী দূত তো দূরের কথা, একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না ইন্দিরা গান্ধী ওদের। ফরিদাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরের অধিবেশনে তা আরও স্পষ্ট হলো। অতএব একটা শো-ডাউন করা হোক। তখনকার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের প্রায় সবাই এবং সংসদের এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেসী সদস্য সিণ্ডিকেটের আজ্ঞাবাহী ছিলেন। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হলেন নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। তিনি তখন লোকসভার স্পীকার।

প্রথমটায় অবশ্য একে নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ হয় নি। এমন কি এর মনোনয়ন পত্রে স্বয়ং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীরও তাঁর স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শেষকালে অনেকটা নাটকীয় পরিস্থিতির মতই ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মত বদলালেন এবং বিবেক অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচনের জন্য আবেদন জানালেন। অবস্থা জটিল হয়ে উঠল। অকংগ্রেসী ভোট এবং বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট ভোটগুলো সংগ্রহ করতে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে গিরির সমর্থনে নামলেন রঘুনাথ রেড্ডি। তিনি কোলকাতায় বিশেষ বিমানে এসে সেখানে জ্যোতিবাবুদের সঙ্গে কথা বলে কোচিনে ছুটলেন নাম্বুদ্রিপাদ প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলতে।

সি-পি-আই নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন নন্দিনী শতপথি। গিরি জয়যুক্ত হলেন। আভিধানিক অর্থে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করার কংগ্রেস থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হলো। ইতিমধ্যে জল অনেক খাদে বইতে শুরু করেছে। আভিধানিক অর্থে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ সত্যি হলেও সিণ্ডিকেটের একটা সর্বনাশা আড়িপাতা মনোভাব এবং ক্রমেই শ্রীমতি গান্ধীকে সরিয়ে তাঁদের পছন্দমত প্রধানমন্ত্রী বেছে নেবার যে একটা প্লট তৈরী হচ্ছিল সে

বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। তাই ভি. ভি. গিরির প্রশ্নে সেদিন ঝুঁকি নিলেন শ্রীমতী গান্ধী। সেই সংকটের দিনে দেশের নতুন ইতিহাস তৈরী করতে যে রাজ্য সবচেয়ে বেশী সাহায্য করল তার নাম পশ্চিম বাঙলা। সেদিনকার যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি গিরিকে সমর্থন করতেন, তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর অনেক স্বপ্ন, দেশের ন্যূনতম প্রগতিশীল রাজনীতির প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐক্য সব কিছু বিপন্ন হয়ে পড়ত। তাই একবার অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু কম্বিনেশনে পারস্পরিক বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তীব্র হলেও এই একটি প্রশ্নে ঐক্য ছিল। আর সেই ঐক্য শুধু বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরিকে নয়, তামাম বাঙলা মুলুকের বিমল-সুব্রতদের রাজনীতির মঞ্চে কুলীন হবার সুযোগ করে দিল। যেন কোথায় এক রাজনীতিক অস্পৃশ্যতার হাত থেকে বেঁচে উঠল ওরা।

এর আগেই অবশ্য এই বিরাট প্রশ্ন নিয়ে উনষাট-বি চৌরঙ্গীতে অনেক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। প্রশ্নটা প্রথমে এলো শৃঙ্খলা বনাম বিশৃঙ্খলাবাদ নিয়ে। তারপর চক্রান্ত বনাম বিবেক দিয়ে। তারপর এলো প্রতিক্রিয়া বনাম প্রগতির নাম দিয়ে। এতগুলো পরিচ্ছেদ অনুচ্ছেদের সীমানা পেরিয়ে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় চলে গেল তখন মহম্মদ আলি পার্কে গিরিপন্থীদের সভা শুরু হলো। উদ্যোক্তা বিজয় সিং নাহার ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়েরা। বিজয়বাবু মধ্য কলকাতার কংগ্রেসকে নিজস্ব দুর্গে রূপান্তরিত করেছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও প্রতাপবাবু ছিলেন সেদিন সেই জেলায় কংগ্রেসী দুর্গের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। এই কৌশলের ছকটি দীর্ঘদিন ধরেই করা ছিল।

চৌদ্দই আগস্ট মহম্মদ আলি পার্কের সভার বক্তব্য বনাম ধস্তাধস্তির পর সবাই এলো উনষাট-বি চৌরঙ্গীতে। সেখানেই শুরু হলো নাটকীয় পরিস্থিতি।

গিরি না রেড্ডি—এ প্রশ্নে হাতাহাতি এমন কি কর্মীদের মধ্যে মৃদু রক্তপাত হয়ে গেল। বিমল-সুব্রত প্রথমে ঠিক করেছিল কিছু করবে না, কিন্তু যখন দেখল বসুবাবুর আনুগত্যে বিশ্বাসী এক দলের বেপরোয়া মনোভাব সবাইকে আক্রমণে উদ্যত, প্রতিবাদ করেছিল বিমল-সুব্রত। ওদের উপর হামলা হলো তৎক্ষণাৎ। প্রথম চোটে ওদের আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচালেন আভা মাইতি। দ্বিতীয়বার কে যে কোথায় ছিটকে গেল কিছু ঠিক নেই।

তারপর একে একে সব নেতা চলে গেলেন। আটক পড়ে গেল বিমল-সুব্রত। বাইরে তখন অপেক্ষা করছে গুণ্ডার দল! বিমল-সুব্রত ভবনের কিছু স্টাফের সহযোগিতায় কোলাপসবল গেট আটকে মৃদু রক্তপাত নিয়ে না খেয়ে সারারাত জেলখানার কয়েদীর মত রাত কাটাল।

নেশাগ্রস্ত সমাজবিরোধীদের প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার ফাইনাল রিডিংটা বোঝাবার সম্বিত বোধ হয় ভোরের দিকে ফিরে এসেছিল। তার পরই ওরা স্থান ত্যাগ করেছিল।

স্বাধীনতা দিবসে পনেরই আগস্টে একসঙ্গে রক্তাক্ত জামা কাপড় নিয়ে আগের দিন রাতের আঘাতের চিহ্ন বহন করে ভোরবেলা বেরিয়ে এলো ভবন থেকে। অনেক ভোরে। যাতে কেউ দেখতে না পায়। কি চমৎকার, নিজেদের নীতি ও পদ্ধতির জন্য নিজেরাই আক্রান্ত।

দেখতে দেখতে হাওয়া গরম হয়ে উঠল চতুর্দিক থেকে।

মোরারজী দেশাইয়ের দপ্তর কেড়ে নেওয়া হলো, চৌদ্দটি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। শ্রীমতী গান্ধী এলেন ব্রিগেড প্যারেডে ভাষণ দিতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন আবার কোথায় মুক্তির ইশারা। হাজার হাজার ছেলে নাচছে, আনন্দে মাতোয়ারা, যেন মরা গাঙে বান ডেকেছে। যেন জোয়ারের জলে ভাসছে সবাই। নাচছে সবাই তা তা থৈ থৈ করে।

বরানগরের উমেশ কোথা থেকে ইন্দিরা গান্ধীর একটা সুন্দর ছবি মহাজাতি সদনে নিয়ে এসে বলল, দেবী তোমায় প্রণাম করি। দেবীর যেন উদ্বোধন হচ্ছে ব্রিগেড প্যারেডে।

বিমলের কাঁধে তখনও গুরুদায়িত্ব। মনে ঠিক করতে পারে নি কি করবে। দেবী ঠিক আছে, গিরি ঠিক আছে, প্রগতি ঠিক আছে—সব না হয় ঠিক, কিন্তু গ্রামে গঞ্জে শহরে এই সদ্য গড়ে-ওঠা সংহতি, যার ভিত্তিতে রোজ রোজ মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করছে ডজন ডজন ছেলে—তাদের কি হবে? তারা যদি ভেঙে পড়ে? তখন দুজন মাত্র যুবক একটা ইউনিটে জমে পড়লেও সর্বনাশ। কেননা দিন আনি, দিন খাই অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিমলদের ওঠানামা চলছিল। দুজন মরে গেলে দুজন রিক্রুট হয় একমাস পরে। উমেশ-সুব্রতরা ভীষণ প্রভাব আনল বিমলের উপর। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অথচ সেদিন যারা প্রগতির জন্য হৈ হৈ করে নেমেছিল মাঠে ময়দানে, তাদের প্রতি বিমল-সুব্রতদের বিরাট অংশের নৈতিক আনুগত্য ছিল না। আনুগত্য ছিল প্রতাপবাবু, প্রফুল্লবাবুর প্রতি। যাঁরা বুক দিয়ে আগলে সেই দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়াতেন।

বিমল তাই একদিকে ভবনের কিছু নেতার প্রতি আনুগত্য ও তাদের সাহচর্য, অন্যদিকে হাজার হাজার ছেলের ভবিষ্যৎ, এবং জলন্ত বাস্তব চোখের সামনে ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা-সবটা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায়

পড়ল বৈকি।

ব্রিগেডে সভা ইন্দিরা গান্ধীর। চোদ্দটা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়ে গেছে। সারা ভারতবর্ষে কেমন যেন সমাজবাদ ছিনিয়ে আনার নেশা।

বাদ সাধলেন তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র।

না, আমি সভার সভাপতিত্ব করব না।

সর্বনাশ হয়ে যাবে। একে এই উত্তেজনা, অন্যদিকে হাজার হাজার লোক ছুটেছে ময়দানে। সেখানে প্রতাপবাবু সভায় সভাপতিত্ব না করলে করবে কে? ওঁৎ পেতে সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছেন বিজয় সিং নাহার।

পত্রালাপ হলো প্রতাপবাবু ও সিদ্ধার্থবাবুর মধ্যে এই বিষয় নিয়ে। পরিশেষে সবার মতামতের চাপে ও পরামর্শে প্রতাপদা যাও বা রাজী হলেন, প্রফুল্লদা হলেন না। তিনি সভা বয়কট করে কংগ্রেস ভবনেই বসে রইলেন। অনেকেই তাঁকে স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন যে অতুল্যদা প্রফুল্লদা বিহীন সভায় উৎসাহ নিয়ে মানুষ তেমন যাবে না। ভীড় কম হবে।

কিন্তু সেই জনতার দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। জোয়ার নেমেছে যেন মানুষের। ব্রিগেড মহাসমুদ্রের, মহাতীর্থে পরিণত হলো। বিমল-সুব্রতরা নেচে নেচে অনেকটা মুক্তির স্বাদে মাতোয়ারা হয়ে ময়দানে এলো। উমেশ সেই ইন্দিরাজীর ছবিটিকে নিয়ে দেবী দেবী করে সারা চৌরঙ্গী নেচে বেড়াল। আর সেই দিন রাতেই গড়িয়া, বাঁশদ্রোনী, টিটাগড়ে খুন হলো আরও কয়েকজন। ব্রিগেডের সভায় বর্ণনা দিতে গিয়ে সেই খবরগুলো তেমন কোনো প্রায়রিটি পেল না। আর যথা নিয়মেই মৃতদেহগুলোর সৎকার হয়ে গেল লাশঘর থেকে শ্মশানে।

সেদিন সভার পর অবশ্য সভা-ফেরত কিছু বশংবদ ভবনে গিয়ে কিছু নেতাকে বোঝালেন যে সভা তেমন জমে নি। বিশেষ করে প্রফুল্লদার ঘরে। অথচ কিছুদিন আগে গুলজারিলাল নন্দা হাইকম্যাণ্ডকে অগ্রাহ্য করে হয়তো বা ইন্দিরা গান্ধীরই পরামর্শে প্রদেশ কংগ্রেস এ্যাডহক করে দিয়েছিলেন প্রফুল্লদাকে দিয়ে। অতুল্যবাবুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জেহাদ। কিন্তু তা ধোপে টেঁকে নি। দিল্লীর সিণ্ডিকেটের চালে এ্যাডহক শিশুর আঁতুড় ঘরে মৃত্যু হলো। নন্দাজী আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়ে গেলেন সেই দুর্দিনে।

দেশের চারদিক দিয়ে একটার পর একটা এই ধরনের ঘটনায় একেবারে গোটা দেশের রাজনীতি ঘিরে উত্তেজনার চূড়ান্ত হলেও পশ্চিম বাঙলায় নিয়মের রাজত্বে অনিয়ম বেড়েই চলল। 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম,'

'যুক্তফ্রন্ট সরকার, সংগ্রামের হাতিয়ার', 'মন্ত্র মোদের সঞ্জীবন—বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি শ্লোগানের পরিণতি হলো আততায়ীর হাতে নিহত হবার সংবাদ, পুলিশী গুলিতে আর শরীকি সংঘর্ষে। গান্ধী কলোনীর সুধীর দাসগুপ্তরা কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না এই পরিবর্তন। তাঁদের চোখে ইন্দিরা গান্ধীদের এইসব আচরণ বিশৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

কলোনীর সব দিকে টুকটাক লাল মিছিল হলেও সুধীরবাবুদের অতীত দিনের সংরক্ষণশীল মন এই সব প্রগতির হাওয়াকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। আর পারলেন না বলেই যেটুকু তেরঙ্গা পতাকার সামান্য আয়োজন ছিল তাও নিমেষে হারিয়ে গেল। রামগড়, বাঘাযতীন, আনন্দগড়ে দিনের বেলাতেই কার্ফ্যু'র চেহারা সন্ধ্যাবেলায় নিষ্প্রদীপ। রাতের বেলা গণ-আদালতে বিচারের নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী শুরু হলো।

কৃষ্ণা গ্লাসের চিমনির ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছু মালিক শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা না দিয়ে পালাল। ব্যবসা গুটিয়ে নিতে চাইল কোলকাতা থেকে বাঙ্গালোরে, অথবা গাজিয়াবাদ ফরিদাবাদ অঞ্চলে। এই অসহনীয় পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় তেইশ বছরের শাসন করা মোটা ও চিকন কংগ্রেসী নেতাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম সম্পদের হিসেবগুলো গোপন থাকল। খদ্দর পরে ভদ্দরলোকী চালচলনে ব্যস্ত তাঁদের কয়েকজন বিনা লজ্জায়। আরও এক ধাপ তাঁদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উনসত্তর-সত্তরের মাঝামাঝি জীবন আহুতি দিল বিমল-সুব্রতদের অনুগামীদের একাংশ।

॥ কুড়ি ॥

আজ পার্লামেণ্টে দুপুরবেলায় ভোট।

সেই বিরাট পরীক্ষা। অনেক দিনের প্রতিশ্রুতি, প্রায় মরচে ধরে গেছে। রূপায়ণের শুরুতে দক্ষযজ্ঞ সিণ্ডিকেট বনাম ইন্দিরা। অর্ডিন্যান্স করে যা করা হয়েছে ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তাকে এবার সংসদে মানিয়ে নিতে হবে। এর সঙ্গে রয়েছে রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপের ব্যাপারটি। কয়েক দিন ধরেই এম-পিদের নর্থ এভিনিউ, সাউথ এভিনিউ, মীনাবাগ, ওয়েস্টার্ন কোর্টের অবস্থানে লবি চলছে জোর। কেউ বা রাজা মহারাজার পক্ষে কেউ বা বিরুদ্ধে। কেউ বা গণতন্ত্রের নিরামিষ জীবনযাত্রায় একটু স্বাদ বদলে মাংসাশী হবার জন্য দুদিকেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছু এ্যাডভান্সের জন্য চেষ্টা করছে। কেউ পেয়েছে, কেউ

পায় নি। এ সময়কার দিল্লীতে এত উত্তেজনা এর আগে দেখা যায় নি। এক-নং সফদর জং-এর বাড়িতে চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া, নন্দিনী, রঘুনাথ রেড্ডি, অর্জুন অরোরা, চন্দ্রজিৎ যাদব, কে. আর. গণেশদের ভীড়। সেই সংঘবদ্ধ নবীন সন্ন্যাসীরাই সিদ্ধপুরুষ সিণ্ডিকেটকে শেষ পর্যন্ত লেজে খেলিয়েছিলো। ভোটে হার হলো ইন্দিরার রাজ্যসভায়। পশ্চিবঙ্গের বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন কংগ্রেসী সংসদ এবং দেরী করে যাওয়ায় সি-পি-আই-এমের একজন সদস্যের ভোট না পড়ায় সর্বনাশ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু ইন্দিরা হারতে চান না; তাঁর পরামর্শদাতার তালিকায় বর্ষীয়ানদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ডি. পি. মিশ্র, বিহারের জগজীবন রাম, আসামের ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, নবীনদের মধ্যে নবীন সন্ন্যাসীর দল। এ ছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত দেখেছেন বম্বের চৌপটি, শিবাজী পার্কে—কলকাতার ব্রিগেডে, মাদ্রাজের বীচে—সর্বত্র।

ওদিকে সময়ের কাঁটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে রাষ্ট্রপতি ভবনের কর্ণধার। পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হলো। আবার নতুন করে সংসদের নির্বাচন। সংখ্যা গরিষ্ঠতা দুই-তৃতীয়াংশ না হলে সংবিধান সংশোধন হবে না এবং তা না হলে দারিদ্র্যের শেকল ভাঙা যাচ্ছে না—এই যুক্তিতে নির্বাচন ঘোষণা হলো। ঝড় এখানেই থামল না। এর পর অর্থদপ্তর থেকে বিতাড়িত হলো মোরারজী দেশাই। তারকেশ্বরী, রামসুভগ সিং, নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, পাতিল প্রমুখেরা জোট বাঁধলেন ইন্দিরাকে তাড়াতে। অপর দিকের শিবিরেও তৎপরতা তীব্র। তাঁরা চাইলেন ওদের তাড়াতে। দিল্লীতে রিকুইজেশন এ-আই-সি-সি বসল। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী পতাকা তুললেন, সুব্রহ্মনিয়াম অস্থায়ী সভাপতি হলেন। নতুন আর একটা কংগ্রেস জন্ম নিল। শুরু হলো নব ইতিহাস। জাতীয় অধিবেশন ডাকা হলো ডিসেম্বরে বোম্বাইতে। ক্রান্তি লগ্নের এই মুহূর্তে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটে সব কটি বামপন্থী দল একযোগে সাহায্য করেছিল ইন্দিরাকে। প্রথমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাহায্য, দ্বিতীয়তঃ সংবিধান সংশোধনী বিলে সমর্থন। ইতিহাসের কয়েকটি পাতা অমলিন রইল সত্যের ও বিচারের মাপ কাঠিতে।

দৃশ্যান্তরে পশ্চিমবাঙলা তখন ধুঁকছে। মৃত্যু এখানে স্বাভাবিক জীবনে রোজকার পরিণতি। হিংসা এখানে সামাজিক আচারের রূপ নিতে শুরু করল বিনা বাক্যব্যয়ে। বিচার এখানে প্রহসনে রূপান্তরিত হলো কয়েকজনের দাপটে ও ঔদ্ধত্যে! নিষ্ক্রীয় পুলিশ, সক্রিয় খুনী, ভীত সন্ত্রস্ত নাগরিক আর

অজয়বাবুর বাঙলা কংগ্রেস-এর বিলম্বে চেতনার বহিঃপ্রকাশে আবহাওয়া জটিল রূপ নিল। সুশীলবাবু আর অজয়বাবু হিংসার বিরুদ্ধে এমন বিবৃতি দিতে শুরু করলেন যে মনে হলো—এঁরা সবাই না জেনেই এখানে এসেছিলেন অথবা রত্নাকরদের বাল্মীকি বানাবার তাগাদা নিয়ে এসেছিলেন। সরকার বনাম বেসরকারী রাজনীতিকদের এই সংঘর্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, কিন্তু বীভৎস ভাবে সেদিন বাঙলার যৌবন হারিয়ে গেল ভেবরা, গোপীবল্লভপুর, শান্তিপুর, কাঁকসা, যাদবপুর, গড়িয়া, দক্ষিণেশ্বর, বেলঘরিয়া, হাওড়ার এখানে ওখানে। নকশাল-বাড়ীর নামে কখনও স্বনামে কখনও বেনামে কোথাও যথার্থ রাজনৈতিক ইচ্ছায়, কোথাও বা সমাজবিরোধীদের উসকানিতে যথেচ্ছাচারের দাপটে প্রাণ গেল অনেক।

দমন ও শায়েস্তার নামে এক অদ্ভুত রীতি চালু হলো, পরিভাষায় পুলিশ যার নাম দিয়েছে 'এন-কাউণ্টার'। দরিদ্র কনস্টেবল খুন হওয়াতে বিচলিত পুলিশ ব্যারাকের সবাইকে থামাতে বা শান্ত করতে আসল অপরাধীকে খুঁজে না পেয়ে নিরপরাধকে এন-কাউণ্টারের ঘেরাটোপে গুলি করা হয়েছে অনেক।

সেদিন শহীদনগরের ঝিল রোডের ঘোষদস্তিদারের বউ এসেছিল সুমিত্রার বাড়িতে। সুমিত্রা তখন সবে বের হবে ঠিক করেছে। এমন সময়ে এসে কেঁদে পড়ল, 'কাল বিকেল থেকে আমার ছেলেকে আর পাচ্ছি না মা।'

—সে কি! কোথায় গেছে! আপনি এখানে কেমন করে এলেন?

রতনবাবু পড়াতো আমার বড় ছেলেকে, সেখানে আপনার নাম শুনেছি। আপনি ভাললোক। দয়ালু।

—রতন মানে, গান্ধী কলোনীর রতন? সে তো বোধ হয় নকশাল আন্দোলনে নাম লিখিয়েছে।

—তা হবে মা। আমার বড় ছেলেটিও তার সাথে যে কোথায় গেছে আজও ফেরে নি। দু' মাস হয়ে গেল। ছোট ছেলেটি ছিল। তাকেও আর পাচ্ছি না। পাড়ার লোক বলছে পুলিশ নিয়ে গেছে!

কসবা থানায় ফোন করে সুমিত্রা যা জানতে পারল সে কথা কেমন করে বোঝাবে এই শহীদনগরের মাকে। এন-কাউণ্টারে নাকি প্রাণ হারিয়েছে ছেলেটি। অথচ এর মা বলছে ছেলেটি নিরীহ! তাহলে ব্যাপারটি কি?

ওর মাকে তখনকার মত বিদেয় করে এই নিদারুণ সন্তান-মৃত্যু-যন্ত্রণাকে চাপা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না সুমিত্রা। দুপুরে ওর দাদাকে আর বিমলকে সব খুলে বলল সুমিত্রা। সব শেষে যা হদিশ পাওয়া গেল তাতে

বোঝা গেল পুলিশের এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তের অত্যাচারে ছেলেটি প্রাণ হারিয়েছে। দাদাকে খোঁজবার নাম করে ওর ভাইকে জোর করে জেরা করতে এনে যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছে তাতেই প্রাণ হারিয়েছে ছেলেটি। রেকর্ড হলো "এন-কাউণ্টার ডেথ।"

এসব দিকে নজর দেবার সময় নেই রাজনীতিবিদ্‌দের। তাঁরা রাইটার্সে দাবার ছক নিয়ে ব্যস্ত মন্ত্রী আর ঘোড়া পাল্টিয়ে বাজী মাৎ করতে।

কিন্তু রাজা শেষকালে নিজে চলে গিয়েই খেলা ভেঙে দিল।

১৯৭০ সালের ১৬ই এপ্রিল যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে গেল, তাসের ঘরের মত ছিটকে পড়ল এখানে ওখানে। সেদিন কোলকাতায় সি-আর-পির অভিষেক হলো। বাঙলার গণতন্ত্রের দেবদেউলে কালনাগেরা ঢুকে পড়ল। বিষের জ্বালায় অস্থির হলো বাঙলার শহর ও গ্রাম।

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পরেও মাস দুই তিন চলল ভয়াবহ হাঙ্গামা, খুন, সন্ত্রাস। সাঁইবাড়িতে নেমে এল রক্তনদীর বন্যা। ভাল অথবা মন্দ, সমাজসেবী অথবা সমাজবিরোধী যাই হোক না কেন, বোধ হয় এই প্রথম মায়ের সামনে পুত্রের রক্ত দিয়ে আলপনা দেওয়া হলো আঙ্গিনায়।

কমিশন আর আদালতের রায় যাই হোক না কেন—একটা মা যে তার পুত্রকে তারই সামনে বলি হতে দেখল এই ভয়াবহ বীভৎস স্মৃতির কারাগার থেকে কোন দিন কি সাঁইদের মাকে আর মুক্তি দেওয়া যাবে। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত হলেন তারা বাঙলা ভাষায় 'অনুতাপ' নামক শব্দটির সন্ধান না করতে পারায় পরিতৃপ্তির দম্ভে সমান দর্প নিয়ে রইলেন।

শহীদনগরের দস্তিদারের মা, সাঁইবাড়ির মা আর বাঙলার গ্রামে গঞ্জে এমনি অনেক মা এমনি করে কেউ পুলিশকে, কেউ রাজনৈতিক দলকে, কেউ বা সমাজবিরোধীকে পুত্রহন্তার পাতক বলে দায়ী করেও এক রাত ঘুমুতে পেলেন না। স্বাধীনতার স্বাদ তো পানসে ছিলই—এবার গণতন্ত্রের স্বাদ হলো বিষাক্ত। বাকি রইল কি? কয়েকটা মিছিল আর সাংবাদিকের প্রতিবেদন ছাড়া তো কিছু নয়। ডি-আই-জি, আই-বি রঞ্জিত গুপ্ত, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সি-পি-আই (এম)-এর হরেকৃষ্ণ কোঙার—এদের রোজনামচায় সেদিন কি লেখা হতো জানতে ভীষণ ইচ্ছা করে।

সুমিত্রার দাদার উপরে ইতিমধ্যে পুলিশ থেকে খবর এসেছে সাবধান হবার জন্য। এস-বি-র লোকেরাই এখন মেইন টার্গেট। ও-সি. প্রোটেকশান রামবাবুর টাক মাথাটা তো প্রায় স্কেচ করেই ফেলেছিল সন্ত্রাসবাদীরা।

সুমিত্রার বৌদিরও ভয় বেড়েছে আজকাল। একটু রাত হলেই চিন্তায় ভেঙে পড়ে।
সুমিত্রার দাদা অবিশ্যি এর জন্য অশান্তিও ভোগ করে বাড়িতে। সবটাই সুমিত্রা বুঝতে পারে কিন্তু বলার কিছুই নেই।
বাঁচতে চাইছে বিমলরা পুরানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেরে। বাঁচাতে চাইছে রতনরা সর্বহারাদের। বাঁচাবার সংগ্রামে পরাস্ত যুক্তফ্রন্ট। বাঁচার খেলায় গোঁজামিল ছিল সুশীল ধাড়াদের বাঙলা কংগ্রেসে। বাঁচাবার জন্য প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ কেন্দ্রে কংগ্রেসের এক শ্রেণীর নেতাদের লোভ আর লালসার মুখোসটা খুলে পড়েছে। এমনি সব নানান্ সর্বনাশের খেলায় কোথাও কোন বেদনা নেই। সবারই শেষ করে দেবার এবং শেষ হয়ে যাবার গতি দুর্বার।
কেউ সেখানে বাধা মানে না। মানে না পুলিশ, তাই সে. এন-কাউণ্টারের নামে নিরপরাধ ঘোষদস্তিদারের ছোট্ট কচি কল্জেটার কাজ বন্ধ করে দেয়। মানে না হরেকৃষ্ণবাবু, তাই সাঁইবাড়িতে অভিযানের শেষ কথা লেখা হয় না।
মানে না দিল্লীর বাদশাহী সভ্যতার নির্মম অভিশাপের সাক্ষী কংগ্রেসের কয়েকজন মন্ত্রী। সামান্য সংবিধান সংশোধনের জন্যও তাদের মন সায় দেয় না। এ তো তাদের পিছুটান—কালো জগতের কালো টাকার কালো মানুষগুলোর প্রতি।
কালো কামরাজও এ ব্যাপারে চুপ করে রইলেন।

॥ একুশ ॥

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যে স্বাধীনতার উৎসব আর জমল না। নিয়মমাফিক সভায় কিছুটা স্বাধীনতা আনার একচেটিয়া ক্রেডিটটা নির্লজ্জ মিথ্যেবাদীর মত কিছু মূর্খ অর্বাচীন কংগ্রেসী নেতা কয়েক হাজার লোককে শুনিয়ে দিল। প্রস্তাবনা ও ভনিতা সেরেই শেষে শুরু হল কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্যে কয়েক শো বস্তা পচা গালাগাল আর মোরারজীর বিরুদ্ধে কিছু গরম মচমচে মন্তব্য। দায়িত্ব শেষ। বম্বে কংগ্রেসে সুমিত্রাকে জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল বিমলরা এ-আই-সি-সি দেখাতে। তখনো মেরিন ড্রাইভের কাছে এয়ার ইণ্ডিয়া বিল্ডিংটা নরিম্যান পয়েণ্ট তখনও শেষ হয়নি। সেখানেই ডেলিগেটরা থাকবে।

সেখানেই সব থাকার ব্যবস্থা ছিল বাংলার ছেলেমেয়েদের। হাজার হাজার মানুষ। জনসমুদ্র যেন। দরিদ্র মানুষও এসেছে মেলা দেখবার মত। আজাদ ময়দানে তিল ধারণের জায়গা নেই। গরীবি হঠাবার জন্য সে কি তৎপরতা। সমাজবাদের দশ দফা কর্মসূচীর ক্যাপসুল নিয়ে কি প্রচণ্ড উত্তেজনা। জগজীবন রাম সভাপতি হলেন। সুমিত্রা ওকে একটা গোলাপ ফুল দিয়েছিল।

বাবুজী বললেন, 'ইয়ে পণ্ডিতজীকা পেয়ারা থা।'

লাল গোলাপের সঙ্গে বিপ্লবের যদি একটু সাদৃশ্য খুঁজতেন পণ্ডিত জওহরলাল তাহলে আজকে হয়তো আজাদ ময়দান পর্যন্ত চার্চগেটের তামাসা "ইন্দিরা আয়ি হ্যায়, তাই রৌসনী আয়ী হ্যায়" শ্লোগান আর গরীবি হাটাও-র নূতন শপথ শুনতে স্বাধীনতার তেইশ বছর বাদে চোরাকারবারীর মহাতীর্থ বোম্বাই কংগ্রেস থেকে প্রেরণা পেয়েছিল বাঙলার সব ছেলেমেয়ে। সুমিত্রার উৎসাহ একটু বেশী হয়েছিল। যা হোক তাহলে আমাদের কেউ চোর চোর করে উপহাস করবে না। ট্রেনে আসতে আসতে বলছিল বিমলকে।

সেটা তো বড় কথা নয় সুমিত্রা। আসল কথা হল আমাদের এই কথার সঙ্গে কাজের মিল হবে কি? এই সন্দেহের বীজটাই বেশী করে বাসা বেঁধেছিল বিমলের মনে।

সুব্রত বলেছিল—তা কেন হবে না। বারে বারে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কোথায়?

তুমি সবাইকে এখনও চেন না সুব্রত। আমাদের দেশের রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে পরিষদীয় গণতন্ত্রে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন কথাটা এত বড় একটা মিথ্যেতে পরিণত হয়েছে যে যারা ওটা বলে তারাও জেনে নিয়েই বলে যে তারা একটা মিথ্যে বলছেন। অথচ বলা চাই। তা না হলে প্রগতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না—কেন না সেটাই গণদাবী।

কলকাতার দেওয়ালে নূতন লেখা পড়ল নকশালদের—"সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন।"

কার মুক্তি এবং কেমন করে মুক্তি তার দু'একটা নমুনা যা শুরু হয়েছিল পুলিশ মারার মধ্য দিয়ে, তাতে বোঝা যাচ্ছিল শেষ দিন বড় ভয়ঙ্কর এবং তার আর বেশী দেরী নেই।

তারকেশ্বরে ছাত্র সম্মেলন ডেকেছে হুগলী জেলার পক্ষে বলাই। সভ্যরা ছেড়ে গেছে মোরারজীর দিকে। এখন মহাজাতি সদনের সবাইকেই কাজের জন্য মাঝে

মধ্যে দু'নম্বর হাজী মহসীন রোডের কালীপদ মুখার্জি স্মৃতি ভবনে আসতে হয়। সেখানে থাকেন বিজয়দা ও শুক্লদা। ও বাড়িতে বা প্রাসাদে থাকেন প্রফুল্লদা, বঙ্কুবাবু. প্রতাপবাবু, আভা মাইতিরা। সেই একান্নবর্তী পরিবারের বিরাট উঠোনের মাঝে হঠাৎ একদিন দেওয়াল উঠল পার্টিশনের মত। কারো মুখ দেখাদেখি নেই। সুন্দর নামও করেছিল আনন্দবাজার—আদি কংগ্রেস, নব কংগ্রেস। যুবক ও প্রৌঢ়দের অনেকেই আদর্শ, আবেগ ও উৎসাহের তাগাদায় এই ভাগাভাগিতে আনন্দ ও প্রেরণা দুইই পেয়েছিল। কিন্তু বয়স্কদের অনেকেই ছিলেন বিষণ্ণ। তাই জলপাইগুড়িতে বরেনদাকে পাওয়া গেলেও খগেনদা ও রবিদাকে পাওয়া গেল না। দার্জিলিং-এ স্যানিয়েলকে পাওয়া গেল না। কুচবিহারে বিশুদাকে পাওয়া গেল না। সন্তোষদা চুপ করে রইলেন। পশ্চিম দিনাজপুরে শ্যামবাবু, মোহিতবাবু ও ব্যোমকেশদা এবং মহারাজাদাকে পাওয়া গেল না। মালদহে চিত্ত মৈত্র, সরুদাকে পাওয়া গেল না। মুর্শিদাবাদের কিংবদন্তী দুর্গাদাকে পাওয়া গেল না। নদীয়ার কল্লুদা, শিবশঙ্করদের পাওয়া গেল না। ২৪-পরগণায় রাজা পেলাম অর্থাৎ তরুণবাবুকে। কিন্তু রাজত্ব পাওয়া গেল না। তা রইল হংসধ্বজবাবুর সঙ্গে। হাওড়ায় বিশ্বরতনবাবু, বিজয়ানন্দবাবুর থেকে এক ইঞ্চি জমি পাওয়া গেল না। হুগলীর সাধকপুরুষ শঙ্করীদাকে পাওয়া গেল না। বর্ধমানে নারায়ণদা চুপ করে রইলেন। বীরভূমের বৈদ্যনাথবাবুরা প্রফুল্লদার সঙ্গে রয়ে গেলেন। কোলকাতার উত্তরে অপরেশবাবু, মধ্যতে প্রতাপবাবু এবং দক্ষিণের পঞ্চাননবাবু, বিভাদি, বিশ্বনাথবাবুরা সব আদিতে রয়ে গেলেন।

হয়তো বাজার ভাল বুঝেই বড়বাজারের সব নবতে চলে এলো।

আদি নবর এই মহারঙ্গে যাত্রাভঙ্গ হল অনেকের। সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা এলো বিমলদের ঘরে। রোজকার হাঙ্গামায় গ্রাম, শহর চারদিক থেকে যে তাণ্ডব সেখানে কে কাকে কেবল বাছাই করবে কুলকিনারা করতে পারল না। কেননা সবাই যে সমান ভাবে আহত।

পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল, দুটো জোতদার, একজন সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়ে সত্তরের দশক যখন বিবেকানন্দ স্ট্যাচু থেকে রামমোহন বিদ্যাসাগরকে রেহাই দিচ্ছে না তখনও বাংলার বুদ্ধিজীবিরা নীরব। ভয় ও ত্রাস বিপ্লবের বা আদি বিপ্লবের তাড়নায় তাদেরকে পঙ্গু করে ফেলেছে। সেই অবস্থায় সন্ধ্যেগুলোতে গা ঢাকা দিয়ে পড়বার দিনে বসিরহাট, বিষ্ণুপুর, মঙ্গলকোট,

হাবরা, উত্তর বাংলা, বর্ধমান, যাদবপুর করেছে বিমল-সুব্রত-সুমিত্রার দলবল। কখনো একই ট্রেনে বা একই বাসে মুক্তির দশকদের সাথীদের সাথে দেখা হয়েছে। পরিচিত সহপাঠি সব। এক ডালের অনেকগুলো মুকুল। কেউ বা ফুল ফোটাবার খেলায় মত্ত কেউ বা ফুল হবার আগেই ঝরে যেতে চায়। কেউ কারো কথা পুলিশকে বা প্রাণ নিতে পারে এমন শত্রুকে বলেনি। কেমন যেন একটা যন্ত্রণার আত্মীয়তার মত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের।

এমনই একজন ছিল রঞ্জনা। সুমিত্রাদের এক ক্লাস নীচে পড়ত? চুপচাপ ছিমছাম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাবটা এমন—ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অথচ তাকেই একদিন দেখা গেল শ্রীরামপুরের স্টেশনে লিফলেট দিতে মুক্তির দশকের প্রত্যাশায়।

তারকেশ্বরের সম্মেলন সেরে বিমলরা ফিরছিল কোলকাতা। পিনাকীদের তাগাদায় বেশ কিছুক্ষণ শ্রীরামপুর অফিসে থাকতে হল তার পর কোলকাতা যাবার ট্রেন। যাবার সময় কোন্নগর কলেজের রাধা হিসাব দিল মোট নিহতদের খতিয়ান কত। সবটা মিলিয়ে সাতজন ছাত্র ও যুবক পাওয়া গেল। এর মধ্যেও সেই 'এন-কাউণ্টারের একজন'।

শ্রীরামপুর লোকাল আসতে মিনিট পাঁচেক দেরী। এমন সময়ে স্টেশনের বেঞ্চে বসে সুমিত্রাই দেখাল বিমলকে।—ঐ মেয়েটাকে দেখেছ বিমলদা কখনও? সে তখনও বেশ দূরে কেবিন রুমের কাছে দাঁড়িয়ে কি সব যেন বিলি করছে।

পিনাকী বললে, ও হল এখানকার 'এম-এল' গ্রুপের লীডার।

একটু দেখে নিয়ে বিমল বলল, চিনিনা—

সুমিত্রা বললে, আমি চিনি, ওর নাম রঞ্জনা। আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়ত। কিন্তু কি আশ্চর্য, ও যে রাজনীতি করে এতো জানতুম না। বিপ্লবীদের কোথাও কোথাও গোপনীয়তাই বোধ হয় একটা বড় আর্ট তাই না পিনাকী?

হাসল পিনাকী। পাশেই বসেছিল আর একজন প্যাসেঞ্জার। সে ভদ্রলোক শ্রীরামপুরেরই লোক। কোলকাতা যাবেন হয়তো কোন কাজে। তিনি বললেন, ওই মেয়েটির কথা বলছেন?

বিমল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওর বাবা প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে বছর ছয়েক আগে। খুব নাম

করা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল। ওর বাবার মাথা নিতে ইংরেজ টাকা ঘোষণা করেছিল। ওর দাদা ছিল হিন্দ মোটরে। বোনাসের ব্যাপারে ইউনিয়ন বিড়লার সঙ্গে রফা করার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে ইউনিয়নের লোকেরা মেরে ফেলেছিল। মেয়েটি পরোপকারী, মেধাবী। টিউশনি করে, সামান্য বোধ হয় বাড়ি ভাড়া পায়। কলকাতায় পড়ে। ইদানিং দেখছি এ সব পার্টি করছে।

বিমল বেশ খুশিই হল বিবরণ শুনে।

সুমিত্রা বললে, কি স্যাড লাইক, না?

বিমল বলল, এমন মেয়ে বাঙলাদেশে প্রতি একশতে কুড়ি জন করে পাবে।

তাহলে তারা সবাই একত্রিত হলেই তো একটা আগুন জ্বলে উঠতে পারে, তাই না? সুমিত্রা বললে।

প্রথম বাধা এক হবার। দ্বিতীয় বাধা এক ভাষা, এক কথা, এক শ্লোগানের। তৃতীয় বাধা এক নেতা ও এক পথের সুমিত্রা। বিমল বলল।

তাহলে বিমলদা, আমরা সবাই যা হোক লক্ষ্যহীন, পথহীন, নেতাহীন, আদর্শহীন কতগুলো উল্কার মত ছুটছি, কি বল? সুমিত্রা প্রশ্ন করল ট্রেন ছাড়তেই। ভীড় নেই। লাষ্ট ট্রেন।

না ঠিক তা নয় সুমিত্রা। তবে ঠিক যা চাই তা পাবার জন্যই যে এই পথে সবাই নেমেছি তা মনে হচ্ছে না। তবুও কোথায় একটা কিছু সামান্য ভাল করার পরিতৃপ্তির অহংকারটুকুর জন্য সবাই ছটফট করছি। আমি আমার কায়দায়, অন্য কেউ অন্য কায়দায়। বিমল বলল।

এই ধরনের উত্তর আর কয়েকটা শুনলে সব দল ছেড়ে পালাবে বিমলদা। একটু রেখে ঢেকে বল। সুব্রত বলল।

রাখা ঢাকার কিছু নেই। আসলে দেখ আমরা সব সময়েই একটা বাধার বিরুদ্ধে লড়ি। যেই বাধার পাথরটা সরে যায় আবার পথ চলি এবং ভাবটা এমন করি যেন আর কোন পাথর পথে থাকতে পারে না—সেটাই আমাদের অজ্ঞানতা বা মূর্খতা। সেজন্যেই সেই সাময়িক জয়টা নিয়ে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করে উঠি। আসলে আমরা তাই করছি কিনা বল? বিমল বলল।

সুব্রত ততক্ষণে জানলায় মাথা রেখে বাইরের হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। হাওড়া স্টেশনে এসে দেখে বাসও নেই, ট্যাক্সিও নেই। কোথায় কোন্ ট্যাক্সি ড্রাইভার ছুরিতে প্রাণ হারিয়েছে সে জন্য ধর্মঘট। সমবেদনা জানাতে রুটের

ট্রাম বাসও উঠে গেছে এই রাত্রে। অনেকেই পায়ে হেঁটে ডেরায় পৌঁছবে। কিন্তু এতটা পথ হেঁটে সুমিত্রাকে নিয়ে সাউথে যাওয়া তো কম বিপদ নয়। সুমিত্রা আঁচ করতে পারল বিমলের দুশ্চিন্তার কারণটা। বলল, আমার কলেজ স্ট্রীটের কেশব সেন স্ট্রীট জংসনে পৌঁছে দিন। আমার পিসীমা থাকেন। সেখানেই থেকে যাব রাতে। বাড়িতে ফোন করে দিলেই হবে।

খুব সম্ভব শম্ভু মিত্রের বহুরূপীর একটা কোন সাড়া জাগানো নাটক হচ্ছিল নিউ এম্পায়ারে। সুমিত্রা অনেক দিন আগে থেকেই টিকিট কেটে রেখেছিল। বিমল কি একটা কাজে আটকে থাকায় আসতে পারল না, সুব্রত যখন এলো তখন নাটক প্রায় শুরু হতে চলেছে। রোববারের সকাল দশটা।

সুব্রতকে নামিয়ে দিয়ে গেল ট্যাক্সি থেকে মনোজ আর মন্দিরা। মনোজ-মন্দিরার প্রেম আর বিরহের সাক্ষী অনেক সময় বিমল হয়েছে। মনোজের উদ্দাম গতি, ছটফটে স্বভাব আর বেশ দায়িত্ব নিয়ে হৈ চৈ করার একটা স্বভাব ছিল ইসলামিক হিষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে। মন্দিরার কেমন যেন ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। মালদার মনিরুজ্জমান মনোজের এই প্রেমে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ জুগিয়েছিল। মনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের চোখের মণি। মনোজ-মন্দিরার সঙ্গে সুমিত্রার পরিচয় করিয়ে দিল ট্যাক্সি থেকে নেমে সুব্রত। ওরা চলে গেলে ওদের বাকী ইতিহাস জানাল সুমিত্রাকে। সুমিত্রা শুনছে আর ঘড়ি দেখছে বিমলের জন্য। বিমল এ সব ব্যাপারে একটু ননসিরিয়াস বা আন-পাংচুয়াল ছিল। খেতে যাবে বলে না খাওয়া বা ভুলে যাওয়া, ছবি দেখব বলে না দেখতে যাওয়া, এ সব অনিয়মের দোষ বিমলের অনেক দিনের। ইচ্ছাকৃত নয়, কেমন যেন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুব্রতই শেষ পর্যন্ত সুমিত্রাকে টিকিট বিক্রি করতে বললে। বললে, বিমলদা আজ আর আসবে না চল, ভেতরে যাই।

তৃপ্তি মিত্রের 'রক্তকরবী'র অভিনয়ে যখন সুমিত্রা একেবারে হারিয়ে গেছে অন্য ভুবনে তখন হঠাৎ সামনের আসনের দাড়িওয়ালা ছেলেটিকে দেখে চমকে উঠল সুমিত্রা। সামনেই বসে আছে গান্ধী কলোনীর সুধীরবাবুর ছেলে রতন। রতন তখন ফেরার আসামী। পুলিশ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে আর ও সুমিত্রার সামনে বসে অন্ধকারে দিব্যি নাটক দেখছে।

বিরতির দু'মিনিট আগে সুমিত্রাই বলে বসল সুব্রতকে—একটু বাইরে গিয়ে দেখবে আমার দাদা এলো কিনা, ওর এ সময় আসবার কথা। সুব্রত বাইরে

যেতেই সামনের সিটের রতনকে আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে ডাকল। রতন চমকে উঠেছে। কোমরে হাত দিতেই যাচ্ছিল। সুমিত্রাকে দেখে সামলে নিল এবং বেশ একটু শান্ত হল। হলের বাতি জ্বালাবার আগেই আস্তে করে বলল সুমিত্রাকে। বিকেল পাঁচটায় আউটরাম ঘাটের কাছে থাকব, কথা আছে। রতন বেরিয়ে গেল, বোধ হয় গা ঢাকা দিতে চায় এক্ষুনি। কিন্তু তা হলে নাটক দেখতে এলো কেন? সুমিত্রার সঙ্গে সুব্রত আছে ভেবে হয়তো জানাজানি হবার ভয়েই চলে গেল। রতন বের হতেই সুব্রত এলো ভেতরে, তখন বিরতি চলছে। আলোগুলো সব জ্বলে উঠেছে।

রতনের চেহারাটাই বদলে গেছে ভীষণ। মুখ ভর্তি দাড়ি। চেহারাটাও কেমন রোগা হয়ে গেছে।

চোখের দীপ্তি এতটুকুও কমেনি। রতন এক সময় সুমিত্রার কাছে পয়সা চেয়েছিল, সে অনেক দিনের কথা। তারপর আর যোগাযোগ হয় নি। গান্ধী কলোনীর দিকে আজকাল আর সন্ধ্যার পর যাওয়া যায় না। রোজই টালিগঞ্জের দিকে হামলা হাঙ্গামা লেগে আছে। সুধীরবাবু কেমন আছেন কে জানে। সুমিত্রাও নানান কাজের স্রোতে হারিয়ে গেছে। সময় করে উঠতে পারেনি সুধীর-বাবুদের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার। কিন্তু রতন হঠাৎ ওকে দেখা করতে বললে কেন? যাবে না কি দেখা করতে? শেষ পর্যন্ত যদি কিছু হয়? সুমিত্রার নিজের জন্য অত ভয় নেই। ভয় হয় ওর দাদাকে নিয়ে। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসারের বোনের সঙ্গে নকশাল নেতার যোগাযোগ আছে এ খবর উপরওয়ালারা জানলেও খারাপ। তবুও ঠিক করলে সুমিত্রা যে রতনের সঙ্গে দেখা করবেই। সেদিন অবশ্য আর কোন কাজ ছিল না। শো শেষ করে বেরিয়ে আসতেই সুব্রত ওর হাতে একটা বাঙলা সাপ্তাহিক তুলে দিল—রমা মিত্রর সঙ্গে কংগ্রেসের নাম করা দু-একজন নেতার কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর কাহিনী।

সুমিত্রা বললে, এ গুলো নিয়ে কেস করলে না কেন?

সুব্রত বললে, সাহস নেই বলে।

আসলে সাহস না থাকা মেরুদণ্ডহীন এবং চরিত্রহীন এই ধরনের একাধিক দাম্ভিক নায়কদের আবির্ভাব কম বেশী সব দলেই আছে। বিশালতা ও ব্যাপ্তির জন্য কংগ্রেসেরটা চোখে পড়ে বেশী। একদিন এই ধরনের একটা বিষয়েই কফি হাউসে বিমলের পাশের চেয়ারে বসে অরিন্দম বলছিল, আসলে নৈতিক ব্যাপারটা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি কর তোমরা, পলিটিক্সের মরালিটি হল পলিটিক্যাল

মরালিটি। অর্থাৎ সে রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ সম্বন্ধে সচেতন এবং তার আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন কিনা।

অরিন্দমের কাকা কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী। লীলা খেলায় তিনি ক্লাইভের রেকর্ডকেও ম্লান করেছিলেন। অরিন্দম বোধহয় সেই দিকটা গার্ড করেই এ সব পলিটিক্যাল মরালিটির কথা বলছে। অনুমান করল বিমল। তবুও অরিন্দমকে শোনাতে ছাড়ল না বিমল।

তোমার পলিটিক্যাল মরালিটির কথা ছাড়, এটা ভারতবর্ষ, লণ্ডন বা আমেরিকা নয়। এখানে নৈতিক দিকটা মানে প্রাইভেট ও পাবলিক লাইফ এক রকম কিনা সেইটাই দেখতে চায় মানুষ, সে জন্যই গান্ধী, সুভাষ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধুর নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়েছিল দেশ।

বাঃ, খুব চমৎকার কনজারভেটিভ জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলেছিস তো বিমল। দেশটা পাল্টে যাচ্ছে, আর তোরা ট্রাডিশনাল রয়ে গেলি।

রমা মিত্রের ব্যাপারটা নিয়ে উচ্চবাচ্য বেশী হল না। কারণ দলের হাই আপস্‌দের সঙ্গে কোথাও লিঙ্ক আছে জেনে দু-একটা সাপ্তাহিকের গরম খবরের মত চানাচুর হয়ে গেল এখানে। ওখানে ছেষট্টির শেষ থেকে সত্তরের শেষ পর্যন্ত বারুদ, বন্দুক, ছুরি, বল্লমের খেলার যখনও সমাপ্তি ঘোষণা হয়নি তখন রাজনীতির মঞ্চে আদর্শের ব্যাভিচারে ভরে গেল গোটা বাংলা। ওপারে পূর্ব-পাকিস্তানে ছ'দফা দাবীর আন্দোলনে ছাত্র লীগের সংগ্রামে শেখ-মুজিবর রহমান আর আওয়ামী লীগের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত হলেও নানা খবর রাজশাহী বগুড়ার ধান ক্ষেতের সীমা পেরিয়ে এদিকে আসছে। তবে সব কিছুই ছাপা হচ্ছে না। ঢাকার জঙ্গীশাহীরাও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এবার সাম্প্রদায়িক উসকানি, 'পাকিস্তান বা ইসলাম খতরা মে হ্যায়' এ সব জিগির তুলে আন্দোলন দমানো যাচ্ছে না। কারণ যারা লড়ছে ওপারে তারা সবাই হিন্দু-মুসলমান সংঘবদ্ধ ভাবেই লড়ছে। পাশের রাজ্যে এত বড় একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দীনেশ সিং আদৌ আঁচ করতে পারছে কিনা সন্দেহ। আর পশ্চিম বাঙলার তো কোন কথাই নেই। কার হাতে পরবর্তী সরকার আসবে তার চিন্তাতেই ব্যস্ত। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল, বি. বি. ঘোষেরা শক্তিমান হলেন। তাঁদের তখন আমলাশাহীর দেবতার সমান বরদান করার ক্ষমতা। একজন রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে হাফ-ডজন লোকের দরকার হল। যাঁদের নিযুক্ত করা হল তাঁদের পরামর্শ দেবার মত যোগ্যতা অথবা তাঁদেরকে আবার পরামর্শ দেবার কোন লোক আছে কিনা

এ সব খতিয়ে দেখা হলো না। সম্ভবত এই সময়টাতেই পোশাকি নাম বা ব্যাহারী নামের মত বেশ সুন্দর একটা ঢাকাই জামদানীর পাকা রঙের শক্ত বুনোটের কাপড়ের মতই চালু হল জমাট করা, জমাট শ্লোগান: 'সত্তরের দশক মুক্তির দশক।' পুলিশ ব্যারাকে যারা সরকারের হুকুম তামিল করে তাদের স্ত্রীদের কাছে অবশ্য সেটা পক্ষান্তরে মৃত্যুর দশক এবং মহাপুরুষ যারা স্বনামখ্যাত ইতিহাসে, তাদের কাছে সেটা অপমানের দশকে রূপান্তরিত। মাও-পত্নীর চরিত্র-চিত্রণের অধিকার ও সুযোগ না থাকলেও এবং ট্রটস্কির নৈতিক চরিত্র কত মহান ছিল সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও অনায়াসে বিদ্যাসাগরকে কনজারভেটিভ ও গান্ধীকে শূয়োরের বাচ্চা এবং বিবেকানন্দকে ভণ্ড বলে চালাবার সংগ্রাম জোরদার করতে এদের স্ট্যাচুগুলো যখন রেহাই পাচ্ছে না সেই সময়ই সুমিত্রার সঙ্গে রতনের দেখা হল।

আউটরাম ঘাটে সত্যিই কিন্তু চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল রতন। আসলে রতনকে চেনা পুলিসের পক্ষে খুব মুসকিল। কারণ রতনকে সভাসমিতি বা আন্দোলনের আগে দেখা যায়নি। ডেডিকেটেড আণ্ডার-গ্রাউণ্ড অপারেটর।

রতন বললে, ভয় পেয়েছ দেখে ?

সুমিত্রা: তাহলে কি আসতুম ?

রতন বললে একটু এগিয়ে গিয়ে, আপত্তি না থাকলে নৌকো চাপতে পারি।

আমার কোন আপত্তি নেই। সুমিত্রা কোন দ্বিধা না করেই বললে।

রতন: ধর, তোমায় যদি এখন ধরে তোমার দাদার কাছে যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো বের করার চেষ্টা করি তাহলে কি হবে ?

সুমিত্রা: দাদার ফাইলগুলো পেলেই যদি তোমাদের রেভ্যুলশন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আপত্তি কি ?

রতন: শেষ পর্যন্ত এত লেখাপড়া শিখে কংগ্রেসে কাজ করছ ? অবশ্য তোমার দাদা পুলিশ, তখন সেই শ্রেণীকে তো তোমার ডিফেণ্ড করতে হবেই।

সুমিত্রা: তুমি তো হতাশার থেকে এ লাইনে এসেছ। শ্রেণী যন্ত্রণার তাগিদে তো নয়। হতাশার আগুনকে একটা আদর্শের অজুহাতে জ্বালাতে চাইছ, এ ছাড়া কি ? এন-ভি-এফ, কনস্টেবল খুন করে কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ছ ?

রতন: মূল শ্রেণী সংঘর্ষে শত্রু শ্রেণী এজেন্টদের খতম করা অন্যায় নয়।

মিত্রা: জানি। কিন্তু আমি যদি বলি শুধু নিরীহ এগুলোকে মেরে ভয়ের প্রচারটা দুর্দান্ত করে তোমরা একটা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী সেটাই জানাতে চাইছ— তাহলে কি ভুল বলা হবে ?

রতন : সেটা বুর্জোয়াদের প্রচার। যাকগে, তোমাকে যা বলার তা বলে নিই। আগামীকাল রাত্রে আমি কাকুলামের পথে রওনা হব। আমায় কিছু টাকা দিতে পার?

সুমিত্রা : আমার তো অত টাকা নেই রতন। তাছাড়া তুমি কি ওই পথ থেকে ফিরতে পারো না রতন?

রতন : না, সেটা হবে বিশ্বাসঘাতকতা। এর শেষ আমাকে দেখতেই হবে। যদি কিছু পারো তো আগামীকাল সেন্টপল্‌স ক্যাথিড্রালের গেটে ছুটোর সময়ে এসে দিয়ে যেও। আর পারলে তোমার রাজনীতি ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিও।

সুমিত্রা : মেসোমশাই মাসীমার কোন খবর নিলে না?

রতন : দেবার মত আমার কোন খবর নেই আর নেবার মত খবর কি বা থাকতে পারে। কিছু কষ্টের কথা ছাড়া।

সুমিত্রা : ওদের জন্ম কি কিছু করা তোমার দায়িত্ব নয়?

রতন : হয়তো আছে, কিন্তু আমি যা করতে চাই তার জন্ম এই ত্যাগগুলো আমার করতে হবে।

সুমিত্রা : ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

রতন : আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।

সুমিত্রা : শ্রী কাকুলামে গিয়েও যা হবে এখানে থেকেও তা হবে।

রতন : আসলে আমাদের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। যেখানেই অত্যাচার আর নিপীড়ন।

সুমিত্রা আর কথা বাড়ায় না। বেশ ভালই অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ির দিকে পা বাড়াতে বোধ হয় একটা ট্যাক্সির জন্যই সুমিত্রা এগিয়ে যায়। রতনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা বিমল-সুব্রতকে খুলে সবটা কোনদিনই বলেনি সুমিত্রা। সুমিত্রার বৌদি কিছুটা জানে। কিন্তু ওর দাদা জানে না। হঠাৎ অনেক দিন বাদে রতনের আবির্ভাব আর সেই সঙ্গে এই সব আলোচনা সুমিত্রাকে কেমন ভাবিয়ে তুলেছে।

বেশ জোর কদমেই নকশালবাড়ীর আন্দোলন জমে উঠেছে। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই ফাগুন দিনের আগুনের মত অনেক ছেলের মন রাঙিয়ে দিয়েছিল এই আন্দোলন। যারা এর শরিক হতে পারেনি তাদেরও কোথাও যেন যন্ত্রণা হচ্ছিল বিবেকে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এত বড় একটা ত্যাগ ও আত্মাহুতির সংকল্পে এই

প্রথম এই দেশে যখন লালঝাণ্ডা নিয়ে মার্কসবাদী লেলিনবাদী বলে (এম-এল) একদল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তাদের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় বা অন্তত তাদের নামেতে সম্ভ্রম জানানো তো দূরের কথা, একটা প্রচণ্ড ঘৃণা আর বৈরিতার মনোভাব গ্রহণ করল সি-পি-আই (এম) দল—এই সব নকশাল আন্দোলনের পর্ষদ এরা কংগ্রেসেরই চর এমন কথা বলতেও কসুর করলেন না। কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানার তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামী শরিক যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল তারা যদি শহীদ হতে পারে, তাহলে ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, কাকুলামে যারা প্রাণ হারাল তাদেরকে অন্তত বীর এবং শহীদ এই সম্মান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলেন ডাঙ্গে সাহেব, সুন্দরায়া প্রভৃতিরা। এ কথা বোঝবার শক্তি আজও কারও হয় নি। কায়দার কলে চালানো গণতন্ত্রের ক্ষমতা নামক মাংসাশী কোন লোভনীয় খাবারের স্বাদ পেলেই যে অন্য কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান যা নিয়মের শেকল ও প্রচলিত প্রথাকে ধ্বংস করবে তাকে যে হঠকারিতা বলতে হবে এ কথা এদেশের মানুষকে শিখিয়ে দিলেন এদেশের মার্কসবাদের দাবীদার আসল ভোট, জাল ভোট, কালো টাকা, সাদা টাকার গণতন্ত্রের অংশীদার কিছু বামপন্থীরাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও টেরারিস্ট আন্দোলনকে কংগ্রেসের একাংশ এই ভাবে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিল কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে ইতিহাসের পাতায় মহাত্মা গান্ধীর পাশে ভগৎ সিং ও ক্ষুদিরামের নাম রাখতেই হয়েছে।

রতনের মত অনেক ছেলে যখন সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে রূপান্তরিত করার কথা ভাবছে তখন দিল্লীর হোম-মিনিস্ট্রি, সি-আর-পির তাঁবু আর ইণ্টেলিজেন্সের ফাইল ও দু'একটি বামপন্থী কাগজ এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত না করার পথগুলো তৈরী করছে। চারু মজুমদার অবিসংবাদিত নেতা। শিলিগুড়ির চারুবাবুর সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ যারা সামাজিক জীবনে তাদের থেকে তার সঙ্গে অপরিচিত যারা তারা কিন্তু একটা প্রচণ্ড যুগসন্ধিক্ষণের আলোক-বর্তিকার মতই মনে করতে লাগল চারু মজুমদারকে। কেন যেন দেওয়ালের লিখনে কমরেড চারু মজুমদারের প্রাধান্য দিনকে দিন বিপ্লবের মূল কথাগুলোর থেকেও বেশী হয়ে পড়ছিল।

কংগ্রেসের ভাঙন পর্ব বা ভাঙার মধ্য দিয়ে গড়ার কাজ শুরু হতেই আস্তে আস্তে ঘুমন্ত নেতাগুলোর সম্বিৎ ফিরে আসতে লাগল। বাইরে তখন অনেক দলের অনেক ধ্বনি—"সামনে লড়াই জোট বাঁধ, তৈরী হও।" আর বেলডাঙ্গার অঞ্চল প্রধানের দাওয়ায় বসে কংগ্রেসের লুৎফল হকেরা ভাবছে—সামনে ভোট, তৈরী

হও। পুরোনো ভাঙা জীপগুলো গ্যারেজে মেরামত করতে দেওয়া, টাকা সংগ্রহ, তারপরে টিকিট পাবার জন্য লাইন বন্দোবস্ত ও নেতাদের তোষামোদ এসব কাজ এখনও বাকী। সব ধাপে ধাপে শুরু করতে হবে। অনেকদিন মন্ত্রীর পতাকা ওড়ানো গাড়ি আর রাজভবনের খানাপিনা নেই কংগ্রেসীদের। জীবনটা নিরামিষ হতে হতে স্বাধীনতার স্বাদটাও কেমন যেন তেতো হয়ে আসছিল। তাই 'এবার আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, হাতে হাতে ধর গো', সব ভেদাভেদ ভুলে আবার সবাই ভোটের জন্য এক হও। শোষণের আর এক নাম—ভোটের আগে রাম নাম-এর মত সবাই সব ভুলে গিয়ে বেশ এক হতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে কৈফিয়ৎ তুলে আর ব্যাগড়া দিতে ঝঞ্ঝাট করছিল বিমল-সুব্রতর সৈন্য সামন্তরা। ওরা বেশ ভয় পাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে এই সব ঝিমিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-থাকা পালিয়ে-যাওয়া মানুষগুলোর মধ্যে এত উৎসাহ দেখে।

অতুল্যবাবুদের ঝিলিমিলি, বড়বাবুর কংগ্রেস ভবন, হংসদার কাকদ্বীপের আশ্রম, প্রফুল্লদার আরামবাগ, প্রফুল্ল ঘোষের অভয় আশ্রম, সব কিছু যেন চঞ্চল হয়ে উঠল আপন গতিতে—কিন্তু শস্য হবে কি, ভাগাভাগির কংগ্রেসে যে অংশে ইন্দিরা গান্ধীর মালিকানা সেখানেই কিন্তু জমি ভাল থাকায় ফসলের সম্ভাবনা বেশী দেখা দিল। আগলে রেখেছে সেখানকার বাগান অশোক সেন, সিদ্ধার্থ রায় আর বিজয় সিং নাহার।

ভাগাভাগির হিসেব যখন ঠিক হতে চলেছে তখনও কিন্তু জেলা আর মহকুমার কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের ভিত অন্তত মৃত্যু আর অশান্তির বিরুদ্ধে প্রবল। সেই জন্যই তালতলার মানা, এন্টালির বাপি, কালীঘাটের বুলবুলরা মনের দিক থেকে এই ভাগ্যকে মেনে নিতে পারেনি।

সবচেয়ে মুষড়ে পড়েছিল হুগলীর মান্তু, জলপাইগুড়ির মুকুল, বেহালার সুবীর, মহিম হালদার স্ট্রীটের মণ্টু। তবুও যা হবার তাই হতে চলেছে। কে ঠেকাবে? ঢাক ঢোল পিটিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে গরীবি হাটাবার তোড়জোর শুরু হল ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জঙ্গল থেকে জানোয়ার তাড়াবার মত। কাড়া-নাকাড়ার শব্দের জোরে বিমল-সুব্রতদের সংগ্রামের ধ্বনি চাপা পড়ে গেল। ব্রিগেডে ইন্দিরা গান্ধী সভা করতে এলেন। এবার একেবারে নূতন সত্ত্বায় সিংহ বাহিনীর মত এক দুর্জয় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এলেন শ্রীমতী গান্ধী। সত্যিই এক পরিবর্তনের যুগের দূত অথবা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত মনে হচ্ছিল।

জেনে কি না জেনে জানি না সেই ব্রিগেডের মঞ্চে শ্লোগান হল—ইন্দিরা-

মুজিবর জিন্দাবাদ। সেদিনের সেই শ্লোগান দিল বিমল। পরদিন যুগান্তর কাগজের সম্পাদকীয়তে এই শ্লোগানকে নিন্দে করে লেখা হল—এটা ঠিক নয়। সেদিনের সেই বিরাট জনস্রোতও শ্লোগানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারল না। কিন্তু কে জানত এই শ্লোগানই আসল সত্য হয়ে দাঁড়াবে মাত্র এক বছর বাদে। ব্রিগেডের সভাশেষে সবাই বাড়ি ফিরেছে। পার্লামেণ্টও ভেঙে দেওয়া হয়েছে নির্বাচন ঘোষণা করে। চার দিকেই এক নূতন উত্তেজনা।
বাড়ি ফিরেই শুনতে পেল সুমিত্রা যে ওর দাদার ফিরতে দেরী হবে। খড়্গাপুরের কাছে নাকি কয়েকজন নকশালপন্থীর সঙ্গে পুলিশের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে। সুমিত্রার দাদাদের রেকর্ডে যে কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছিল কলকাতার পলাতক হিসেবে তাদের দু'একজনকে নাকি পাওয়া গেছে। ওর দাদা লর্ড সিন্‌হায় বসে সব খতিয়ে দেখতে গেছে রেকর্ড ও আহতদের নামের তালিকাগুলো। ফিরতে তাই দেরী হবে। সুমিত্রার দুশ্চিন্তা অন্য কারণে। মাত্র ক'দিন আগেই রতন মেদিনীপুর হয়ে কাকুলাম যাবে জেনেছে। সেখানে রতনের কিছু হলো না তো ?
সুমিত্রার সঙ্গে মাঝরাত নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল তখনই পুলিশের জীপের হর্ন বাজল ওদের বাড়ির সামনে। ওর বৌদি দরজা খুললেন। সুমিত্রার দাদা এসেছেন ফিরে।
বিছানাতে শুয়েই সবটা শুনতে পেল সুমিত্রা। যা অনুমান করেছিল তাই হলো। রতন গুলিতে ভীষণ ভাবে আহত হয়েছে। সুমিত্রার দাদাকে নামগুলো কনফার্ম করেছে মেদিনীপুর পুলিশ।
ওর দাদা বলছিল ওর বৌদিকে। ছেলেটাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছিলুম। শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরে গিয়ে আহত হল।
সুমিত্রার ঘুম শেষ। রতনের মুখটা বার বার করে ভাসছে মনে। অথচ কিছু বলতে পারছে না। পুলিশ পাহারায় খড়্গাপুরের হসপিটালে রতনকে তখন স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। ওর হুঁশ নেই।

॥ বাইশ ॥

দিল্লীর কেয়ারটেকার সরকারের কাজ হল শুধু মাত্র লোকসভা নির্বাচনের আগে কতকগুলো এ্যাটমসফিয়ার তৈরী করা, যার ফলে একটা ফেবারেবল হাওয়া কেয়ারটেকার সরকার বা ইন্দিরা কংগ্রেসের অনুকূলে যায়। এক অর্থে

জগজীবন রাম কংগ্রেসের দুই স্তম্ভ। একজন হলেন ইন্দিরা গান্ধী অন্যজন ফকরুদ্দিন আলি আমেদ। ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষে সুব্রহ্মনিয়মদের কথা বলা শক্ত। সেখানে সবাই পজিশন নিয়ে রেডি হচ্ছেন যাতে ডি-এম-কে-র সাথে একটা বোঝাপড়া হয়। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে তাদের সঙ্গেও কথা বলার কাজ প্রায় শেষ। বেশ আটঘাট বেঁধে নামছেন ইন্দিরা কংগ্রেসের সবাই। অন্যদিকে লিজলিথাপ্পার দল প্রায় সব দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গেই একটা বোঝাপড়ার হিসেব কষে গ্র্যাণ্ড এ্যালাইন্সের জগাখিচুড়ি ভোগের আয়োজন করলেন। বাংলার অবস্থা কিন্তু তখন আরও খারাপ হতে লাগল। কাউন্টার এন-কাউন্টারের হোলিখেলায় বাংলার সবুজ রং মুছে গিয়ে লাল অথচ ভয়ংকর এক রঙের মত সব কিছুকে ভয় পাইয়ে দিল। জেলখানায় জেলারের ঘুম নেই কখন বা কয়েদীর সঙ্গে ওয়ার্ডারের সংঘর্ষ হবে অথবা কয়েদী নিজেই পালাবে। কাঁকনা, শালবনী, কুরসিয়ার জঙ্গলে আত্মগোপনকারীরা অস্থির। কখন বা পুলিশ ঘিরে ফেলবে।

ছোট থানার দারোগা বা কনস্টেবলও সব সময়ে সতর্ক—এই মুহূর্তে থানার ওপরে সশস্ত্র যুবকেরা চড়াও না হয়। কলকাতার ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ প্রথম রিভলবার নিয়ে ডিউটিতে এলো। আবার এক জনকে পাহারা দিতে দু'পাশে দুজন রিভলবার নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কলকাতায় একজন কমিশনারে চলল না, দিল্লী আরও একজনকে পাঠাল। এ্যাডিশনাল কমিশনার হয়ে এলেন সুনীল চৌধুরী। কলকাতার কমিশনার তখন রণজিৎ গুপ্ত। কার ক্রেডিট বেশী এসব জিনিস মোকাবেলায় তার খবর একমাত্র সরকারের ভেতরকার ফাইল বলতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে দুটো মত বাজারে চালু আছে। এ সব মোকাবেলায় যা কিছু বদনাম তা চাপানো হয়ে থাকে রণজিৎবাবুর ওপর। আর ক্রেডিটের সিংহ ভাগ সুনীলবাবুর। অপর মতটা হল যে শান্ত ভাবে কাউকে বুঝতে না দিয়ে আসল মোকাবেলার কাজ করার জন্য দিল্লী সুনীলবাবুকে ডেপুটি করেছে। সেজন্য ক্রেডিট তার বেশী। নকশাল আন্দোলন দমনে রণজিৎবাবু জেনারেল ভাবে যা করার তাই করেছেন। যাকৃগে, লালবাজারের কর্তাব্যক্তিরা যতই সরগরম করুন, এস-এ-পি (স্পেশ্যাল আর্মড পুলিশ), সি-এ-পি (ক্যালকাটা আর্মড পুলিশ) এবং সি-আর-পি (সেণ্টাল রিজার্ভ পুলিশ) এদের উপরেই নাকি দিল্লীর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। উত্তর প্রদেশের ফতেপুরের ডি-সি তেওয়ারী এখন এলাহাবাদে থাকে, (যে প্রায়ই গোঁফ মুচড়ে বলে, 'হামারা ফতেপুর কি খাস চিজ হ্যায় হামারা ইউ-

পি কা রিজার্ভ ফোর্স (পি-এ-সি) প্রভিন্সিয়াল আর্মড কন্‌স্টুবোলারী ইয়ে সবসে ভাগড়া কাম কিয়া হ্যায়। ই লোককা ডিউটি থা যাদবপরমে। একও সিপাই ঘায়েল নেহি হুয়া।')

বাস্তবিক পক্ষে ইউ-পি-র ফোর্স কতটা ছিল না ছিল খবর রাখার সময় তখন কারও নেই। কারণ ভাড়া করা পাবলিক ট্রাকগুলোতে বেতের ঢাল নিয়ে অথবা মেটালের শিরস্ত্রাণ নিয়ে শুধু সকাল সন্ধ্যে ট্রাকগুলোর যাতায়াত দেখা গিয়েছে।

সে যেন রোজ এপাড়া ওপাড়ার যুদ্ধের মত। সেখানে ভারতের কোন্ রাজ্যের পুলিশ ছিল আর ছিল না, একথা বলা মুশকিল। বাংলা ভাষা সামান্য বোঝে এমন ধরনের সঙ্গীনধারীর সাক্ষাৎ খুব কমই মিলেছে। পুলিশের সমারোহ দেখে সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকদের সঙ্গে এক লহমায় পরিচয় এ রাজ্যের অনেক যুবকেরই হয়েছে।

প্রাইভেট নার্সিংহোমের মত ছোট ছোট নার্সিং সেণ্টার শুধু গুলি বের করে আহত যুবককে এ্যাব্‌সকণ্ড করে রাখার জন্য বহু জায়গায় হয়েছিল। অনেক তরুণ ডাক্তা: এ সব কাজে সহযোগিতা করেছে। এক কথায় সবদিক থেকেই একটা লড়াই ও প্রস্তুতির ভাব, কিন্তু কেমন লড়াই, কোথায় যাব এবং জিতবে কে—এ সব প্রশ্নের উত্তর কোন মতেই স্পষ্ট হতে পারছিল না। কালীপদ মুখার্জি স্মৃতি ভবনে, ২নং হাজি মহম্মদ মহসীন স্কোয়ারে বিজয় সিং নাহারের সৌজন্যে কংগ্রেসের দফতর হল তাদের নিয়ে যাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকতে চাইলেন। ছোট জায়গা হলেও সহস্র লোক আসত প্রতিদিন। সামনে পার্কের ঘাসেও বসত। সেখানে বসেই কাজ করত। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ৫৯বি চৌরঙ্গী রোডের কংগ্রেস ভবন (নিজলিঙ্গাপ্পা পন্থীদের) তখন আলোয় ভরপুর কিন্তু কর্মী সেখানে নেই। তারা আর এক স্রোতে উপচে উপচে দু'নম্বর হাজী মহসীনে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। মধ্য কলকাতার সনৎদা, অজয়দা, গোপাল কুমার, ধীরেন বসুদের বদান্যতায় বিকেল বেলায় ভাঁড়ের চা আর তেলেভাজায় গরীবি হাটাবার আন্দোলনের আসর জমে উঠত। বেলেঘাটার নারায়ণ কর সে সময়ের সবচেয়ে আদর্শবাদী বলিষ্ঠ একজন যুবক। নিজে গান বাজনা নাটক ইত্যাদি ভালবাসত। জয়শ্রী ক্লাবের গোবিন্দ দে-র উৎসাহে কেমন করে জানি রাজনীতিতে প্রেরণা পেল। শেষটায় বিমল-সুব্রতর একেবারে কাছের মানুষ হয়ে গেল নারায়ণ। সেই সঙ্গে তপেশও। এর কিছুদিন আগেই বিমলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিপুল শেষ

হয়ে গেছে অরুণা সিনেমার কাছে। শজারুর কাঁটার মত একটা গরম লৌহশলাকা জাতীয় কিছু ওর বুকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে এফোঁড় ওফোঁড় করে। হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে ওর সমস্ত আশা-আকাঙ্খার শেষ নিশ্বাস শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে শেষ হয়ে গেল। সে দিন খুব বড় একটা কোন মিটিং ওখানে বিরোধীদের। বিপুল সম্ভবত দেখতে গিয়েছিল দূর থেকে। ওর কাজ ছিল নীরবে সব তথ্য সংগ্রহ করে বিমলকে দেওয়া। বিমলের গায়ে যাতে আঁচড় না লাগে তার জন্ম ওর পাশে পাশে থাকত ওকে আঁকড়ে ধরে। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত ওকে চিনে ফেলেছিল অনেকে। ওর লাশটা অরুণা সিনেমার কাছে পাওয়া গিয়েছিল। ওর বোন আর মাকে সামান্ত ভরসা জোগাতে সেদিন ওদের বাড়িতে এসেছিলেন অশোক সেন। কে কাকে মারছে আর কে কার দলে গিয়ে মরছে তার ঠিকানা রাখার সময় নেই সত্তরের শেষ আর একাত্তরের শুরুতে। ভ্যানের পুলিশ, জীপের পুলিশ, ট্রাকের পুলিশ, গলির ছেলে, বস্তির ছেলে, কলোনীর ছেলে, কেরাণীর ছেলে, বাবুদের ছেলে, মাস্টারের ছেলে সবাই কোন না কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত বারুদ আর নলের সামনা-সামনি হবেই।

দিনে দুপুরে বা রাতের অন্ধকারে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ফাংশানে দু'বছর আগে কি হয়েছিল সেটাই এক মাত্র সত্য নয়। অমনটা ভারতের সব জায়গায় দু'তিন বছর পর পর হয়ে থাকে। দিল্লীর রবীন্দ্র রঙ্গশালা, বম্বের শিবাজী পার্ক, জুহু বীচে হামেশাই এ ধরণের উদ্দাম যৌবনের বিশৃঙ্খল আচরণ অনেকবার হয়েছে। তবে বাংলার রাস্তাঘাট স্কুল-কলেজের রোজকার খুন-খারাপির রাজনীতি অন্তত মেয়েমানুষের ভিড় দেখে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ার হাঙ্গামা নয়। সেটা হবে সারা ভারতের নিয়ম অনুযায়ী গড়ে একবার প্রতি দশ বা পাঁচ বছর বাদে ফাংশানে জলসায় বা যাত্রার প্যাণ্ডেলে। কিন্তু অন্য যা কিছু সব ঘটছে বা ঘটতে পারে তার সব কিছুর সঙ্গে কষ্টকল্পিত অসম্পূর্ণ বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি।

খেতে না পাওয়া আর খেতে পাওয়া সারপ্রাস বাংলার যৌবনের একাংশ শীত গ্রীষ্মের দুপুরে হিন্দী নূতন ছবি রিলিজের মুহূর্ত থেকে রজত জয়ন্তী পর্যন্ত পঁয়ষট্টি পয়সার লাইন দিতে ক্লান্ত, যুদ্ধের সম্মুখীন। তারপর পর্দায় নৃত্যের তালে তালে নিজেদের জিহ্বার ও ঠোঁটের কম্বিনেশনে অদ্ভুত এক বংশীধ্বনির মত সিটির মুহুর্মুহু আওয়াজ সবাইকে চমকিত করে। আহা, কি অনন্ত যৌবনের জয়যাত্রা! বাইরে তখন কোন পাড়ায় বা হাওড়ার মালী-পাঁচঘরা কিংবা যাদবপুরের চালতুতে অথবা বীরভূমের হেতমপুরে বারুদ, বন্দুকের পাহাড় জমছে অপসংস্কৃতি,

অন্তায় আর দারিদ্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, পি-এল ৪৮০ আর ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের বারান্দায় নবজাগ্রত-বাংলার যৌবনের পাহাড় ঘর। পাহাড় ঘরকে রণক্ষেত্র করলে বাবাদের প্রফিডেণ্ড ফাণ্ড, দিদিদের বিয়ের খরচ, দাদাদের বিয়ের পাঞ্জাবী, জামাই-বাবুদের ষষ্ঠীর তত্ত্ব, হিন্দুর দুর্গাপূজার আমাদি বাড়াবাড়ি, মুসলমানের ঈদের মেঠাই খাবার খরচে টান পড়বে জেনেও এখানে ওখানে দু-একটা মিছিল "জোট বাঁধো তৈরী হও" বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরপাক খেয়ে মরে। হ্যারিংটন স্ট্রীটের এমব্যাসির লোকগুলো মজা করে হাসে—কারণ ওরা জানে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বাবা আর কেরানীরা কোনদিন জোট বাঁধবে না। তারা সব কামাই দিতে পারে কিন্তু মেয়ের বিয়েতে ধার করে খরচা, বাবার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ খাওয়ানের দায়িত্ব আর বিয়েতে বরযাত্রী পোষাক ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে তা না হলে তাদের সংস্কৃতি পাংচার হয়ে যাবে।

রতনের জ্ঞান এখনও ফেরেনি। সে মেদিনীপুরের হসপিটালে। অনেক দিন বাদে গান্ধী কলোনীর সুধীরবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হল সুমিত্রা এই সংবাদ নিয়ে। সুধীরবাবু স্বর্গাগত। খেলোয়াড় ছেলেটি বিয়ে করে আলাদা থাকে। মাসে দু-একদিন এসে দেখে যায়। রতনের মার কান্না থামানো যায় না। সুমিত্রাকে দেখেই বলল, আমার সংসারটা শেষ হয়ে গেল। (সত্তরের দশকে নিজের চোখে দেখল সুমিত্রা বিলেতে পড়া ছেলের মা, প্রথম ডিভিশনের নামী খেলোয়াড়ের বাবার রেশন তোলার পয়সা নেই। মেদিনীপুরে ছেলেকে দেখতে যাবার ব্যবস্থাও সুমিত্রা করে দিল। রতনের জীবন-যুদ্ধের কোন অংকেই সুমিত্রার মিল নেই কিন্তু কোথাও যেন একটা বিরাট পরিচয় হয়ে গেছে. কোথায় আত্মীয়তার মত। সে পরিচয় মুছে ফেলা যাবে না।)

॥ তেইশ ॥

ইন্দিরা গান্ধীর শিবিরের প্রথম মর্যাদার খেলায় ইজ্জত বাঁচিয়ে দিয়েছে বাঙলার ফ্রণ্ট সরকার ও তাদের সদস্যদের বিধানসভা। এই বিষয়ে অবশ্য অজয়বাবু জ্যোতিবাবুর কোন আলাদা মত ছিল না, সবাই মিলেই ভোট ফর গিরি। শেষ পর্যন্ত সেকেণ্ড প্রেফারেন্স ভোটে গিরি জিতলেন। ইন্দিরা বাঁচল, সিণ্ডিকেটী দাবার চাল ভুল হয়ে গেল, বাজী মাত হয়ে গেল। কিন্তু মর্যাদার দ্বিতীয় লড়াইয়ে তামিলনাড়ু ডি-এম-কে এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সি-পি-আই

ছাড়া কেউ দোসর হতে চাইল না। পশ্চিমবঙ্গে আবার বিধানসভা লোকসভা দুটো নির্বাচনই একসঙ্গে। ইন্দিরা এগিয়ে চলছে অতএব আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি এই বিশ্বাসে ভর করে রাজ্য বিধানসভার টিকিট নিয়ে তুলকালাম শুরু হলো। যদিও অনেক জায়গায় অনেক বর্ষীয়ান মানুষ দাঁড়াতে অস্বীকার করলেন। সি-পি-আই (এম) দল ছাড়া সাহস নিয়ে সব আসনে ফ্রন্ট প্রার্থী দিয়ে এ লড়াই করবার সুযোগ, হিম্মত ও মানসিকতা কোন দলেরই ছিল না, এমন কি কংগ্রেসেরও না। বরানগরে সি-আর-পি, যাদবপুরে সি-আর-পি, কিম্বা ইউ-পি-র প্রভিন্সিয়াল আর্মড কনস্ট্যবলারী ছাড়াও বেঙ্গল পুলিশ তো আছেই। রাইফেলধারী পুলিশদের নূতন গহনা আবিষ্কার হল। লোহার শেকল! শেকল দিয়ে কোমরের সঙ্গে রাইফেল বাঁধা। টানা-হ্যাঁচড়া করলে মানুষ নিয়ে টানা-টানি পড়বে। এর ফলে কজন পুলিশ বা তার রাইফেল বেঁচেছে বা খোয়া গেছে তার কোন তথ্য জানা না থাকলেও এটা লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে স্থূলকায় বেঙ্গল পুলিশের ভোজপুরী, মৈথিলী, ছাপড়া, দারভাঙ্গা এবং বরিশাল মেদিনী-পুরের বীর কনস্টেবলদের অনেকেই একটু ঝিমুবার বা দিবসান্তে ভাত-ঘুম বা ছাতু-ঘুমের কোলে ঢলে পড়বার সুযোগ নিয়েছেন এই বিশ্বাসে যে, তাদের ধারণা হল—রাইফেল নিয়ে নকশাল টানাটানি করলে শরীরে টান পড়বে। তাছাড়া একজন কনস্টেবলকে পাহারা দেবার জন্য তখন আবার আর একজন কনস্টেবল তৈরী থাকত। এই বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে যখন প্রশাসন, সরকার, আন্দোলন, নির্বাচনের সবকয়টা প্রস্তুতি একসঙ্গে চলছে, তখন নকশাল আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে সম্পূর্ণ ম্লান করার জন্যই হয়তো এক দল প্রফেশনাল সমাজবিরোধী তাঁদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে তুলল নকশালের নাম করে। সরকার যদি সেদিন প্রথম শ্রেণীর নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতাদের জেলে না পুরে বাইরে রাখতেন তাহলে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও একটা ভূমিকা এরা পালন করতে পারতেন কিন্তু সময় তখন পেরিয়ে গেছে। বাঙলা বাজার অরাজকতার কবলে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ যতই আইন শৃংখলা নেই নেই করে আওয়াজ উঠুক না কেন—সেই বাজারেই কিন্তু সবচেয়ে বেশী কৃষি উৎপাদন হল গ্রামে। শিল্পেও তেমন একটা মন্দ হল না। বরং ছোট খাটো দু-একটা ঘটনা ছাড়া (কারখানা স্থানান্তর বা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা।) শিল্পেও লগ্নী হয়েছে যথেষ্ট। তার মুনাফা লুটেছে বৃহৎ পুঁজিবাদ আর মালটি-ন্যাশন্যালরা। সর্বনাশ যা হল তার মূল হল বাঙলায় নূতন করে লগ্নী করতে বাইরে থেকে কেউ এলো না।

'কম্বিং' অপারেশন বা চিরুনী অপারেশনও এই সময়ে সবচেয়ে বেশী বীভৎসতা ধারণ করে। রাতের আলো নিভিয়ে দিয়ে একজন অপরাধীকে খোঁজার জন্যে বা ভুয়ো খবর পেয়ে বোমা বারুদ তল্লাসী করার জন্যে কত জায়গায় যে অহেতুক হয়রানি আর উৎপাত ও হেনস্থা করা হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এর বড় কারণ হল কোলকাতা পুলিশ বা রেইল পুলিশ সি-আর-পি সঙ্গে নিয়ে যখন জয়েন্ট কম্বিং করত বাধা পড়ার অভাবে কোথাও সি-আর-পি আবার কোথাও পুলিশ জুলুম করেছে বৈকি। সেই পরিবারগুলো কি কোনদিনও তাদের অশুভ হানির জন্য দেশের প্রশাসনকে কোন যুক্তি দিয়ে ক্ষমা করতে পারবে ?

এই প্রশ্নটাই একদিন হাজী মহসীন স্কোয়ারে বসে যাদবপুরের এক তরুণ কর্মী তুলেছিল দু'জন নেতার কাছে (পরে তারা বড় মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং জীবনে তারা কলোনীতে বসবাস করেন নি।) জবাবে তাঁরা বলেছিলেন প্রশাসনিক যা প্রয়োজন তা মেটাতে পুলিশ তখনই জুলম করতে বাধ্য হয় যখন তাকে জনগণ সহযোগিতা করে না। কোন এলাকার অপরাধী লুকিয়ে থাকলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব নাকি সেখানকার মানুষের। কিন্তু মানুষের তখন বোঝবার উপায় কি যে কোথা থেকে কে এসে আত্মগোপন করছে কোন পাড়ায় বা কোন আত্মীয়ের বাড়িতে। নদীয়ার কেউ যাদবপুরে আর পুরুলিয়ার কে গিয়ে কাসিয়াং-এ আত্মগোপন করছে। যাদবপুরের তরুণ কর্মীটি এ ধরনের জবাবে মর্মাহত হয়েছিল। তাকে আর কোনদিন কংগ্রেস অফিসের চারপাশে দেখা যায় নি। পরে জানা গেল সে দল বদল করেছে, আরও মর্মান্তিক খবর এলো ছ'মাস বাদে যে সেই ছেলেটিই কম্বিং-এর সময় আহত হয়ে হসপিটালে গিয়ে সেখানে সে মারা যায়। খবরটা সুমিত্রাই দিয়েছিল ফোনে। সে দিন সুমিত্রার বৌদি সন্তান হতে গিয়ে মারা গেলেন সুখলাল কারনানীতে। সেখানে ওর বৌদিকে ভর্তি করবার দিনই দেখতে পেয়েছিল পুলিশ পাহারায় একটি ছেলের চিকিৎসা হচ্ছে উডবার্ণের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। সুমিত্রাকে ও চিনেছিল। সুমিত্রাও ওকে চিনেছিল। দু'একবার দেখেছিল কংগ্রেস অফিসে। ডাক্তার ও পুলিশকে বলে সুমিত্রা এগিয়ে গিয়েছিল ওর কাছে ওকে দেখতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। বেশী কথা না বলে শুধু বলেছিল, আপনারা কেউ প্রতিবাদ করতে জানেন না, আপনারা কি মানুষ ? নার্স এসে সুমিত্রাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওর কাছ থেকে। সম্ভবত সেইটেই ওর শেষ প্রতিবাদ। কারণ সেদিন রাত্রেই ও মারা গিয়েছিল। যাদবপুরে পরদিন 'বন্ধ' হয়েছিল। এটা হল কম্বিং-এর তাজা উপহার।

সুমিত্রার বৌদি মারা যাবার পর পার্টি অফিসের ধারে কাছে বেশ কিছুদিনই আর সুমিত্রা আসে নি। বিমলরা গিয়েছিল ওর বাড়িতে এই ঘটনার পর সমবেদনা জানাতে, খুব একটা রাজনৈতিক কথাবার্তা তখন হয়নি। কলকাতা, যাদবপুর, গড়িয়া, হাওড়া, কোন্নগড়, বারাকপুর, দমদমে সি-আর-পি-দের আলাদা বন্দোবস্ত করতে তাঁবু খাটিয়ে ছাউনি পড়ে গেল থানা কমপাউণ্ডে বা আলাদা খালি জায়গাগুলোতে। দেখলে বেশ মনে হত একটা ছোটখাটো যুদ্ধের মতন আবহাওয়া।

আমরা সবাই ভারতীয় হলেও প্রাদেশিক অন্ধতা সব জায়গায় মুছে যায়নি। তাই কম্বিং-এর আগে ও পরে কিম্বা বোমা ও বারুদের আবর্তে পড়ে অনেক সি-আর-পি'র মুখ দিয়েই 'শালা বাঙ্গালীকা বাচ্চা,' 'শালা বাঙ্গালি যোদ্ধার', 'শালা বাঙ্গালী ডাকু' এই ধরনের সাদর সম্ভাষণ অনেক শোনা গেছে। বোধ হয় সেই কারণেই দয়াহীন নির্মমতায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রিজন ভ্যানে বা রাত্রের অন্ধকারে মশারিতে ঘুমিয়ে থাকা মা-ভাই-বোনকে একটু গুঁতিয়ে জাগাতে তাদের বোধ হয় কষ্ট হত না। শিক্ষিত সচেতন যুবক, যারা হয়তো কোন অন্যায় করে নি, সন্দেহবশত তাদের প্রতিও এই সম্ভাষণ ছিল সব সময়ের জন্য। সি-আর-পি হাতটাকে দিল্লীর কর্তারা পয়সা খরচ করে সব শিখিয়েছেন, শুধু সভ্যতা, আচার, ব্যবহার এবং নম্রতা এই বিষয়ে কোন পাঠ সি-আর-পি'র ট্রেনিং-এ ছিল না সে কথা হলপ করে বলা যায়। বাঙালী যুবক বা বাঙলার যৌবনকে এত বড় অপমান এর আগে কেউ করেছে বলে জানা যায় নি। পশ্চিম বাঙলার জাগ্রত যৌবনে সব সময়েই একটা প্রগতিশীল বামপন্থী হাওয়ার গন্ধ আছে বলে বেঁচে গেল দিল্লী। তা না হলে শুধু এই অপমানের বদলা নিতেই এবার বাঙলার দিল্লীর বিরুদ্ধে আর একটা বাঙলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম চালু হয়ে যেতে পারত। নকশালদেরও বাহাদুরি যাই হোক। তারা বীরত্ব ফলাতে গিয়ে এদের ওপর কিছু করতে পারেনি। যা কিছু উৎপাত হয়েছে গরীব বাঙালী কনস্টেবল, ভোজপুরী ট্রাফিক পুলিশ এদের ওপর দিয়ে। দিল্লীর হোম-মিনিস্ট্রি থেকে কোন বিশেষ অপারেশন বোধ হয় চলছিল, তা না হলে এমন সাজানো গোছানো 'কম্বিং'-এর মধ্যে দিয়ে মধ্যরাতের অন্ধকার থেকে ভোর রাতের মধ্যে সবকিছুকে স্তব্ধ করা সম্ভব হল কি করে। অনেক বড় বড় শহরে বা দেশ বিদেশের রাজধানীতে দেশের জন্য প্রাণ আহুতি দেওয়া অনেক নাগরিক ও জয় জওয়ানের জন্য "আননোন হিরোজ" নামে শহীদ স্তম্ভ থাকে। বাঙলার সেদিনকার যে দুর্যোগপূর্ণ রাতগুলোতে পুলিশে মানুষে বোমা বারুদে, যে

বীভৎসতায় বিভিন্ন দলের তাজা যুবক থেকে পুলিশ কনস্টেবল পর্যন্ত প্রাণ দিল, এদের আকৃতি যাই থাক, এদের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাতে একটা শহীদ স্তম্ভ গড়া উচিত কোলকাতার ময়দানে। এত সব ঘটনা সত্ত্বেও নির্বাচনী টিকিট আর সমঝোতা নিয়ে যখন দফায় দফায় বৈঠক, তখন বাঙলা কংগ্রেসীদের একজন হোমরা-চোমরা বিড়লাদের সঙ্গে কথা বলে রফা করতে এলো কংগ্রেসের কাছে একশো কুড়ি একশো কুড়ি দুই শরীকে আর বাকী চল্লিশ অন্য সহযোগীদের মধ্যে। গেমটা প্রায় সাকসেসফুল হয়ে চলেছিল কারণ প্রতি আসন পিছু আগাম টাকাও বরাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিহত করল বিমল-সুব্রত। প্রতিহত করল বলেই সবটা ভেস্তে গেল। ব্যাজার মুখ করে বিড়লা বাড়ির কাছে কথা দেওয়া বাঙলা কংগ্রেসী প্রাক্তন মন্ত্রীর দূত ফিরে গেল, কংগ্রেসের যারা এই ব্যাপারে একটু উৎসাহিত হয়েছিলেন তারাও মনক্ষুণ্ণ হয়ে বসে রইলেন। মুখে কিছু বললেন না বটে, তবে মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন বিমল-সুব্রতর ওপর।

সুমিত্রার যখন খোঁজ করছে প্রতিদিন তখন একদিন জয়ন্ত খবর আনল সুমিত্রা দল ছেড়ে নতুনদের দলে যোগ দিয়েছে। প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চায়নি বিমল। বিমল বলেছিল, এ হতেই পারে না—ইমপসিবল্।

এক রকম অধৈর্য হয়েই বিমল ফোন করলে সুমিত্রাকে। সে বাড়িতে নেই। ওর দাদা গম্ভীর গলায় বললে, কিছু বলতে হবে ?

বিমলের জবাব, না।

সুমিত্রা রতনকে নিয়ে এসেছে কোলকাতা মেডিকেল কলেজে। পুলিশ পাহারা হলেও কাছ থেকে চিকিৎসা হচ্ছে। সুমিত্রার দাদা সাহায্য করেছিল এই ব্যাপারে সুমিত্রাকে। শুধু বলেছিল—যা করছিস কর, আমি বাধা দেব না, কিন্তু আমার চাকরী আমায় করতে দে।

সুমিত্রার বৌদি মারা যাবার পর ওর দাদা ক'দিন ছুটি নিলেন। সে ক'দিন সুমিত্রাও বেশী বাইরে বের হত না। বিকেলবেলা কিছু ফল নিয়ে যেত সোজা মেডিকেল কলেজে। রতন এখন একটু সুস্থ। কিন্তু উঠে বসে কথা বলার শক্তি নেই। সুমিত্রা ট্যাক্সি করে দু'দিন রতনের মাকে নিয়ে গেছে আবার কলোনীতে পৌছে দিয়েছে। নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, কাঁদবেন না মাসীমা, ও ভাল হয়ে যাবে। ও বীর ছেলে। সৎ সাহসী।

রতনের মা বলতেন, তুমি যে গত জন্মে আমার কে ছিলে মা তা ভগবানই জানেন। তা না হলে এমন করে কেউ আমার জন্যে করে। সেই কবে

রতনের বাবা বাস থেকে পড়ে গিয়েছিল, তার পর থেকে তুমি আমাদের ভোলনি মা।

সুমিত্রার দাদা সারাদিন ধরে খাতার ওপরে পেন্সিল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লিখছিল—পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো। টেবিলের ওপরে চা রেখে সুমিত্রা বললে, কি লিখছ দাদা তখন থেকে?

সুমিত্রার দাদা বললে, যা লিখছি তা তোর রতনদের কবিতা। বেশ ভাল বানিয়েছে কিন্তু কথাটা। শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রাম না শুরু হয়ে যায়।

তোমাদের মধ্যে শুরু হলে তো একবারে বিপ্লব এসে গেল কিন্তু তুমি কোন্ সাইড নেবে?

কেন আমরা হলাম পুলিশের মিডিল ক্লাস। ওপরতলার লাথি আর নীচুতলার ঘৃণা—এই দুই নিয়ে আমাদের জীবন, আমরা যে দল জিতবে তার দিকে থাকব—বলেই হেসে উঠল ওর দাদা। এই হাসিটা সুমিত্রা জানে। কোথাও কোন মেজর অপারেশন করতে গেলেই ওর দাদা এমন করে হাসে। আর সারাদিন ধরে কি সব ভাবে।

আজকাল কিন্তু কোথাও যাবে না। এখন একদম বাড়িতে থাকতে হবে। সুমিত্রার শাসন ভালবাসে ওর দাদা। কিন্তু মিঞাবাগান আর দত্তবাগান হাউসিং এস্টেটের পাশের বাড়িতে কালকের মধ্যে জাল না পাতলে এক ডজন নদীয়ার নকশাল পালিয়ে যাবে; খবর এসেছে ওর দাদার কাছে। সে কথা কেমন করে বুঝিয়ে বলবে সুমিত্রাকে।

॥ চব্বিশ ॥

অরবিন্দ সেন অনেক আগেই মুক্তি পেয়েছিল। উনসত্তরের যে দিবসে যেদিন কানু সান্যালদের উপস্থিতিতে ময়দানে সি-পি-আই (এম-এল)-এর সভা হল তারও বেশ কিছুদিন পরে অরবিন্দ ছাড়া পেয়েছিল। ছাড়া পাবার পর সে আর অন্য কিছু করেনি। প্রথমেই যুক্তফ্রন্টের প্রতি তার তীব্র অনীহা প্রকাশ করেছিল বিবৃতির মাধ্যমে। তার পরের কাহিনী আরও কঠোর। এতক্ষণে অনেক সাথী সরকারী দলের সহযোগী হয়েছে। যারা বিদ্রোহ করেছে তাদের অনেকেই তখন নিজেরা রক্তাক্ত অথবা রক্তক্ত বিপ্লব করতে অপরের রক্তে হাত রাঙিয়ে নিয়েছে। অরবিন্দ আর এসব দিকে নজর না দিয়ে সোজা

শালবনীর দিকে রওনা হলো। মাঝে গড়বেতায় কদিন কাটাল। ওর দু'একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী এখন এ'দিকটিতেই ডেরা বেঁধেছে। শালবনীতে গিয়ে কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ঠিকভাবে নিতে পারেনি অরবিন্দ। অস্ত্র সংগ্রহ আর গেরিলা ট্রেনিং-এর জন্য যারা জঙ্গলে লুকিয়ে তৈরী হচ্ছে তাদের মানসিকতায় দৃঢ়তা যতই থাক দেশের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে এরা কতটা সচেতন বুঝতে অরবিন্দর বেশ অসুবিধাই হয়েছিল। একদিকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের আধারে ইন্দিরা গান্ধীর নয়া সংগ্রাম, যার চমকে কিছুটা চমকিত দেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভেতরের অনেক গরীব মানুষ—অপরদিকে ক্রমাগত শহর আধাশহরের স্থান মধ্যবিত্তের মধ্যে ওদের আন্দোলন প্রসঙ্গে দারুণ শঙ্কা দুটোই কেন যেন পপুলার কোন এ্যাকসেপটান্স দিচ্ছে না বলেই অরবিন্দর মনে হলো। প্রথমে মুখ খুলল না। অবস্থাটা বুঝতে গোপীবল্লভপুর, ডেবরা, উড়িষ্যার জঙ্গল পর্যন্ত একচোট ঘুরে নিল। ততক্ষণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত পত্রিকায় ঋত্বিক ঘটকের গান্ধী প্রসঙ্গে মন্তব্য (শূয়োরের বাচ্চা) আর এক কলরব তুলেছিল। আর সবাই এ নিয়ে হৈ চৈ করলেও জেলে বসেই অরবিন্দ বুঝ ে পেরেছিল প্রতিভাধর সংবেদনশীল এই সহজ খাঁটি মানুষটির যন্ত্রণা কোথায়। একে দেশ ভাগ, তার পর দাঙ্গা আর শোচনীয় ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর যে চেহারায় ঋত্বিকবাবু বাঙলার মা'কে দেখেছেন সেখানে তাঁর মত পদ্মাভক্ত মাঝির মত বাঙ্গালীর রসপিপাসু মানুষের মনের ক্রোধ অজান্তেই যে সব দেশ-নায়কের প্রতি বর্ষিত হবার কথা তালিকা অনুযায়ী হিন্দুস্থানের গান্ধীজি তার মধ্যে এসে পড়ে। আর যে ঝোঁকেই ঋত্বিকবাবু রেগে গিয়ে থাকুন না তাঁর মুখ থেকে এমন কথা নিঃসৃত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। "মেঘে ঢাকা তারা"র ঋত্বিকবাবু অরবিন্দের মত অনেক বাঙালী যুবকের কাছে "মেঘে ঢাকা সূর্যে"র মত। যার দহন বাইরে থেকে অনুভব করা যায় কিন্তু যার আলো বিচ্ছুরণের প্রভাত পাওয়া গেল না।

পুলিশের সঙ্গে নকশাল ধরার ব্যাপারে প্রায় সবাই সহযোগিতা করেছিল সেদিন। ন্যায়ে হোক অন্যায়ে হোক এমন এক অন্ধকারের রাতে বাঁচার তাগিদেও পুলিশকে এই সাহায্য করতে যারা এগিয়ে এসেছিল তাদের বিশেষ কোন লাভ নেই। নকশালবাড়ীর সঙ্গে মতে মেলেনা এমন প্রায় সব দলের মুরুব্বিরাই লর্ড সিন্‌হা রোড থেকে লালবাজারের ঘরে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কি লাল কি অন্য রং। একে বিপ্লব বিরোধিতাই বলা হোক আর ঠাণ্ডাই বলা হোক, এসব ঘটনা ঘটেছিল একথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অরবিন্দর কাছে গোটা ব্যাপারটাই তাই বুঝতে এবং সামলে নিতে সময় লাগার কথা। ইতিমধ্যে গান্ধী শতবর্ষে বিশেষ ভাবে গান্ধী দর্শনের উপর বিশেষ নিবন্ধ লিখে অধ্যাপক সেন জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। যে বিশেষ অনুষ্ঠানে কোলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক সেনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো সেখানে বোমাবাজি হয়েছিল। অধ্যাপক সেনও সামান্য আহত হয়েছিলেন। সংবাদপত্রের সেই সংবাদ একদিন বাদে ডেবরায় অরবিন্দকে তুলে দিয়েছিল ওরই এক সাথী। আঘাত গুরুতর না হলেও সে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যে অরবিন্দের নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে। অরবিন্দের পক্ষে এখন কোলকাতা যাওয়া বিপজ্জনক। আবার বাবাকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়লে দলের ভেতর গোলমাল বাধবে। পুলিশ পাহারায় সেখানেই আবার রতনের চিকিৎসা হচ্ছে। রতনও অরবিন্দদের একটি ইউনিটের লোক। কাগজটা একবার এদিক ওদিক যেতে কিছুক্ষণের জন্য মা'র কথা মনে হল। যে কাগজ এনেছিল সে খড়্গপুর আই-আই-টির ছেলে। বললে, "আমি গিয়ে দেখে আসতে পারি।"

অরবিন্দ বললে, কোন দরকার নেই। কিন্তু কথার ভাব শুনে মনে হল দরকার আছে এবং অরবিন্দ বেশ উদ্বিগ্ন।

প্রফেসর সেনকে যতটা না চিকিৎসার দরকার তার চেয়ে বেশী কেয়ারে রাখার ব্যবস্থা পুলিশই করলে—ওদের প্ল্যান তাহলে যদি একবার অরবিন্দ দেখতে আসে তাহলে ওকে ধরা যাবে।

এদিকে প্রফেসর সেনের সংবাদে শহরের অনেক শিক্ষাব্রতী উদ্বিগ্ন। অনেকেই ওকে দেখতে এলেন। যাঁরা জানতেন ওঁর ছেলের কথা তারা বেশী উচ্চবাচ্য করলেন না।

বিকেল নাগাদ সুমিত্রা এল। প্রফেসর সেন তখন বেশ সুস্থ, ডান হাতটায় যা একটু চোট লেগেছে। তাঁর বয়স হয়েছে কাজেই সাবধানতা নেওয়া দরকার।

সুমিত্রা শুধু এটুকু জানে যে অরবিন্দ ছাড়া পেয়েছে কিন্তু সে এখন কোথায় তা আর জানে না।

সুমিত্রা যখন পাশে বসে তখনই সেখানে এল একজন সুদর্শন যুবক। এই সেই অরবিন্দর সহকারী, যে আই-আই-টি-তে পড়ে। অরবিন্দর নিষেধ সত্ত্বেও সে জোর করেই এসেছিল।

প্রফেসর সেনের কাছে এসে বললে, স্যার আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

সুমিত্রার উপস্থিতিতে বলা সম্ভব নয়—ওর কথার স্বরে ভাবলেন প্রফেসর সেন। কিন্তু তিনি বললেন, "সঙ্কোচ কিসের—এ আমার মেয়ের মত—তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার।"

ছেলেটি ঢোঁক গিলে মিথ্যে বললে—আজ্ঞে আমায় অরবিন্দদা পাঠিয়েছেন—ওর পক্ষে আসার অনেক অসুবিধে ভাই…।"

ছেলেটির কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রফেসর সেন বললেন—থাক থাক ওসব কথা বলতে হবে না—ওর কোনদিনই আসবার দরকার নেই। ওর বিপ্লব ওকে শেষ করতে দাও। ওকে বলবে যে আমার অস্থি নিয়ে যেন বিপ্লব করে—এবারটায় তো হ'ল না। আর একবার যেন তার জন্ম চেষ্টা করে।

প্রফেসর সেনকে উত্তেজিত দেখে ওকে শান্ত করলে সুমিত্রা—ছেলেটিকে ইশারায় সরে যেতে বললে। ছেলেটি বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সুমিত্রা প্রফেসর সেনের মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—আপনি অত রেগে গেলে কি চলে? সবারই তো দুর্ভাবনা আছে।

প্রফেসর সেন এখন অনেক শান্ত, ওর চোখে জল। সুমিত্রাকে বললে, ছেলেটির কাছ থেকে জেনে নিও তো মা, ও এখন কোথায় আছে, কেমন আছে? আমার এটুকু খবরেই যথেষ্ট। ভয় নেই, ওদের খবর আমি পুলিশকে বলব না।

সুমিত্রা বাইরে আসতেই দেখে ছেলেটি লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রা এগিয়ে এসে বললে—আপনার অসুবিধে না হলে কয়েকটা কথা বলব। ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বললে, "এখানে একদম নয়।" এখন চারু মজুমদারের নামে চতুর্দিকে এক হাওয়া এবং তিনি আত্মগোপন করে আছেন।

সুমিত্রা বললে, তাহলে কোথায়?

ছেলেটি বললে, আমি কাফে-ডি-মনিকো তে যাচ্ছি, সঙ্গে আসতে পারেন, ভয় না পেলে।

সুমিত্রা ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল বেশ সাহস নিয়েই। ট্যাক্সিতে কোন কথা নেই। পাছে ট্যাক্সি ড্রাইভার জেনে ফেলে। সুমিত্রাও ঘাঁটাল না ওকে।

কাফে-ডি-মনিকোতে দুটো কফির অর্ডার দিয়ে ছেলেটি বললে—'আপনি কে?'

—আমায় চিনবেন না। আমি প্রফেসর সেনের কাছে পড়তুম, অরবিন্দবাবুর সম্বন্ধে সবটাই জানি।

বেশ—তো, তা কি চান?

—উনি এখন কোথায়? কেমন আছেন! এইটুকু মাত্র। প্রফেসর সেন জানতে চেয়েছেন।

—আপনাকে বলা নিষেধ। কারণ আপনায় চিনি না।

আমার বিশ্বাস না হলে আপনাদের রতন যার চিকিৎসা হচ্ছে তার বাবার ঠিকানা দিচ্ছি সেখানে গিয়ে বলে আসবেন।

আপনি রতনকে জানেন?

অত্যন্ত কাছের থেকে জানি।

ছেলেটি একটু সামলে নিয়ে বললে—সে এখন মেদিনীপুরে এর বেশী কিছু বলার নেই। অরবিন্দদা ভাল আছে।

মেদিনীপুরের কোথায়?

আপনি যে পুলিশের মত জেরা করছেন।

আমি পুলিশ নই—আমার দাদা ওসব কাজ করে।

আপনার দাদা মানে? ছেলেটি চমকে উঠেই কোমরে হাত দিতে যায়। সুমিত্রাও লক্ষ্য করে যে পুলিশ শুনেই ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে।

হ্যাঁ, আমার দাদা। তবে তার কাজের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই এই বিশ্বাসটুকু রাখুন।

কি নাম?

পরিতোষ চৌধুরী—

ওঃ বাব্বা—আমাদের উনিশ নম্বর···। বলেই ছেলেটি আর ওখানে না থেকে সোজা বেরিয়ে গেল টেবিলে একটা পাঁচ টাকার নোট রেখে দিয়ে। তখনও সুমিত্রার কফি শেষ হয়নি। সুমিত্রাও ঠিক বুঝতে পারল না ছেলেটি ঘাবড়ে গেল কেন। তার থেকে বেশী খটকা লেগেছে সুমিত্রার ওর দাদার ব্যাপারে উনিশ নম্বর শুনে। বেশ খটকা লাগল ওর মনে অথচ ওর দাদাকে বলবার উপায় নেই—তাহলে—অরবিন্দ তথ্যও গোপন রাখতে হবে' এই কথা দিয়েছে সে।

দেখতে দেখতে কদিনের মধ্যেই প্রফেসর সেন সুস্থ হয়ে উঠলেন; কিন্তু সেই যে হঠাৎ করে ঘা খেয়ে কর্মশক্তি হারালেন আর উঠতে পারলেন না—বেশী কথা বললেই ওঁর শরীর কাঁপে। দূর সম্পর্কীয় এক বোনের কাছে চলে গেলেন প্রফেসর সেন বাকী দিনগুলো কাটাতে।

"উনিশ নম্বর" শোনার পর থেকেই আর সুমিত্রার শান্তি নেই। এখন থেকে ওর দাদা দেরী করে বাড়ি এলে ভীষণ চিন্তা করে। কি জানি কখন কি হয়?

একদিন তো বলেই ফেললে, দাদা তোমাদের ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করতে পার না? ওর দাদা বললো সব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এখন আমাদের লাইনে কেউ আসতেই চাইছে না, তায় আমাদের আবার অন্য ডিপার্টমেন্ট। জানটা কয়লা হয়ে গেল।

চারদিকে যা আরম্ভ হয়েছে ভীষণ ভয় লাগে দাদা। কখন যে কি হবে?

ওর বৌদি কথাগুলো শুনে বললে, বলে আর কি করবে ঠাকুরঝি—তোমার দাদা কারো কথাই শুনবে না। আমাদের চিন্তা করে শরীর ক্ষয় করা ছাড়া আর কিছু নেই।

পরিতোষ বললে তোমাদের খুশী করতে একটা পথই খোলা সেটা হল চাকরী ছেড়ে দেওয়া। তা তোমরা যদি কুবেরের ভাণ্ডার পেয়ে যাও কখনও বলবে—আমি চাকরী ছেড়ে দেব।

এর পর আর সুমিত্রাই বা কি বলবে। সব কথাই তো মধ্যবিত্ত পরিবারে এই এক জায়গায় এলে শেষ হয়ে যায়।

গোপীবল্লভপুরের কৃষক সংগ্রামের কথা কোলকাতার দেওয়ালে ভর্তি করে লেখা হলো। পুলিশ যত মোছে ওদের লেখা ততই কারা যেন আবার লিখে যায়। কোন উর্বর মস্তিস্ক যে পুলিশকে দিয়ে শ্লোগান মোছাবার বুদ্ধি দিয়েছিল কেউ জানে না। পুলিশের সাহসী মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে আগে থেকেই এমন একটা হাবভাব করা হল যে ভোজপুরী হিন্দুস্থানী কনস্টেবলরা রাতের বেলায় দিনের বেলায় ডিউটি করার নামে আসলে নিজের পাহারায় ব্যস্ত থাকত। আস্তে আস্তে বন্দুক ছিনতাই-এর পরে শিকলবাঁধা বন্দুক পুলিশের কোমরের বেল্টে লাগানো হলো।

ভীষণ অল্পবয়সে অকস্মাৎ লান্সডাউনের তেজেশদা যাকে কেউ কেউ বাবুসাহেব বলে ডাকত ঠাট্টা করে, যাকে নিয়ে রমাদির নাম জুড়ে হাজার রকম গল্প, মারা গেলেন ক্যান্সারে। মৃত্যুর খবর যখন মাঝ রাতে এল তখন অনেকেই ঘুমিয়ে শহর কোলকাতায়, তার আগের দিন কি একটা ব্যাপারে বাঙলা বন্ধ হয়ে গেছে। কংগ্রেসের কর্তারাও এখানে ওখানে ছড়িয়ে। বিমলরাই উদ্যোগ নিয়ে লোকজন জোগাড় করে সকাল থাকতে হাজির হলো তেজেশদার বাড়িতে। ইতিমধ্যে লোকজন এসে গেছে। রমাদির কান্না দেখেছে সেদিন বিমল। সত্যিই যেন পতিহারা হলে যা হয় তাই। কেওড়াতলায় সব কাজ সেরে যখন ফিরবে সবাই তখন একটা ছেলে এসে বিমলকে বললে, রমাদি

আপনাকে ডাকছেন।

রমাদি তখন ইলেকট্রিক চুল্লীর বাইরের লনে গাড়ির মধ্যে বসে। লোকজন একে একে ফিরে যাচ্ছে। রমাদিকে সহানুভূতি জানাতে কেউ নেই—কেননা তিনি তো অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার্ড স্ত্রী নন। গাড়ির কাছে বিমল আসতেই রমাদি বললেন—ভাই আমার সঙ্গে একটু আসবে? বিমল ইতস্তত না করেই গাড়িতে উঠে পড়ল। বাবুসাহেবের আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ ছিল না, দূর-সম্পর্কীয় দু'একজন ছাড়া। তাদেরও সবাই সকালে আসেননি—এখন এসে হাজির হলেন। তেজেশদার ড্রাইভার, বাড়ির কাজের লোক, ব্যবসা দেখার মানেজার সবাই বাড়িতে বসে। এই বোধ হয় বাবুমশায়ের গাড়িতে চড়া রমাদির জীবনে শেষ।

গাড়িতেই রমাদি বললেন, তোমাদের বোধ হয় অনেকের অনেক রকম মত আছে আমাকে নিয়ে কিন্তু বিশ্বাস কর বিমল, তোমাদের তেজেশদা ছাড়া জীবনে যে আমি কাউকে ভালবাসিনি। কল্যাণী কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে একটা ষ্টলের হয়ে কাজ পেয়ে গিয়েছিলাম নিমতা থেকে। সেখান থেকে আলাপ। তারপরে উনি এসেছিলেন আমাদের নিমতার বাড়িতে। তোমরা ওকে আর যাই ভাব শয়তান ভেবো না লক্ষ্মীটি—তাহলে ওর আত্মা শান্তি পাবে না। টাকা পয়সা, মান সম্ভ্রম সব দিয়েছেন তোমাদের দেশের জন্য। আর যেটুকু বদনাম কিনেছেন তাও আমার জন্য। কতবার বলেছি—আমায় যখন ভালবাস তখন বিয়ে কর না কেন? তাহলেই তো গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু একথা বললেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেতেন। আসলে কি জান? তোমার দাদা টের পেয়েছিলেন যে ওঁর ক্যান্সার হয়েছে বছর দুয়েক আগে। তাই বোধ হয় ভাবতেন জেনে শুনে আমার সর্বনাশ করা ঠিক নয়। কিন্তু এখন আমার কি অবস্থা হলো বলতো?

কি জবাব দেবে বিমল খুঁজে পায় না। জবাব দেবার মত আছেই বা কি? এমনি কত নিষ্পাপ ভালবাসাকে না জেনে না শুনে কতভাবে ওরাই না মন্তব্য করেছে—কাগজওয়ালাদের তো কথাই নেই।

এখন কি করবে রমাদি?

মরতে চাইলেই তো মরতে পারব না বিমল—তাই বেঁচে থাকতেই হবে। আমরা মেয়েরা বড় বাঁচার জন্য লোভী। তবে এ দিকে আর থাকব না—বাইরে কোন ধরনের কাজ পেলে চলে যাব। তোমার দাদা থাকতেই দিল্লীর একটা কাগজওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। ভাবছি চেষ্টা করে কোন কাজ

পেলে ওখানেই চলে যাব।

বাড়িতে এসেই দেখে সবাই বিষন্ন মুখে দাঁড়িয়ে। রমার উপস্থিতি এ সময়ে তেজেশদার অনেক আত্মীয়ই বরদাস্ত করতে পারছে না। তাঁদেরই একজন তেজেশদার ম্যানেজারকে বললেন, এখন তো শ্রাদ্ধশান্তি শাস্ত্রক্রিয়ার কাজকর্ম করতে হবে—নিজেদের মধ্যে বসে সব করে নিলে হয় না?

ম্যানেজার বললে, রমাদি যেমন যেমন বলবেন তেমনটাই হবে—এটাই ছিল সাহেবের ইচ্ছে।

বেশ রেগে গিয়ে ওঁদের একজন বললেন, এসব শাস্ত্রক্রিয়ায় আত্মীয়-স্বজনের একটা দায়-দায়িত্ব আছে তা জানেন?

ম্যানেজার বললে, নিশ্চয়ই আপনারাই সব করবেন—তবে সাহেবের শেষ ইচ্ছেটা কি আমি জানালাম।

শ্রাদ্ধশান্তির কাজ অবধি রমাদি ওখানে যাতায়াত করতেন। তার পর সলিসিডর জানিয়ে গেলেন যে, তেজেশদার সবকিছুই তেজেশদা রমাদির নামে লিখে গেছেন।

রমাদির দর বেড়ে গেল এই খবর পাবার পরই। যারা একটু নিন্দে করতেন তারাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। রমাদি কিন্তু এসব কিছু নিজে না রেখে প্রায় সবটাই একটা আশ্রমকে দিয়ে দিলেন। সব ছেড়ে দিয়ে দিল্লীর সেই কাগজে কাজ নিয়ে রমাদি দিল্লী চলে গেলেন। রমাদিকে বিদায় দিতে স্টেশনে বিমল গিয়েছিল। সেদিন যেন আর চোখের জল মোছার জায়গা নেই। এতবেশী মন্তব্য আর মন্দ কথা বলা হয়েছে এই রমাদিকে যে আজ এহ মুহূর্তে বিবেকটা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠছে।

রমাদি বললেন, কখনো দিল্লীতে কোন কাজে এলে আমার ওখানে আসবে। সাবধানে থেকো। কেমন?—

রমাদি চলে গেলেন দিল্লী।

রমাদিকে বিদায় দিয়ে বিমল যখন ডেরায় ফিরে এল তখন সুব্রত জানাল সুমিত্রার বৌদির মৃত্যু সংবাদ। সন্তানের জন্ম দেবার পরই মারা গেলেন পরিতোষবাবুর স্ত্রী। পরিতোষবাবু তখন কোথায় যেন ডিউটিতে ব্যস্ত ছিলেন। মারা যাবার পাঁচ ঘণ্টা বাদে তিনি এসেছিলেন। সুমিত্রাকে সমবেদনা জানাতে বিমল তখনই সুব্রতকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পরিতোষবাবুর বাড়ি।

পুলিশে যারা কাজ করে সত্যিই তাদের মতন দুর্ভাগা বোধ হয় কমই আছে। ডিউটি যারা ঠিক ভাবে করবে তারা হলেন সবচেয়ে বড় সাফারার। কর্তার

হুকুম তামিল, সরকারের হুকুম তামিল করতে গিয়ে পরিবারকে হুকুম করা বা তাদের হুকুম তামিল করায় সুযোগ রিটায়ার্ড লাইফ ছাড়া তাদের জীবনে আর আসে না।

সুমিত্রার বৌদি কিন্তু ওর দাদাকে বলেছিল সেদিন ছুটি নিতে। অথচ সেদিন কোলকাতায় তিন রকমের ভি-আই-পি আসছেন। বৃটিশমন্ত্রী আসছেন জোড়াসাঁকোতে সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—বিকেলে উপ-রাষ্ট্রপতি আসছেন। এদের সব নিরাপত্তা আর অন্ত ব্যবস্থা দেখতে পরিতোষের ছুটি মেলেনি। ভেবেছিল শহরেই তো হচ্ছে—এক ফাঁকে খবর নেওয়ার কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু জোড়াসাঁকোতে বিক্ষোভ হবার কথা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, তাই অনেকক্ষণ সব কিছু আগলাতে হয়েছে।

বাচ্চাটাকে নিয়ে পরিতোষের মা ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত এই বয়সে তার এই পাওনা ছিল—এমন অনেক বিলাপ।

পরিতোষবাবু কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইলেন। কি করবেন, কিছু তো করার নেই। সুমিত্রাকেই ধৈর্য নিয়ে ব্যাপারটাকে সংসারে সহজ করতে হল বেশ কিছু দিন ধরে।

ইতিমধ্যে রমাদির সব কথা সুমিত্রাকে জানিয়েছে বিমল।

সুমিত্রা বললে, এবার থেকে আর কখনো কারো ভালবাসা বা মেলামেশা নিয়ে আজে বাজে মন্তব্য করতে যেও না বিমলদা—হোঁচট খাবে। দূর থেকে যা দেখ, কাছে গিয়ে দেখবে তার অনেক কিছুই ভুল। এটা মনে রেখে এগিয়ে যেও।

বিমলকে মাথা নীচু করতেই হল—কেন না মরালিটি আর আদর্শের নামে অনেকবার অনেকভাবে তেজেশদাকে রমাদিকে অনেক কিছু বলেছে বিমল-সুব্রত।

॥ পঁচিশ ॥

শেষ পর্যন্ত রতনকে অনেক ভাবে বুঝিয়ে অরবিন্দের আড্ডা জেনেছে সুমিত্রা। রতনের এখন সুমিত্রাকে কোন সন্দেহ হয় না। অনেক ভাবেই সুমিত্রাকে বিশ্বাস করা যায়। সুমিত্রাও এর আগেই খড়্গপুরের আই-আই-টির ছেলেটার কাছে কাফে-ডি-মনিকোয় জেনেছিল যে মেদিনীপুরে থাকে অরবিন্দ। সুমিত্রার এই আগ্রহ কিন্তু প্রফেসার সেনকে খুশী করার জন্য। এর আগে পাঁশকুড়া ছাড়া মেদিনীপুরের কোথাও যায়নি সে। এবার ওকে যেতে হবে বেলপাহাড়ী।

সেখানেই নিতাই হাঁসদার ডেরায় আছে অরবিন্দ। সেও এক দুর্গম জায়গায়। রতনকে কিছু জানতে না দিয়েই অরবিন্দর উদ্দেশ্যে পা বাড়াল সুমিত্রা।

বিমলদের সঙ্গে যোগাযোগটা একটু হাল্কা হয়ে গেছে সুমিত্রার। বিমলরাও এখন দিনের শেষে ভোটের দেশে ভোট ভাঙ্গানের গান নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। যে কোন সময়ে নির্বাচন হলেই যাতে একটা চান্স হয় ফিরে আসার। আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিমলরাও কিন্তু কংগ্রেসী দাদাদের সঙ্গে ভোটের রাজনীতি আর কমিটি কণ্ট্রোলের রোগগুলো গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

এক সময়ে ছেলেদের মধ্যে বিমল-সুমিত্রাকে নিয়েও নানা রকম গুঞ্জন উঠেছিল কিন্তু বিমলের নিরাসক্তি আর সুমিত্রার আসা যাওয়াটা কমে যাওয়ায় সে জিনিসটা নিয়ে আর কেউ হৈ চৈ করে না। তমলুকের সুকুমার এক'দন বিমলকে সরাসরি বলেছিল, সুমিত্রাদিকে বুঝতে পারি না—ঠিক নন-পলিটিক্যাল না পলিটিক্যাল। না কি তোমারই জন্য ঘুর ঘুর করে—কিছু বুঝতে পারি না। আবার মাঝে মাঝে নকশালদের জন্যও আহা উহু করে।

বিমল বললে, একটা ভাল সৎ মেয়ে এটুকু বলা যায়। পলিটিক্যাল ব্যাপারে ননসিরিয়াস—কিন্তু হিউম্যানিস্ট।

বিমলের ব্যাখ্যা শুনে সুকুমার বললে, একেবারে ফুল রিসার্চ করেছ দেখছি।

বিমল বললে, এর জন্য তোমরা খারাপ কিছু বললে আমার কিছু বলার নেই—তবে আমাদের অনেকের থেকে পারফেক্ট ও খাঁটি হলো সুমিত্রা—এটা বলতে পারি।

সুমিত্রা কিন্তু সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ আগেই বেলপাহাড়ীর ভেতরের গ্রামে তিন মাইল পথ হেঁটে নিতাই হাঁসদার বাড়ি খোঁজ করে তবে পেয়েছিল। নিতাই হাঁসদার গ্রামটা যেন দুর্গ।

গ্রামের চায়ের দোকানের লোকেরাই সন্দেহ করেছিল। সুমিত্রাকে নাস্তানাবুদ করেছিল ভীষণ—পরিচয় জেনে এমনকি ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে খুলেও দেখেছিল—কিছুই পায়নি।

নিতাই হাঁসদার বাড়িতে এলেও অরবিন্দর সঙ্গে দেখা হতে আরো একঘণ্টা লাগল।

সুমিত্রার সামান্য পরিচয় আই-আই-টির সৌম্য দিয়েছিল অরবিন্দকে কোলকাতা থেকে ফিরে। ভয়ে শুধু গোপন করেছিল যে সে পুলিশ অফিসারের বোন। সৌম্য এখনও সবদিক থেকে পাকা হয়ে ওঠেনি। হোস্টেল পালিয়ে যেটুকু সময় পায় অরবিন্দর কাজে লাগে, তাও মাসে ছ' সাত দিন করে

এই গ্রামে পুলিশ আসতে পারেনি কেন বোঝেনা সুমিত্রা। আত্মগোপনের নামে এমন সহজ করে গাঁয়ের মানুষগুলোর সাথে মিশে গেছে ওরা যে গাঁয়ের মানুষই ওদের ত্রাতা। পুলিশের গাড়ি আসবার আগেই শিঙ্গা ফুঁকিয়ে সংকেত দিয়ে দেয়। সবাই সতর্ক হয়ে যায়। এমন কি রাত জেগে পাহারারও বন্দোবস্ত আছে। তাই এখনও অরবিন্দ এতটা নিরাপদ।

অরবিন্দকে দেখেই শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠল সুমিত্রার। দেখলে মনে হবে না, কি মারাত্মক কাজে জড়িয়ে পড়েছে এরা। সুন্দর সংযত পরিচ্ছন্ন মুখটা অরবিন্দর।

আপনি এখানে কেন এসেছেন?

কিছু কথা বলতে।

কি কথা? আপনাকে এখানকার খবর কে দিয়েছে?

কিছুটা সৌম্য রায় বাকীটা রতন…

রতন? তার সঙ্গে আপনার…

আমি ওকে চিনি অনেকদিন ধরে—ওর চিকিৎসার জন্য দুবেলাই ওর কাছে যাই—ও এখন অনেক সুস্থ। খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

অরবিন্দ ইশারায় অনেককে সরে যেতে বললে।

সুমিত্রা বললে, আপনার বাবার আমি ছাত্রী। ওনার এখন খুব কষ্ট। আপনি যদি একবার…

ও বাবা পাঠিয়েছেন তাহলে…?

না, মানে—প্রফেসর সেন কিছু বলেননি—আমি নিজে থেকেই এসেছি।

আপনার সঙ্গে আর কে এসেছে?

আমি একাই এসেছি।

একা? এই জায়গায়? আপনার ভয় করে না?

ভয় আমার কোন কিছুতেই নেই—তবে সেটা প্রকাশ করি না কোথাও।

সুমিত্রার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অরবিন্দ বললে, এই রাতে আপনাকে পৌঁছে দেব কি করে? তাছাড়া এখানকার রাস্তাঘাট খুব খারাপ।

আমি কোনরকম করে একটা রাত এই গাঁয়ে কাটিয়ে কাল সকালে চলে যাব।

বাড়িতে বলে এসেছেন? আপনার জন্য কেউ ভাববেন না।

দাদাকে জানিয়েছি পাঁশকুড়ায় বন্ধুর বাড়ীতে যাচ্ছি একদিনের জন্য।

পাঁশকুড়ায় কেন?

সেখানে এককালে স্কুলে কাজ করতাম—তাই সেই নামটা দাদার কাছে বিশ্বাসযোগ্য।

দাদা কি করেন ?

একটু থেমে সুমিত্রা বললে, এস-বির লোক পরিতোষ···অরবিন্দর চমকে ওঠা মুখটা দেখেই সুমিত্রা হেসে বললে—"আপনাদের উনিশ নম্বর"।

অরবিন্দ বললে, তাহলে আজ রাত্তেই আমরা সব ধরা পড়ছি কি বলেন ? আপনিই ওদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন ভাল মানুষ সেজে। ভেবেছেন এসব চাল জানি না ?

অরবিন্দকে উত্তেজিত দেখে সুমিত্রা বললে, মানুষকে বিশ্বাস করাও বিপ্লবের সনাতন ধর্ম। আপনি আমায় অবিশ্বাস করলে তার প্রমাণ দিতে হয়ত সারারাত থাকতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমার দাদার কাজ এক আর আমার ভাবনা আর এক।

অরবিন্দ বললে, কথাগুলো ত সুন্দর কিন্তু বিপদটা বাধলে তো আপনি কৈফিয়ত দেবেন না।

আপনার বাবা যেমন প্রচণ্ড গান্ধীবাদী অথচ আপনি নন তার জন্য কি আপনার সাথীরা কখনও আপনাকে সন্দেহ করে ?

সুমিত্রার এই কথা শুনে অরবিন্দ বললে, আপনি কাল ভোরেই চলে যাবেন। সঙ্গে আমাদের লোক যাবে। কোনরকম কিছু করলেই আপনার জীবনের কোন গ্যারাণ্টি আমাদের নেই। আর "উনিশ নম্বর" একথা কার কাছে জেনেছেন ? 'সৌম্য' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল। সুমিত্রা বললে।

আপনি বাবাকে যা বলার বলবেন। তাঁর জন্য আমার নিশ্চয়ই মনের ব্যথা আছে। কিন্তু আমাদের অনেকেই এমন করে মা-বাবা, ভাই-বোন ছেড়ে পুলিশের হাত থেকে দূরে থেকে এই কাজে নেমেছি—সেখানে আলাদা করে বাবার জন্য বিচলিত হবার আমার কোন অবকাশ নেই—আর সেটা আমাদের দলের কাজের ক্ষেত্রেও ভাল হবে না।

একটা কথা বলব ?

বলুন।

আপনি কি বিশ্বাস করেন—এমন করে দু'চারটে খুন করে আপনাদের সত্যি-কারের বিপ্লব হবে ?

প্রথমটায় অনেকেরই তাই মনে হবে কিন্তু একদিন দেখবেন সমস্ত মানুষ জেগেছে এই কাজে।

আপনার কি মনে হয় না এই ভাবে বেশীদিন এগোন যাবে না ?

না, আমার তা মনে হয় না।

আপনি কি আপনাদের কোলকাতার কাজকর্মের খবর রাখেন ?

সামান্য রাখি। ওটা আমার জোন নয়।

সুমিত্রা বললে, সেখানে যে সব কাজ হচ্ছে তাতে কিন্তু মানুষ আপনাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছে।

মধ্যবিত্তরা অনেক খুঁতখুঁতে। তাই ওদের এ্যাসেসমেণ্টটাই সব নয়। অরবিন্দ বলে।

কিন্তু ওদেরকে একেবারে বাদ দিয়ে যেতে পারবেন কি ? আপনারা সবাই তো ওই ক্লাস থেকে এসেছেন।

দেখুন এসব তর্কে লাভ নেই। আপনি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট না হলে তার জন্য কৈফিয়ৎ দেবার জন্য আমরা তৈরী নই—তবে আমাদের কাছে সেণ্টিমেণ্টকে যারা প্রাধান্য দেবে তারা আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়বে—এটাই আমাদের ধারণা।

বেশতো যা করছেন তা করুন না—আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু দেখছি রতনের মত ছেলেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ কিছু করার নেই—কারণ না আসছে বিপ্লব না আসছে অন্য কোন পথ।

রতনকে দেখে তার প্রতি আপনার যে দুর্বলতা তা দিয়ে সবটা বিচার করবেন না।

দুর্বলতা আপনার প্রতিও আমার কম নয়। প্রফেসর সেনের কাছে আপনার সব ভাল গুণগুলোর খবর অনেক আগেই আমি জেনেছি। তাই যখন মনে হয় বোধ হয় আপনাদের জায়গাটা ঠিক হচ্ছে না, তখন মনে ভাবি—গিয়ে বলা দরকার। যদিও জানি আমার বা আমাদের মত কয়েকজনের বলায় কোন আসে যায় না আপনাদের। কারণ বন্দুকের নলই আপনাদের একমাত্র শক্তি। সেখানে জনগণ, তাদের হৃদয়বৃত্তি, তাদের ব্যথা বেদনা অনুভূতি ছোট বা বড় সব কিছুই আপনাদের কাছে অগ্রাহ্য।

সুমিত্রার কথায় অরবিন্দ বললে, তাহলে এই শোষণ আর অত্যাচারকে মেনে নিয়ে প্রতি অর্ধদশকে ভোটের বাক্স বোঝাই করে কতকগুলো শোষককে শাসকের ঘরে পাঠিয়ে দেশের কি লাভ ?

সব উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু সেই কথা আছে না কবির—"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা"—অর্থাৎ কিনা গ্রামের না খেতে পাওয়া মানুষ-

গুলোকে লড়াইতে নামাবার আগে না পড়া, না লেখা করে শুধু মূর্খ করে রাখলে হবে না দেখবেন। এক্ষুনি তো আর পুলিশ মিলিটারী আপনার বিপ্লবে জয়েন করছে না বরং তারা এর বিরুদ্ধে। আপনাদের সঙ্গে পেতে হবে এই মানুষ-গুলোকে। এরা ক্ষুধার্ত তাই আর্তনাদ করছে। কিন্তু এরা যদি কোন শিক্ষা পায়, জ্ঞানের আলো পায়—এরাই কিন্তু ভোটের বাক্স পাল্টে দিতে পারে।

'শুধু লেখাপড়া শিখিয়ে গণচেতনা হয় না। আন্দোলনে সামিল হয়েই বেশী করে গণচেতনা লাভ হয়।' অরবিন্দ বললে।

কিন্তু আন্দোলন কোথায় এবং কেমন করে? সবটাই তো একটা খুনের অঙ্কে কার নাম কত বাড়ল তার মহড়া।

নিতাই হাঁসদা ঢুকল ঘরে। অরবিন্দকে বললে, এই রাতে কি দিদিমণি চলে যাবেন? ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ কথা হয়ে গেছে অরবিন্দ আর সুমিত্রার।

অরবিন্দ বললে, না। একটু ব্যবস্থা করে দাও এখানে থাকবার। সকালবেলা চলে যাবে। কাউকে দিয়ে বড় রাস্তায় উঠিয়ে দেবে। সেখান থেকেই বাস ধরবে।

অরবিন্দ আর রতনে এক বিরাট ফারাক। একজন এসেছে সমাজের সামগ্রিক যন্ত্রণাটাকে রুখতে। তার নিজের জীবনের কোন দুঃখ বা খেদ নেই—সেখানেই আদর্শের দর্পণে সবটাই চিত্রিত। আর রতনের—তার মনেতেই রয়েছে নিজের জীবনের চূড়ান্ত যন্ত্রণা আর গ্লানি—সেখানে নিজের আয়নায় সবাইকে দেখতে চেয়েছে সে। সুমিত্রা বুঝল এমন দুই মেরুর আশ্রয়ে যে লড়াই সেখানে সাফল্য আর হতাশার আর্তনাদে হঠকারিতা দুই-ই থাকবে। কোন্‌টা স্থায়ী হবে বলা মুশকিল।

পরিতোষ কিন্তু ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করেছে সুমিত্রার হাবভাব বদলে গেছে। বিমল-সুব্রতদের ব্যাপারে আগ্রহ কমে এসেছে। এই তো কোয়ালিশন সরকার হবার পরেও নেপালদার মৃত্যু পর্যন্ত এত ঘটনা ঘটে গেল: সুমিত্রার কোন ঔৎসুক্য নেই।

নেপাল রায়ের মৃত্যুতে কোলকাতা স্তব্ধ হয়ে গেল। ইলা বৌদি আর শিবানীদের পাশে সেদিন সারা কোলকাতার সংবেদনশীল মানুষ। নেপালদা এমন করে শেষ হয়ে যাবেন উত্তর কোলকাতায় কেউ কোনদিনও তা ভাবেনি। অনেকেরই মনোবল ভাঙতে শুরু করল। এককথায় তখন নকশালের নামে কোলকাতায় এক ভয়ের ও ত্রাসের রাজত্ব—সেখানে ভাল হোক, মন্দ হোক, "নকশালবাড়ির কথা তখন অমৃত সমান—যে না শোনে তারি লাগি যাবে

মৃত্যুবাণ।”

দেখতে দেখতে ক্রমাগত এই ধরনের চমক আর ভুমদাম হঠকারিতার বিরুদ্ধে জেলের ভেতরে থাকা একদল নকশাল সমর্থক সোচ্চার হ'তে লাগল। তারা বললে, চারুবাবু এ লাইনে চললে আমরা কেমন করে এ্যাপ্রুভ করবো। এটা “মাস” (Mass) লাইন নয়। জনগণের সমর্থন এতে থাকবে না। আর একদল প্রতিবাদ করে বললেন, চারুবাবুর লাইনই ঠিক—‘গলা কাটা চলছে চলবে।’ এর কোন বিরাম নেই। বলা বাহুল্য জেলের ভেতরের এই গুঞ্জন জেলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। অরবিন্দকেও মত দিতে হল এ ব্যাপারে। সে শেষ পর্যন্ত চারুবাবুর এই লাইন মেনে নিতে পারে নি। এর ফলে নাকি আসল শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে না, হচ্ছে এক বীভৎস হঠকারিতা।

বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। বিমলরা সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থনেই বাঙলাদেশের মুক্তি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা সভা, বিতর্ক, সেমিনার শুরু করে দিয়েছে।

অরবিন্দও কিন্তু চুপ করতে পারল না। সে তার দলকে বোঝাতে চাইল—বাঙলাদেশে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেটুকু ধিক্কার হচ্ছে তাকে আমাদের সমর্থন জানানো উচিত। অরবিন্দর বক্তব্য দল মানল না। ভীষণ একঘরে হয়ে পড়ল অরবিন্দ। অরবিন্দ বোঝাতে চেয়েছিল অনেক করে যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যদি আমাদের লাইন স্পষ্ট না হয় তাহলে চীনের অনুকূলে সাচ্চা জনমত গড়ে আমাদের লাইনকে সেফ করা যাবে না। বিশেষ করে বাঙলায় যেখানে যথেষ্ট আবেগ ও হৃদয়বৃত্তির প্রশ্ন রয়েছে শেখ মুজিবের সংগ্রাম প্রসঙ্গে। অরবিন্দর এই বক্তব্যের পর থেকেই সে প্রায় একঘরে হয়ে এসেছে। কেউ কেউ যাকে রিভিসনিষ্ট, ব্রাইবড্, ইনফ্লুয়েন্সড বলে দিল। যে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিল অরবিন্দকে একঘরে করতে সেই বোধায়ন দাসগুপ্ত একদিন মুচলেকা দিয়ে রাজভবনের লাটসাহেবের জামাই হতে রাতারাতি বিদেশে পাড়ি দিল।

দলের এই আভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাত, ট্যাক্টিক্যাল লাইন নিয়ে বিরোধ এমন চরমে এল যে সৌম্যদর্শন, দারুণ প্রাণবন্ত ছেলে অরবিন্দের সহকর্মী সৌম্যকে অপঘাতে প্রাণ দিতে হল খড়্গপুরে। বডিটা পাওয়া গেল নয় দিন বাদে সালুয়ার কাছে।

সৌম্যের মৃত্যুর পরেই অরবিন্দ শঙ্কিত হয়ে উঠল। ওর মতের অনুকূলে অন্য ইউনিটের অবস্থা জানতে অরবিন্দ এল কোলকাতায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হাওড়া

স্টেশনে ভোরবেলায় চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার থেকে নামতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রেপ্তার হলো অরবিন্দ সেন। খবরের কাগজে বড় বড় করে খবর ছাপা হলো। পরে অবশ্য জানা গেল সৌম্যের মৃত্যুর কারণ হলো যে, সে অরবিন্দের অনুকূলে মত সংগ্রহ করতে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করতে গিয়েছিল। মেদিনীপুরে এমন ধরনের তিনটে গ্রুপ মিটিং করার পরই সৌম্য শেষ হয়ে গেল।

অরবিন্দের গ্রেপ্তারকে ওরই দলে ওর বিরোধীরা জেনেশুনে সারেণ্ডার বলে চালাতে চাইল।

এর পর সুমিত্রা গেল প্রেসিডেন্সী লক-আপে ওর সঙ্গে দু'দিন দেখা করতে।

অরবিন্দ বলেছিল শুধু, আমি আমার মত ও পথ ছাড়িনি কিন্তু যে কায়দায় এর ব্যাখ্যা চলছে তার বিরুদ্ধে আমি।

বরং সুমিত্রা বললে, আমি কিন্তু জানতাম আপনি এতটা বাড়াবাড়ি সমর্থন করবেন না।

আপনি ভুল বুঝেছেন, বাড়াবাড়ি বিপ্লবে হয় কিন্তু নিজেদের শক্তি চূর্ণ করে যখন হয় তখন তা হয় হঠকারিতা। ওরা সৌম্যকেও মেরে ফেলেছে। অরবিন্দের চোখে জল দেখল এই প্রথম সুমিত্রা।

সৌম্যের খবর সুমিত্রাও জানত না। সব খবর ত আর কাগজে বের হয় না। কত মরছে তখন।

চমকে উঠল সুমিত্রা—সেকি, সৌম্য নেই?

অরবিন্দ বললে, না নেই আমারই কাজ করতে গিয়ে ছেলেটি শেষ হয়ে গেল।

সুমিত্রা বললে, শুধু একবার ভাববেন আজ যেমন সৌম্যের জন্যে আপনার চোখে জল এল তেমনি অনেক সৌম্যের জন্যই আরও ভাই বোন এমন করে কাঁদছে। আমি শুধু এটাকেই বন্ধ করতে বলেছিলাম, অন্য কিছু নয়।

অরবিন্দ কিছু বললে না। সেণ্ট্রী এসে বললে, টাইম হয়ে গেছে। ওকে ভেতরে নিয়ে গেল।

সুমিত্রার মন সত্যিই বদলে গেছে। বিদ্যাসাগর কলেজে নকশালদের ওপর পাল্টা আক্রমণের যে নমুনা দেখাল নকশাল-বিরোধীরা তাতে পুলিশের সমর্থন যে ছিল এ কথা বুঝতে অসুবিধে হল না। রতনের চিকিৎসা আর মাঝে মধ্যে এক-আধদিন গান্ধী কলোনীতে সুধীরবাবুর বাড়িতে যোগাযোগ এই নিয়েই সুমিত্রার সময় কাটে। বৌদির মৃত্যুর পর বাচ্চাটাকে পিসীর কাছে রেখেছে ওর দাদা। যতই নির্বাচন এগিয়ে এলো ততই খুনের মাত্রা বেড়ে গেল। 'নির্বাচন বয়কট

করার' চূড়ান্ত ও মারাত্মক আন্দোলনের প্রচণ্ড কামড় খেল কয়েকজন প্রার্থী। এদের মধ্যে সিউড়ির যদুগোপাল রায়, চণ্ডীতলার সীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদত্ত মণ্ডল, দমদমের পীযূষ ঘোষ অন্যতম। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল বিশে ফেব্রুয়ারীর সকাল।

সেদিন শীতটাও একটু জাঁকিয়ে বসেছিল। সকাল থেকেই কুয়াশা। ভাল করে রোদ উঠতেও সময় লাগছিল। অজাতশত্রু হেমন্ত বসু ঘুরছেন তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র শ্যামপুকুরের দুয়ারে দুয়ারে। পাড়াপড়শীর সঙ্গে কথা কইছেন। ব্যস, দুপুরের আগেই খবর ছড়িয়ে গেল সারা কলকাতায়। হেমন্ত বসু খুন হয়েছেন। বিমল ছুটে গিয়েছিল আর-জি-করে।

সে এক নৃশংস দৃশ্য। ভাবা যায় না কত নির্মম, কত বড় নিষ্ঠুরতার শিকার হলেন তিনি, জীবনে জনতাই ছিল যার একমাত্র মূলধন। সত্য কথা দৃঢভাবে বলতে যিনি কোনদিন ভয় পেতেন না সেই মানুষটিরই এই করুণ পরিণতি বাঙলার মানুষ মানবে কেন? গঙ্গার জল সেদিন বোধ হয় জোয়ার আনতেও জোয়ারকে ঠেকিয়ে রেখেছিল তার নিজের শোক জানাতে। মহানগরীর মানুষ-গুলো সব যেন বোবা হয়ে গেল। কিছু দিন বাদে এই পথে শেষ হয়ে গেলেন হাওড়ার বিজয়ানন্দ চ্যাটার্জী। বড় কাঁচের গ্লাসে চা নিয়ে কংগ্রেস ভবনে অমৃত-বাজার পত্রিকা হাতে নিয়ে যে মানুষটি কাজ করে যেতেন নিঃস্বার্থভাবে উনষাটের-বি চৌরঙ্গিতে। এত রক্ত তবুও ভোট হল। বোধ হয় হেমন্তদার আত্মার আহ্বানে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হবার জন্যই হল। রতন এখন একটু সুস্থ হয়েছে, সে এখন সামান্য উঠে বসতে পারে। সামনের পাহারা তাই আরো মজবুত হয়েছে। দু'জনের জায়গায় এখন চারজন কনস্টেবল। সুমিত্রাই আস্তে আস্তে গ্লুকোজের জল খাওয়াতে খাওয়াতে গিয়ে বলল, হেমন্ত বসু খুন হয়েছেন। এটা বোধ হয় ভীষণ খারাপ হল।

রেগে গেল রতন। ভাল-মন্দের কি তুমি বোঝ? বিপ্লবের জন্য কোন অনু-শোচনায় ভুগতে নেই—সর্বদাই একটা লক্ষ্যে পৌছবার জন্য—নার্স ছুটে এসে ওকে শান্ত করে বলল, আপনি অমন করবেন না। কেবল একটু ভাল হয়েছেন, এতটা চেঁচামেচি করলে আবার গণ্ডগোল হয়ে যাবে। সুমিত্রা একটু লজ্জাও পেল আবার ক্ষোভও প্রকাশ করল। সেদিন দুপুরের খাওয়ার পরই একবার ভাবল বিমল-সুব্রতদের সে অনুরোধ করবে যেন নির্বাচনে প্রার্থী না হয়। যে ভাবে একের পর এক প্রার্থী খুন হচ্ছে তা ভাবিয়ে তুলেছে। সন্ধ্যার পরই মহাজাতি সদনে ফোন করে বিমলকে পেল—

আরে সুমিত্রা, কি খবর! তুমি নাকি নকশাল হয়ে গেছ? এদিকে তোমার তো কোন পাত্তাই নেই? কেমন আছ?

ভাল—

তাহলে খবরগুলো সত্যি, যা বললাম—

রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি।

বেশ তো, সে তো অনেকেই আজকাল ভয়ে ছাড়ছে—

আমি ভয়ে ছাড়িনি—

দেখা সাক্ষাত হতে পারে না মাঝে মাঝে?

অন্য কাজে বিব্রত আছি বিমলদা। একটু অনুরোধ করব, রাখবেন?

কি?—

নির্বাচনে আপনি সুব্রত, আপনারা নাই বা দাঁড়ালেন। আমার ভয় হচ্ছে—

ভীষণ জোরে হেসে উঠল বিমল—তাই বল, তুমি শেষ পর্যন্ত আমাদের নার্ভাস করতে চাও। সে তো হচ্ছে না সুমিত্রা। বরং আরও বেশী করেই দাঁড়াব, দেখি এর শেষ কোথায়?

ছাড়ছি— সুমিত্রা টেলিফোনে অন্য দিকে থেকে জানিয়ে দিল।

কে জানত যে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছিল সুমিত্রাদেরই সংসারে। দেখতে দেখতে নির্বাচন হয়ে গেল। একটা তালি দেওয়া সরকার গঠিত হল মিলেমিশে অনেককে নিয়ে। মুসলিম লীগও বাদ গেল না।

ওদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আন্দোলন চলছে ছ'দফা দাবী নিয়ে। সেখানকার ইলেকসনেও ভীষণ জিত হয়েছে শেখ মুজিবের দলের। তবুও ছ'দফা দাবীকে মানতে পিণ্ডি ও ঢাকাস্থিত পিণ্ডির মুখপাত্র নারাজ হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নিষ্পেষণ, গ্রেপ্তার। কাতারে কাতারে মানুষ ছুটতে আরম্ভ করল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সীমানা পেরিয়ে পশ্চিম বাঙলায় চলে এলো অনেকে।

॥ ছাব্বিশ ॥

কংগ্রেস দলে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর নূতন করে অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রত্যয়ে এদিকে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সারা দেশের জন সমর্থন বাড়ছে। এককথায় অবিসংবাদিত জাতীয় নেত্রী তিনি। অন্য দিকে পদ্মার ধার দিয়ে ঢেউয়ের মত মিছিল আছড়ে পড়ছে ঢাকার রমনার মাঠে ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর

আওয়ামী লীগের। শেখ মুজিবের চারধারে কামরুজ্জমান, ফণী মজুমদার, আবদুস সামাদ, তাজউদ্দীন, খন্দকার, নজরুল ইসলাম, মনসুরআলি, ইউসুফ, তোফায়েল, রাজ্জাক, শেখ মণি, নুর আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, কুদ্দুস, মাখন, শেখ কামাল আরো অনেকে।

দিল্লীতে অনেক আগেই বেশী সদস্য নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কায়েম হয়ে গেছে। পশ্চিম বাঙলায় তখন রক্তের হোলির শেষ পর্ব শুরু হয়নি। বরানগরের নবজীবন সংঘের নির্মলদা শেষ হয়ে গেলেন। সারা উত্তর শহরতলীতে শোক ছড়িয়ে পড়েছে। কত মানুষের যে উপকার করেছেন নির্মলদা তার ইয়ত্তা নেই। সেই শোক কাটতে না কাটতে বারোই আগস্ট রাত্রে সর্বনাশা মার দাঙ্গা শুরু হল। 'দলা-চাই, বদলা নাও' এই মারাত্মক খেলা শুরু হল রাত্রের আলো নিভিয়ে। গণরোষ নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তার থেকেও অন্যায়ের মাত্রা বোধহয় বেশী হয়ে গিয়েছিল। বরানগরের মাটির নীচে কান পাতলে সেদিনকার রাতের চাপা কান্না আর শেষ নিশ্বাসের সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ এখনও শোনা যায়। কেউ বুঝল কেউ বুঝল না। কেউ একে রাজনৈতিক খেলা, কেউ বা ষড়যন্ত্র, কেউ বা অভ্যুত্থান বললেও আসলে সে যে এক সর্বনাশের রাত এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শ্যামনগরের পিন্টুরা গিয়েছিল পিসীর বাড়ি বরানগরে নিমন্ত্রণ খেতে। নিমন্ত্রণ খেয়ে পিন্টু আর ফেরেনি। অচেনা ছেলে পিন্টুকে সেই রাতে বি. টি. রোডের ধারে বাস ধরতে আসবার আগেই পরপারের বাস ধরতে হয়েছে। বেশ ক'দিন বাদে লাশ পাওয়া গিয়েছিল বোধ হয় নিয়োগীপাড়ার পুকুরে।

রতন হসপিটাল থেকে সুস্থ হয়েই আলিপুর জেলে ফিরে গিয়েছিল। ওরা শেষ পর্যন্ত জেল থেকে পালিয়ে গেল সঙ্গে পাঁচ-ছ'জনকে নিয়ে। কোথাও পালিয়ে যাবার আগেই চেতলার বস্তীতে সে রাত্রে ওরা আত্মগোপন করল। কোলকাতা পুলিশে ভীষণ তোলপাড়—ওদের ধরতেই হবে।

সুমিত্রা গেছে কেশব সেন স্ট্রীটে এক বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে। রাত দশটায় বাড়ি ফিরে এসে দেখে দাদা নেই।

বাড়ির কাজ করবার লোকটা বললে, দাদা বলেছেন ফিরতে রাত হবে।

শেষ পর্যন্ত চেতলা বস্তির কাছাকাছি অঞ্চলে যে ওরা রাতে লুকিয়ে আছে সে খবর জানতে পুলিশের সময় লাগেনি। রতনদের আইডেন্টিফাই করতে পারে এমন একজন এস্-বি-র বড় অফিসার আর পুলিশ নিয়ে চেতলার আট নম্বর বস্তিটা প্রায় ঘিরে ফেলা হল রাত এগারোটায়। রাত বারোটার মধ্যে শুরু হয়ে গেল মারাত্মক লড়াই। সারা আলিপুরের ঘুম কেড়ে নেবার জোগাড়।

এত বোমা বৃষ্টি। একেবারে খাঁটি এন-কাউন্টার যাকে বলে। পরিতোষ জানত রতনের সঙ্গে সুমিত্রার সম্পর্কের সামান্য কিছু কথা। কিন্তু তাই বলে সে কথা ভাবার সময় তখন কই। দু'জন কনস্টেবল ইতিমধ্যেই মারাত্মক ঘায়েল হয়েছে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ। হাওলদার একজন তাদের টেনে ভ্যানে তুলছে। প্রতিবেশীরাও জেগেছে, তবে কেউ এগিয়ে আসছে না।

আট নম্বর বস্তিতে এই বীভৎস রাত এর আগে আসেনি।

বোমার আওয়াজ একটু কম হয়েছে। পুলিশ ভাবলে ওদের সব শেষ। এক পা দু'পা করে এগোতেই প্রচণ্ড জোরে গ্রেনেড ফাটল, সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে মাটিতে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটিয়ে গড়িয়ে পড়লেন এস-এ-পি'র সাব-ইনসপেক্টর রাম মঙ্গল সিং। পরে অবশ্য মরণোত্তর রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক পেয়েছিল। রাম মঙ্গল সিং-এর ঘটনার পর পুলিশ আর চুপ করে না থেকে ফায়ার ওপেন করল। ততক্ষণে ঘরের ভেতর থাকা আহত, নিহত, জীবিত সবাই চুপ। সাত-জনের তালিকায় দুজন নিহত, তিনজন আহত, আর দুজন মোটামুটি অক্ষত।

সুমিত্রার দাদা একটু একটু করে এগোচ্ছিল দেখতে শেষ পর্যন্ত কি হয়? ততক্ষণ শুধু ধোঁয়া ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

নিহত দু'জনের একজন রতন। গান্ধী কলোনীর রতন শেষ। এস-এ-পি'র স্টেনগানের গুলি একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

সুমিত্রার দাদার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। একদিকে সুমিত্রা অন্যদিকে রতন—কোনটাকে নিয়ে বেশী ভাববে—এই মুহূর্তেই তার থেকেও বড় হল কর্তব্য। চেতলা বস্তির অপারেশন সেরে অনেক রাতে যখন সুমিত্রার দাদা বাড়ি ফিরেছে তখন সুমিত্রা ঘুমিয়ে। ইচ্ছে করেই জাগাল না। সবই তো কালকের কাগজে বেরিয়ে যাবে।

অজয়-নাহার মন্ত্রীসভার মেয়াদও শেষ হয়ে এলো। জুন মাসে নারায়ণ কর নৃশংসভাবে খুন হল বেলেঘাটায়। ইন্দোর সম্মেলন থেকে ফিরেই নারায়ণের এই মর্মান্তিক মৃত্যু সরকার পক্ষের যুব শক্তিকে উন্মাদ করে দিল। নারায়ণ ছিল বিমলের নিজস্ব বিশ্বস্ত একমাত্র কোলকাতার ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস। আদর্শ-বাদী সৎ নির্ভীক এই নারায়ণের মৃত্যুর রোষ গিয়ে পড়ল সরকারের প্রশাসন ব্যর্থতার ওপর। দেখতে দেখতে তপেশ ধরও শেষ হয়ে গেল। একদিকে এই খেলা অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের ভীড়। সরকার আর রইল না। রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে এলো আর একবার পশ্চিম বাংলার উপরে।

পূবের হাওয়া (বাঙলাদেশ) এদিকে গঙ্গার জোয়ারে মাতন জাগাল। গঙ্গা

পদ্মার থৈ থৈ অবস্থা। তেসরা ডিসেম্বর ব্রিগেডে ইন্দিরার সভায় জয়ধ্বনি হল—ইন্দিরা-মুজিবর জিন্দাবাদ। ক'দিন পরেই স্লোগানটা একটু বড় হয়ে রূপ নিল, "বিশ্বে এনেছে নূতন দিন, ইন্দিরা, মুজিব, কোসিগিন।"

ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের যে ভিত রচনা হল ১৯৭১-এর ৯ই আগস্ট দিল্লীতে তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রেরণা নূতন শক্তি দিল বাঙলাদেশে। পান খেতে খেতে মুচকি হেসে ঘনশ্যামদাস ঝুনঝুনওয়ালা বললে, আরে বাপু এত ভাবার কি আছে? এ সব একটা গেম। খেলা শেষ হয়ে এলো, ভেবে চিন্তে কাজ করা যাবে। এমন সর্বনাশ কি হল? গোলমালে প্রোডাকশন যেমন হয়নি, তেমনি লে-অফ ছাঁটাই তো সমানে করেছি। আমাদের লোকশানটা হল কোথায়? দেখুন, অপেক্ষা করুন, নিউ অবস্থা হবে। তাছাড়া খুনোখুনিতে আমরা তো কেউ সাফার করিনি। তার জন্য অবশ্য আমরা চাঁদা দিয়েছি অনেক। কিন্তু সে তো একরকম প্রোটেকশন মানি। ঘরে দারোয়ান রাখলেও তাকে দিতে হয়।

ঘনশ্যামবাবুর এই প্রাঞ্জল তথ্য ও ভাষণ সবার পছন্দ হল না। ওরা শুধু সিদ্ধান্ত নিলেন, দিল্লী গিয়ে হোম-মিনিস্ট্রিকে সব জানাবেন। তবে সাবধান, কোন পাবলিসিটি যেন না হয়।

চেম্বার অফ কর্মাসের কোন দাদা কত পেয়েছিলেন জানা নেই। তবে যাই হোক না কেন তাদের যে খুব সর্বনাশ হয়নি এটা ঘনশ্যামবাবুর কথাতেই বেশ বোঝা যায়। সুদে আসলে কিন্তু বাঙলার চেহারাটা হল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের মত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পুলিশ প্রোটেকশন কারখানার সামনে, কিংবা মোটা চাঁদা দিয়ে পাড়ার উঠ্‌তি মস্তানদের সাহায্যে প্রোটেকশনের ব্যবহার বাঙলার বিত্তশালী এবং তাদের মধ্যে যারা শহুরে তাদের তো কথাই নেই। অবশ্য গ্রামবাঙলায় বন্দুকধারী জমির মালিকদের এক আধ জায়গায় একটু অসুবিধে হয়েছিল। তবে সর্বনাশের আগুন তাদের খুব একটা স্পর্শ করেনি।

সর্বনাশ যা হল তা বাঙলার যৌবনের, বাঙলার সামাজিক বাঙলার সাংসারিক কৌলিন্যের, আর পাড়ায় পাড়ায় আবহমানকাল ধরে চলে আসা বাঙলার ভ্রাতৃত্বের। কি যে হিংসা সর্বনাশের আগুন জেলে বাঙলার যৌবনের মেলার সামিয়ানা পুড়িয়ে দিল তা আর জোড়া লাগল না। সর্বনাশ যা হল তা বাঙালীর নবশক্তির। বাঙালীর রেঁনেসা আর একবার হয়তো আসতে চেয়েছিল। হয়তো এই পথ দিয়েই। কিন্তু সবটাই কেমন যেন কক্ষচ্যুত হয়ে গেল।

চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। পোড়া ছাইয়ের গাদা আর শ্মশানের ছেঁড়া কাপড় কলসী নিয়ে হয় তন্ত্রসাধনার জন্য সব ভৈরবী কাপালিকের সাধনার জন্য অপেক্ষা করছে অথবা ম্রিয়মাণ ক্ষয়িষ্ণু একটা শেষ আয়োজন বিদায়ের বসন্তের মুহূর্ত গুনছে। ইতিহাস এর উত্তর দেবে।

এপার বাঙলার বিভীষিকার শেষ সকাল, শেষ দুপুর, শেষ বিকেলগুলোতে যখন ক্লান্তি, হতাশা, অবসাদ, পাথর চাপা কান্না তখন ওপারের বাঙলা জাগছে। বলছে—'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে দুর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

ওপারের স্বাধীনতার ডাক এসে গেল। রবীন্দ্রনাথের গানের কলি পদ্মায় জোয়ার ডাকল। শেখ মুজিবের কণ্ঠ ছাপিয়ে লক্ষ মুজিবের ধ্বনি বাঙলার আকাশবাতাসকে উত্তাল করে তুলল। সারা বাঙলার এক আওয়াজ—'জয় বাঙলা'। বঙ্গভঙ্গের পর এমন জোর গলায় বাঙলার জয়ধ্বনি আর কে করেছে। ওপার বাঙলার মুক্তির গানে কণ্ঠ দিতে এপার বাঙলার পুত্রহারা গান্ধী কলোনীর সুধীরবাবু শোকে মুহ্যমান হয়ে রাতে রেডিও শোনেন। সাধের বাঙলা দেশের সংগ্রামের কথা শুনতে কার না ভাল লাগে? পুত্রহারা পিতা, সন্তানহারা জননী সবাই উদগ্রীব বাঙলাদেশের জন্য।

ওরা বলতে চায় বোধ হয় রক্ত দিয়েছি ওপারের দাঙ্গায়, মহামারীতে, ইংরেজের অত্যাচারে, ফাঁসির মঞ্চে, দেশ ভাগ হওয়ার সেই দুর্যোগের রাতে—আরও একবার না হয় দিলাম নকশাল, কংগ্রেস, সি-পি-এম, সি-আর-পি আর বোমাবাজদের তাণ্ডবে—তবুও যে আমরা নবজাগরণের দূত—আমরা বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে। আমরা কাঁদি আমরা হাসি, আমরা রক্তে বুক ভাসাই। রাজনীতির মারামারিতে ভাইয়ের রাখী ভাই ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু তবুও যখন এমন কোন ডাক পাই, যে ডাকে স্বাধীনতার গান, শোষণহীনের গান, তখন যেন মুক্তিযুদ্ধের ডাক এসেছে। কুদ্দুস, মাখন, সিরাজ, সিদ্দিকীর দলের পাশে দাঁড়াবার এই তো সময়।

রতনের মৃত্যুর পর সুমিত্রার দাদা একমাসের ছুটি নিয়ে পুরী চলে গেলেন। সুমিত্রা যেতে চাইল না। কেমন যেন বদলে গেছে সুমিত্রা এখন, পিসীর বাড়িতে আছে। কোথাও বের হয় না। রতনের মৃত্যুর খবর কাগজে পড়ে জানবার পর একবার শুধু বিকেলবেলায় গান্ধী কলোনীতে গিয়েছিল। পোস্টমর্টেম করে লাশ তখন এসেছে গান্ধী কলোনীতে। রতনের খেলোয়াড় ভাইটির চোখে জল। অন্তত এটুকু বলতে পারবে—দাদা চুরি করে মরেনি, লড়তে গিয়ে মরেছে।

সুমিত্রা আর রতনের সম্পর্কটা গান্ধী কলোনীর কেউ বিশেষ একটা জানে না, জানে কিছুটা রতনের মা। তারও কোন জবাব নেই সুমিত্রার কাছে। সুমিত্রারই বা কি জবাব আছে ? রতন বাঁচলে তো বলত, সুমিত্রা, শেষ পর্যন্ত তোমার দাদা এলো আমায় শেষ করতে!

সুমিত্রার চোখে জল এলেও নিজেকেই যেন অপরাধী মনে করছে। দাদাকে কি বলবে সুমিত্রা। সে তো দায়িত্ব পালন করতে গেছে। কিন্তু সুমিত্রার এখন দায়িত্ব কি ?

রতনই বা ক'দিন জেনেছে সুমিত্রাকে ? সুমিত্রাও তো রতনকে অত বেশী করে জানতে চায়নি। শুধু দেখছে সমষ্টি একটা প্রাণ তার নিজের বিশ্বাস, তার নিজের চিন্তা আর আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল। সেই তো খাঁটি সোনা। এর থেকে আর বেশী কিছু বুঝতে চায় না সুমিত্রা। কিন্তু সেই দীপ তো নির্বাপিত হয়ে গেল। এবারে সেই পথ কি সুমিত্রার পথ হবে ?

বিমল-সুব্রতরা ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেদের এবার জয় বাঙলার আন্দোলনে। দিনরাত মুজিবনগর, এম-এল-এ হোস্টেল আর বাঙলাদেশের কথা। মুজিবের মুক্তির দাবীতে সেই বিরাট মিছিল নিয়ে এলো বিমল বাঙলাদেশ মিশনের সামনে। তখনও সেটা পাকিস্তান কমিশনের অফিস। সে এক সুন্দর মুহূর্ত। সারা মহানগরীর ছেলেমেয়ে এক জায়গায় একাকার।

মিছিল শেষে বিমল কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছিল সুমিত্রার বাড়িতে। ওর দাদা পুরী যাবার জিনিস গোছাচ্ছে।

সুমি, আমাকে তুই কোনদিন ক্ষমা করবি না জানি, তোর বৌদি বেঁচে থাকলেও করত না। তোরা ভাবলি আমরা পুলিশ, আমাদের হৃদয় নেই কিন্তু কাজটা ছেড়ে দিলে কি খাব বলত। আর কাজটা করলে কর্তব্য পালন না করে কি করি ? আমাদের কোন কূলেই ভালবাসা নেই রে। সুমিত্রার দাদা বললে সুমিত্রার ঘরে এসে। সে তখন ওর দাদার সুটকেস গুছিয়ে রেখেছে। আমার কি বল ? এমন তো কত পরিচিত ছেলেই কত ভাবে হারিয়ে যায়, ক'জন তাদের জন্য ভাবে বলতো। আমিই বেশী কেন ভাবব ? সুমিত্রা বললে। সুমিত্রার দাদা বুঝলে এ ওর অভিমানের কথা। কিন্তু কিছু করবার নেই। এমন সময় বিমল এসে হাজির হয়েছে ওদের বাড়িতে। সরকার পক্ষের লোক। একটু আদর-যত্ন করার ইচ্ছে সুমিত্রার দাদার থাকলেও অবকাশ কম। বিমল নিজেই বললে, আপনি অত অস্থির হবেন না, আমি এমনি এসেছি সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে।

ভেতরের ঘরে সুমিত্রা এক পেয়ালা চা নিয়ে ঢুকল।

কেমন আছ সুমিত্রা ?

ভাল—

রতনের ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের, এক চুমুক চা খেয়ে বললে বিমল।

তাই নাকি ? তা এই সমবেদনা যদি ওর বাবার কাছে গান্ধী কলোনীতে গিয়ে জানাতে তাহলে ভাল হত। উনি ভাবতেন সরকারের লোকেরাও তাঁর পাশে সমব্যথী। সুমিত্রা বললে।

না মানে, ভুল বুঝো না, আমি শুধু জানি তুমি ওকে পছন্দ করতে। তাই তোমার কাছে এসেছি সুমিত্রা। বিমল একটু আস্তে করেই বললে।

ওকে পছন্দ করতুম, না ওর আদর্শকে পছন্দ করতুম সব খবর তো তুমিও জানো না বিমলদা, মিছিমিছি—

আমি যদি তোমায় আঘাত দিয়ে থাকি সুমিত্রা তাহলে আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার চিন্তাভাবনা বা স্বাধীনতার ওপর আমি হস্তক্ষেপ করতে আসিনি—

বিমলের কথা শেষ না হতেই সুমিত্রা বললে, আপনি মিছিমিছি নিজেকে বিব্রত করছেন, আমি কিছুই মনে করিনি।

একটা কথা বলব সুমিত্রা ?

বলুন।

বাঙালাদেশের শরণার্থী আর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে অনেক স্বেচ্ছাসেবক দরকার। এর মধ্যে কোন রাজনীতি নেই, তুমি দায়িত্ব নেবে ?

হেসে বললে সুমিত্রা, রতনের সঙ্গে সংযোগ ছিল এই অপরাধে যদি সেখান থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয় একদিন, তখন কি হবে ?

না না, সেটা কোন ব্যাপার না। সত্যিই বলছি সুমিত্রা, ভীষণ ভাল হত তুমি যদি দায়িত্ব নিতে।

ভেবে বলব বিমলদা, এখন আর কিছু করার মত অবস্থা নেই।

সুমিত্রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমল এলো এম-এল-এ হোস্টেলে। সেখানে সাজাহান-সিরাজদের এক দল এনেছে নূতন। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

জেল ভর্তি কয়েক শো করে ছেলে আসানসোল, বহরমপুর, দমদম, মাদ্রাজ,-অন্ধ্রপ্রদেশ, আলিপুরে।

জেলের বাইরে বেকারের মিছিলে হাজার ছেলের ভীড়। 'সান অব দি সয়েল'-এর জবের জন্য সেমিনার। অন্য দিকে সল্ট লেকে উদ্বাস্তুদের লাইনের পর

লাইন তাঁবু। পয়সা লোটার মানুষও কম ভীড়ে পড়েনি এই সুবাদে। সরকারের ঢালাও সাহায্য, রেড ক্রস কেউ বাদ নেই। কেউ করছে মুক্তিযুদ্ধ। কেউবা নিজের বরাত ফিরিয়ে নিচ্ছে এই সুবাদে দুটো পয়সা করে। শেষ পর্যন্ত বাঙলাদেশ স্বাধীন হলো। মুজিব মুক্ত হলো। এদেশের কংগ্রেসীদের ভোটযুদ্ধে বাজীমাত করার জন্ত নৌকার পালে জোর হাওয়া লাগল। ছয়ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এলেন কলকাতার ব্রিগেডে। কত লোক তার হিসেব নেই। লোকে লোকারণ্য। লাল পেড়ে শাড়ি পড়া ইন্দিরা গান্ধী। বিজয়িনীর বেশে দাঁড়িয়ে সহস্র লক্ষ মানুষের অভিনন্দনের প্রত্যাশায়। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বাঙলাদেশের বীভৎস হত্যালীলার বিবরণ দিলেন শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায়। ব্রিগেডের মানুষ চোখের জল মুছল। সভাশেষে বাড়ি ফিরতে সেদিন অনেকের রাত হল। সবার মুখেই ইন্দিরা-মুজিবের কথা। পাড়ায় পাড়ায় অংশুমান রায়ের আহা একটি মুজিবের থেকে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনির রেকর্ড বাজতে লাগল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, চাপা পড়ে গেল ওপার বাঙলার রক্তনদীর প্লাবনে হাজার যুবকের অভিশপ্ত যৌবনের শেষ রাতের কথা। যাদবপুর, দমদম, বরানগর, উত্তরপাড়া, কাঁচরাপাড়া, বর্ধমান, শান্তিপুর, বেলেঘাটার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এখন স্তিমিত, প্রায় নেই বললেই চলে। ক্যালকাটা ক্লাবের শেষ ডিনারে সি-আর-পির কমাণ্ডান্ট বেশ করে হুইস্কি টানল। এবার ফৌজ নিয়ে ঘরে ফেরার পালা। এদিকের যুদ্ধও নাকি শেষ। বাঙলার যৌবনকে ভর্ৎসনা করে যাবার আনন্দে ক্যাপ্টেন ভাটিয়া আর ডি-আই-জি বঙ্গনন্দন সেন সাহেব যখন মশগুল তখন ইংরেজ আমলের কথা মনে পড়ছিল। আগ্নেয়গিরির লাভা নির্গমন বন্ধ হল বটে কিন্তু অনেক রক্ত অনেক নাম দিয়ে যে বাঙলার প্রতিটি পথঘাট চিহ্নিত হল তা কি কোনদিনও আর গর্জন করবে না? এ কথার উত্তর না জানে ক্যাপ্টেন ভাটিয়া, না জানে ডি-আই-জি সেনসাহেব, না জানে চেম্বার অব কমার্সের ঘনশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা।

রাতের হাওড়া স্টেশনকে সাক্ষী রেখে রাতে দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্মৌ থেকে সি-আর-পি আর পাঞ্জাব ও ইউ-পি'র সশস্ত্র পুলিশের ব্যাটেলিয়ান আসতে লাগল কোলকাতায়। উদ্দেশ্য যদিও বলা হল বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঙলা বাঁচান, তবুও গুছিয়ে বলতে গেলে চরমপন্থীদের রুখতে ও তাদের উপদ্রব মোকাবেলা করতে তারা এলেন দিল্লীর নির্দেশে। নদীয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, বীরভূম, শিলিগুড়ি, চব্বিশ পরগণার কিছু অংশ, হুগলি আর সমগ্র কোলকাতা হলো এদের বিচরণভূমি।

প্রায়ই সকালে পুলিশের, সাধারণ মানুষের ও যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকার যে দৃশ্য ঘটতে লাগল কারো মতে এগুলো এন-কাউণ্টারের ফল, কেউ বা বললেন পুলিশ নিজে থেকে মেরে এগুলো ফেলে রেখেছে।

সেদিন রোববারের সকাল। সুমিত্রার দাদা পরিতোষ বেরিয়েছে বাইরে—। আসলে সেদিন বিশেষ কোন কাজও ছিল না। গোখেল রোডেই কোন এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা করার কথা ছিল। সেখানে যাদবপুরের অপারেশন নিয়ে সামান্য আলোচনা হবে।

যাদবপুরের ত্রাসের নায়ক বুলা বা ছোট খোকা তখন সমগ্র সন্তোষপুর, হালতু, রামলাল বাজার, শহীদ নগরের একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। লাটবাগানের হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র আর ইছাপুরের খোয়া যাওয়া হাতিয়ারের পেটি নাকি ছোট খোকারই হেফাজতে আছে। ছোট খোকা কোনদিন স্কুলের পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। তার আদৌ কোন পুঁথিগত পরিচয় কোন বিপ্লব বা বিপ্লবী তত্ত্বের সঙ্গে আছে কিনা তাও কেউ জানে না। তবুও ছোট খোকার নাম ছড়িয়ে গেছে। কেউ বা তাকে বর্ণনা দেয় না দেখেই—সে নাকি চে গুয়েভারা[illegible]। কেউ বলে, না, সে গেরিলা লড়াই যে কায়দায় শিখেছে তাতে মনে হচ্ছে বিদেশ থেকে তালিম নিয়ে এসেছে।

যাদবপুর অপারেশন "জেড" এই হলো ছোট খোকাদের অস্ত্রাগার হাত করার পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগের কোড। পরিতোষ গোটা জিনিসটা খুঁটিয়ে দেখছে। ছোট খোকার মায়ের ভীষণ অসুখ। সে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটালে আছে। তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। একবারটি ছোট খোকা দেখতে আসবে না? তাছাড়া রামলাল বাজারে ছোট খোকার সঙ্গে যে মেয়েটির ভাব আছে তাকেও জোর করে বিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে তার বাড়ি থেকে। সে ব্যাপারেও কি ছোট খোকা চুপ করে থাকবে? এমনি আরো কয়েকটা ব্যাপারে ছোট খোকাকে ট্রাপ করার কথা ভেবেছে পরিতোষ।

ছোট খোকার সাকরেদরাও খবর জোগাড় করেছে পুলিশের কে বা কারা এ কাজে জড়িত। তখন এস-বি-র লর্ড সিনহা রোডের অনেক অল্প মাইনের অফিসার বা কনস্টেবল যারা বেহালা, যাদবপুর, কাশীপুর, কসবা অঞ্চলে থাকত তারা নিজেদের এলাকার কম্বিং-এর খবর পেলে আগে থেকেই কিছু খবর আঁচ করে নিয়ে এখানকার ছোট খোকাদের জানিয়ে দিয়ে নিজেরা তাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে মাথাটা কোন মতে বাঁচিয়ে রাখত। এর জন্য পুলিশের তৈরী করা প্ল্যান অনুযায়ী বহু অপারেশন ফেল হয়েছে। ছোট খোকার কাছেও

খবর এসেছে পুলিশী তৎপরতা সম্বন্ধে।

দুপুরবেলা গোখেল রোড থেকে পরিতোষ ফিরে আসছে বাড়ির দিকে। সাউথ এণ্ড পার্কের মুখটায় একেবারে পরিতোষকে লক্ষ্য করে খুব ভারী গ্রেনেডের মত কিছু ছুঁড়ে মারল কয়েকজন। প্রচণ্ড শব্দে জিপটা দুমড়ে সাদার্ন এভেনিউতে পড়ে গেল। পরিতোষের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। মুখের সামনেটায় বীভৎস। যমে মানুষে লড়াই হল কর্তব্যপরায়ণ এই অফিসারটিকে নিয়ে কিন্তু ভোর হবার আগেই সুমিত্রাদের সবাইকে শোকে ভাসিয়ে কোলকাতা পুলিশের সৎ নির্ভীক ও কর্তব্যপরায়ণ এই লোকটি চলে গেল ওপারে।

সুমিত্রা সারাক্ষণই হসপিটালে ছিল। যে ভাবে সর্বনাশের মুহূর্তটি এগিয়ে এল তাকে কোন মতেই মেনে নিতে তৈরী ছিল না সুমিত্রা। কদিন আগেই গান্ধী কলোনীর রতনের অন্তিম যাত্রা দেখে এসেছে। এবার ওর নিজের ঘরেই এই যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

পুলিশের ভ্যান আর কর্তা ব্যক্তিদের ভীড়ে সকালবেলা পি. জি. হসপিটাল গম গম করছে। স্বয়ং হোম-সেক্রেটারী এসেছেন, সঙ্গে কোলকাতা পুলিশের কমিশনার। সুমিত্রাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছেন আরো অনেকে। খবরটা কেবল পুলিশের লোকেরা জেনেছে। এখনও সবার কাছে তা পৌঁছায় নি।

রতন চেয়েছিল বিপ্লব হোক—সে চাওয়া ও পাওয়ার অর্থ বোঝবার আগেই ঝরে গেল। ওর দাদা চেয়েছিল আদর্শবান, সৎ, নির্ভীক; কর্তব্যপরায়ণ অফিসার হ'তে। কিন্তু জীবনযুদ্ধের যন্ত্রণায় এই নির্মম দায়িত্ব পালনে যখন বিবেক যন্ত্রণায় অস্থির হত তখন বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে বলে ফেলত। তাই রতন, অরবিন্দ সেন, বিমল, সুব্রতদের মত ভালমন্দের রাজনীতি করা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করায় সুমিত্রাকে কখনও ভর্ৎসনা করেনি।

এখন হয়ত যাদবপুরের সন্ত্রাসের নায়ক ছোট খোকার প্রচণ্ড আনন্দ সে তার শিকার পেয়েছে বলে। ছোট খোকা এনকাউণ্টারে মারা গেলে তবুও তার নামে দেওয়ালে হয়ত কেউ লিখত 'শহীদ তোমায় লাল সেলাম'। কিন্তু পরিতোষদের জন্য শেষ যাত্রায় মর্যাদা অনুযায়ী পুলিশের বিউগিল ছাড়া আর কেউ তো কোন সম্মান জানাবে না। ইতিহাসে এদের নাম চিহ্নিত হবে ঘাতকের খাতায় রাজনৈতিক আন্দোলনের পঞ্জিকাতে, আর যারা এদের শেষ করে দিল তারা হবে শহীদ।

কোলকাতা পুলিশে চাপা অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠল পরিতোষের মৃত্যুতে। কিন্তু

কি হবে কোন উপায় নেই। যাদবপুরের দায়িত্বশীল অফিসার মহান্তির চোখগুলো বাঘের মত জ্বলে উঠল। যেন নির্দেশ পেলেই ছোট খোকাকে খেয়ে ফেলে। প্রেসিডেন্সী রেঞ্জের ডি-আই-জি বললেন, যাদবপুরের ব্যাপারে আর একমুহূর্ত দেরী নয়।

পরিতোষের শবদাহ হবার আগেই যাদবপুর সন্তোষপুরে পুলিশের যেন যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল।

পরদিন দুপুর নাগাদ আহত অবস্থায় ছোট খোকা আত্মসমর্পণ করল গড়িয়ার এক পুকুর পাড়ে। জবানবন্দীতে সে জানাল যে মোট উনিশ জনকে সে মেরেছে তার মধ্যে সাতজনই হলো পুলিশের লোক। কোন মতেই কিন্তু কোনদিক দিয়ে উদ্ধার করা গেল না যে ছোট খোকা কোন বিশেষ রাজনীতিতে যুক্ত। আসলে তখন এই গরম হাওয়ায় অনেক সমাজবিরোধীও নিজেদের দৌরাত্ম্য কায়েম করতে এমনই কিছু রাজনীতির সুযোগ যে নিয়েছিল তা ছোট খোকাকে গ্রেপ্তারের পর স্পষ্ট হল। কিন্তু ছোট খোকা গ্রেপ্তার হবার পরই হালতুতে তাকে লাল সেলাম জানিয়ে পোষ্টার পড়ে গেল।

সুমিত্রার দাদা'র এই খবর পেয়ে পরদিন ভোরবেলায় ট্যাক্সি করে যারা সুমিত্রাকে দেখতে এলেন তারা গান্ধী কলোনীর সুধীরবাবু এবং রতনের মা। কি ভাষায় শান্ত করবেন তারা সুমিত্রাকে ? তাদের রতনের জন্য তাদেরকে শান্ত করতেই সুমিত্রার সময় কেটেছে কিছুদিন আগে।

আজ ত কোন ভাষা নেই।

সুমিত্রার মা বোবা হয়ে গেছেন। পুত্রবধূ আর পুত্রের জোড়া শোকে নিজেকেই অপরাধী ভেবে তিনি শয্যা নিয়েছেন। কোন কথা নেই—!

সুমিত্রার পিসী ওর মা'র কাছে বসে। শক্ত হয়েই সুমিত্রা বাড়িতে-আসা লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে। পাড়ার ছেলেরাও এ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নি। তারাও কেমন যেন সব রাগে ফুঁসছে,—কিছু করার নেই।

সুমিত্রার আজ ভীষণ ইচ্ছে করছে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে বলতে তোমাদের যুদ্ধে রতন গেল প্রশাসনের হাতে, দাদা গেলেন তোমাদের হাতে—সৌম্য গেল তোমাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের যুদ্ধে, তার পরেও দেখ আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা দিল্লী, কোলকাতা বম্বেতে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে তাকে নিরাপদ রাখতে মোটা লোহার গ্রীলের ওপর লোহার নেট লাগিয়ে তাকে রক্ষা করছে। তোমাদের রক্ষায় কারাপ্রাচীরের সান্ত্রীর চোখে ঘুম নেই। কোলকাতার শান্তির জন্য সি-আর-পির ঘুম নেই। কিন্তু ভিখিরির মিছিলে, ফুটপাতে, গ্রামের ভেতরে

কোন পাহারা নেই—তারা শুধু মুক্ত নয়—তারা অভিশপ্ত এই জেনে যে এ লড়াইয়ের কোন ফসলে তাদের অংশ আজও ঠিক হয় নি।"

কোথায় যুদ্ধ? শহরের আতঙ্ক মধ্যবিত্তের ঘুম নষ্ট হবার জন্যে, গ্রামের আতঙ্ক ধান লুট হবার জন্য, পুলিশের আতঙ্ক বন্দুক হারাবার ভয়ে।

কিন্তু যাদের পাবার জন্য, বাঁচার জন্য এই যুদ্ধ তারা উৎসাহিত হচ্ছে না কেন? কেন তারা দলে দলে গ্রামে দুর্গ গড়ে শহর ঘিরে ফেলছে না? এমনি আরও সাত পাঁচ কথা এখন সুমিত্রার মনে। শেষ পর্যন্ত জেলখানায় অরবিন্দর সাক্ষাৎ-প্রার্থী হলো সুমিত্রা।

অরবিন্দ বললে, জেলে বসেই সব জেনেছি কোলকাতায় তার পরও কি হয়েছে —কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি এ সব ঘটনা বিক্ষিপ্ত হলেও ঘটবে—

অরবিন্দকে পুরো বলতে না দিয়ে সুমিত্রা বললে—আমি সেজন্য আসিনি। আমি এসেছি এটুকু জানতে—জেলের গরাদ ভাঙ্গার ঐক্য আপনাদের আছে? দেশের মানুষকে চাপ দেবার ঐক্য আপনাদের আছে? সবাইকে বিশ্বাস করার ঐক্য আপনাদের আছে? তাহলে জানবেন সবাই আছে—তা না হলে আপনাদের কোন অধিকার নেই—এ ভাবে চলার।

অরবিন্দ শান্ত হয়ে বললে, কি বলছেন? আপনার কোন কথাই বুঝতে পারছি না। কোন্ ঐক্য—কিসের ঐক্য?

সুমিত্রা বললে, গুছিয়ে বলতে পারি না বলেই ত আপনাদের মত বিপ্লবী হতে পারিনি—তবে অগোছালো কথাকে যে সাজিয়ে নিয়ে বোঝে সেই তো নেতা। আপনাদের কি সে যোগ্যতাও নেই।

দেখুন—আপনার দাদার জন্য আপনি নিশ্চয়ই শোকার্ত কিন্তু আরো অনেক ছেলে এমন করে রোজ শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের কথা ভাবুনতো। তাদের জন্যও তো কেউ কাঁদছে।—অরবিন্দ বললে।

হ্যাঁ যেমন সৌম্যর মৃত্যু। কিভাবে কি যুক্তিতে কাঁদবে ওদের পরিবার আপনি বলতে পারেন?—

সুমিত্রার এই কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না অরবিন্দ।—সে বললে সৌম্য একটা এ্যাকসিডেণ্ট।

বই থেকে তোলা বাছাবাছা যুক্তিগুলো সাজিয়ে বলতে মন্দ লাগে না কিন্তু মানুষের মনের ভেতরে যে আর একটা আর্তনাদ থাকে সেটাকে কখনো শুনেছেন—সুমিত্রা বললে—

বড় কাজে দুর্বলতা তো আর এক শত্রু। তাইতো আমরা বলি, "আজ অনুশোচনার

দিন নয়, আজ আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন।"

এ জিনিস তো আজ আমাদের পরিবার ভাবতে পারে—সৌম্যের পরিবার ভাবতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে কি এর ভাষা আলাদা হবে?

সুমিত্রার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে অরবিন্দ বললে, আমি বলব, আপনি এখন শোকার্ত—ধৈর্য্য ধরে গোটা দেশটাকে একবার ভাবুন, এর জুলুম, শোষণ, অত্যাচার আর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কি হবে ভাষা আপনি নিজে ঠিক করুন তারপর একদিন আলোচনা করা যাবে।

সুমিত্রা বললে, আমি শোকার্ত নই—আমিও আগুনের মত জ্বলে উঠতে চাইছি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যারা মত বলে দেয় কিন্তু পথ বলে না—উদাহরণ দেয় কিন্তু নিজেকে উদাহরণ করে না—স্বপ্ন দেখে রঙীন সকাল হবে কিন্তু অন্যকে দেখাতে সাহায্য করে না। আমি মনে করি প্রতি দশকেই একটা করে পরিবর্তনের সম্ভাবনায় হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়ে এরা সবটা গুলিয়ে দেয় তারপর অবসাদ, ক্লান্তি আর আত্মসমীক্ষার নামে সোয়াস্তির আসরে অবসর জীবন কাটায়। এদের কৈফিয়ত তলব করা উচিত মিলিটারী কোর্ট মার্শালের কায়দায়।

অরবিন্দ বললে, আপনার কথার বিরুদ্ধে আমার আপাতত: কোন মত নেই—তবে কাকে কিভাবে আপনি চিহ্নিত করছেন না জেনে কিছু বলব না।

সুমিত্রা যখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে তখন জাজেস কোর্ট দিয়ে মিছিল চলেছে হাজরার দিকে বাঙলা দেশের মুক্তির সমর্থনে। "মুজিব তুমি লড়াই কর, ভারত তোমার পাশে আছে।" কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সুমিত্রা, তারপরই মিছিলের পেছনে থেমে থাকা একটা ট্রামে উঠল রাসবিহারী যেতে।

দিল্লীতে কংগ্রেসের জমজমাট অবস্থা। চারদিকে নূতন হাওয়া। বাঙলার স্বল্পকালীন দায়দায়িত্বে অতীতের সমস্ত নজীরকে ভেঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এতেই রাইটার্সের দিকে তাকিয়ে সহস্র কংগ্রেসীর মনে নূতন আশার ঝিলিক।

মহাজাতি সদনে আজ রক্তের ঋণ শোধ বা স্মরণ সভার মত এক বিশেষ অনুষ্ঠান করেছে বিমল, সুকুল, সুব্রতরা।

একটা বিরাট তালিকায় অনেকগুলো নাম লেখা একটা বেদীর নীচে শুধু ফুল আর ধূপ জ্বলছে।

কোলকাতার দীপক সরকার, বিপুল রায়, বিরাটির নিত্য দত্ত, বরানগরের নির্মলদা, চব্বিশ পরগণার সমীর, আগরপাড়ার অসীম, গোপাল দেবনাথ, মেদিনীপুরের বসন্ত, বর্ধমানের ইন্দু, মলয়, জীতেন, প্রণব, গুণমণি, ভবানী, পুরুলিয়ার শুভংকর,

কাটোয়ার স্বয়ন্তু, বীরভূমের শশী, মলয়, অমল আরো কত নাম। যারা আর কেউ নেই অথচ যারা অনেকদিন থাকতে চেয়েছিল। চোখের জলে এদের বিদায় দিয়েছে সবাই। চিতার পর চিতায় সাজান মিছিলের মত করে অন্তিম যাত্রার মুহূর্ত রক্তের আলপনার উপর দিয়ে।

মহাজাতি সদনের দেওয়ালে ইংরেজকে লড়া সব বীরদের, শহীদের ছবিতে গৃহ তীর্থে পরিণত। কিন্তু যাদের তর্পণ হচ্ছিল তারা সবাই সে সম্মান পাবে না হয়ত, কারণ তারা নিঃশেষিত কালের যাত্রায় রাজনীতির আক্রোশ-প্রতিশোধের নিয়মে। তবুও যেন কোথায় ওরা একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরে শেষবারের মত বন্দেমাতারম বলে শেষ হয়ে গেল। হয়ত যাবার আগে ভেবেছে মাগো, তোকে ডাকতে জ্বালা, ভুলতে জ্বালা, সইতে জ্বালা, ছাড়তে জ্বালা—তুই এমনি মা আমাদের। এত সন্তানে এত ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গৃহদাহ করছিস দিনের পর দিন গৃহহীনের মিছিল দিয়ে। তবুও তোকে যে না ডেকে পারিনা, তাই যাবার আগেও বলেছি "বন্দেমাতরম"।

এক দিকে 'লালসেলাম' তারা আধুনিক দুনিয়ার কাস্ত্রো, হোচিমিন-এর স্বপ্নে উত্তাল আর লেলিন থেকে মাওকে নিয়ে পাগল।

ওদেরও দোষ নেই। অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া মেঘের আড়ালের লাল সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনতে যৌবনকে উদ্দাম করেছে নূতন ছন্দে। লাল সেলামে তাই আর এক যৌবনের আত্মাহুতি দেবার, সবটাই বিলিয়ে দেবার মারাত্মক প্রতিশ্রুতি।

এদিকে অস্তিত্ব, সত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, স্বাজাত্যাভিমান, স্বাদেশিকতার পুরোনো দিনের ধাঁধাকে বাঁচিয়ে রেখে মাকে আর একবার নূতন করে নূতন ভাবে ডাকার সংগ্রামে 'বন্দে মাতরমে'র ধ্বনি।

এর মাঝে যারা দমনে, পীড়নে, শোষণে, তোষণে ব্যস্ত তারাও মানুষ, তারাও ভাই, তারাও প্রভু, তারাও কর্তা, তারাও আত্মীয় কিন্তু তাদের সঙ্গে মনের আর প্রাণের যোগ হারিয়ে গেছে অনেককাল।

আজকে মহাজাতি সদনের এই তর্পণে নিঃশব্দে পেছনে এসে বসল সুমিত্রা।

বিমলসহ অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি গোটা ব্যাপারটি। বিমল ইচ্ছে করেই ওকে ঘাঁটাল না। কিছুক্ষণের অনুষ্ঠান মাত্র, উত্তর কোলকাতার একটা ছেলে শুধু গাইল অনুষ্ঠান শেষে "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে।"

গানটি সঙ্গত হলো কিনা অত বোঝার অবকাশ নেই কারো। গাইতে হয় তাই গাওয়া। সুমিত্রার কিন্তু ভাল লেগেছে ছেলেটিকে। ওকে ডেকে

বললে, কাল আমাদের বাড়িতে একটা ছোট অনুষ্ঠানে আসবে ভাই? তোমার গলায় এই গানটা আর একবার শুনব।

বিমল বললে, বেশতো নিশ্চয়ই যাবে—ও আমাদেরই ছেলে শংকর। ভীষণ ভাল গাইছে আজকাল রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গান।

সুমিত্রা বললে বিমলকে, সেই যে বাঙলাদেশের কাজে যোগ দিতে বলেছিলে বিমলদা—আমি তৈরী। পরশু থেকেই আমায় কাজ দিতে পার?

বিমল বললে বেশতো, এর জন্ম আর ভাবনা কি? আমিই ব্যবস্থা করে দেব। তোমার উপর দিয়ে যে ঝড় গেল।

সুমিত্রা বললে, ঝড় এখনো আসেনি, এটা তার আগের মেঘ। তোমরা পারলে কাল এসো।

সুমিত্রার বাড়িতে সামান্য অনুষ্ঠান হয়েছে ওর দাদার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। সেখানে অনেকেই এসেছেন। কিন্তু সামনে সাজানো মাঝখানে সুমিত্রার দাদার ছবি আর দু'পাশে সৌম্য আর রতনের ছবি।

অনেকেই চাওয়া চাওয়ি করল। সুমিত্রা বললে, আমার চোখের সামনে তিনটে আত্মার অনাবশ্যক নির্বাসন দেখেছি। তিনজনই তাদের যুক্তিতে ঠিক কিন্তু তিনজনই কালের শিকার। আমার কাছে তাই তিনজনের আত্মাই প্রণম্য।

শংকর বেশ দরদ দিয়ে সেই আসরে আবার শুরু করল, "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে"।

সুমিত্রাদের বাড়ির অনুষ্ঠান শেষে বিমল এল বেঙ্গল চেম্বারের অফিসে। সেখানে নূতন সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীকে সম্বর্ধনায় কোলকাতার সবরকম বড় লোকেরাই হাজির।

যে লোকগুলোর তালিকা বিধান রায়ের আমলে ছিল আজও তাদের কেউ হারিয়ে যায়নি রতন, সৌম্য বা পরিতোষ চৌধুরীর মত। অথচ কোলকাতা শহরে নাকি এদেরই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই ক'বছর একটা সংগ্রাম হয়ে গেছে।

যাঁরা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন তাঁরা সবাই গদগদকণ্ঠে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো ভালো করার আবেদন করলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনে মনে আরো কয়েক ব্যাটেলিয়ান সি-আর-পির কথা ভেবেছিলেন।

এদের মারাত্মক অসুবিধের কথাও এরা বললেন। কারো ছেলে বা মেয়েকে দিল্লীতে পাঠাতে হয়েছে পড়বার জন্ম। কেউবা বাধ্য হয়ে ব্যবসা উঠিয়েছেন

বাঙলার বাইরে। কেউবা বাধ্য হয়ে পাড়ার মস্তানদের চাঁদা দিয়েছেন নিজেদের নিরাপত্তায়। কিন্তু কেউ কোন বিধবা কনস্টেবলের স্ত্রীর জন্য, জেলখানায় নিহত যুবকের জন্য বা রাস্তার ধারে পড়ে থাকা যুবকের জন্য একদিনের জন্যও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বিনিদ্র হন নি।

সুমিত্রার কাছে সবগুলোই মূল্যবান প্রাণ যেগুলো মূল্যহীন হয়ে হারিয়ে গেল।

ওদিকে বাঙলাদেশে এখন প্রাণ নেবার নেশায় উন্মত্ত পিণ্ডির ইয়াহিয়া খাঁ। তাঁর নির্দেশ পালনে ব্যস্ত জেনারেল নিয়াজি। কোলকাতার কাগজগুলোতে অনেকটা জায়গা জুড়েই শুরু হল বাঙলাদেশের খবর। কাতারে কাতারে শরণার্থী এসেছে, কারো জায়গা হয়েছে মেঘালয়ে, কেউবা ত্রিপুরায়, বাদ বাকী সব বাঙলার সল্টলেক, বনগাঁ, দিনাজপুরের মালোন, চান্দোল নানা ক্যাম্পে। এদের মাঝখানে কাজ চলছে পুরোদমে। দস্তুরমত ম্যাজিকের কাজ করে চলেছে বাঙলার ও ভারতের বহুনিন্দিত আমলারা। খাদ্যের যোগান থেকে সেবা ও চিকিৎসা সবটাই সমানে চলেছে।

ওদিকে মুজিবনগরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বসে নক্সা তৈরী হচ্ছে প্রতিদিনের পরিকল্পনায়—এদিকে থিয়েটার রোডে, কারনানী ম্যানসনে পরামর্শ চলছে দিল্লীর, ফোর্ট-উইলিয়ামের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে।

কাজের অন্ত নেই। কেউবা সরাসরি মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ করছে সাতক্ষীরা, হিলি, আগরতলায় কেউবা শরণার্থী শিবিরে। কেউ বা কর্নেল লুথরার সঙ্গে মহাকরণে আবার কেউ তাজউদ্দীনের সঙ্গে।

দিনাজপুর সেকটারে ইউসুফ আলি রয়েছে-তাদের সঙ্গে কাজ করতে চলে গেল সুমিত্রা। মাঝে মধ্যে কোলকাতা আসে তা না হলে প্রায় সব সময়েই ওদের সঙ্গে কাজ করে সুমিত্রা। বিমলই সব ব্যবস্থা পাকা করে দিয়েছিল। দিন কুড়ি বাদে যখন লড়াই জমে উঠেছে তখন সুমিত্রার ডাক পড়ল কোলকাতায়। সবচেয়ে বিশ্বস্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হয়ে কাজ করছে সুমিত্রা—তাই ওকে এখন আগরতলা সেকটারে পাঠাতে হবে।

সরকারের হয়ে যে সব লোক নিয়োগ হলো এই কাজে সুমিত্রা তাদের অন্যতম। আগরতলায় সিরাজুলের সঙ্গে ভীষণ পরিচয় হলো সুমিত্রার। ময়মনসিংহের ছেলে সিরাজুল। ক্যাপ্টেন জলিলের নেতৃত্বে তালিম নিয়েছিল মুক্তি যুদ্ধের। নির্ভীক সাহসী আর দেশপ্রেমিক। আখাউড়া সীমান্তের প্রচণ্ড সংঘর্ষে সিরাজুল আহত হল মারাত্মকভাবে। ট্রানসিট ক্যাম্পে সরিয়ে এনে যখন চিকিৎসা

চললে সিরাজুলের তখন সুমিত্রা সেখানে হাজির।

সিরাজুলের কোন জ্ঞান নেই। ওকে তাড়াতাড়ি আগরতলায় নিয়ে যেতে হবে। ওর অবস্থা ভাল নয়। সুমিত্রা সিরাজুলকে জেনেছে মাত্র কয়েকদিন। বাঙলাদেশের নামী খেলোয়াড়। কবাডি ও ফুটবলে সমান। বাড়ির সবাইকে ফেলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সে ছুটে বেরিয়েছে। সুমিত্রাকেই বলছিল সব কদিন আগে। ভাষায় পরিষ্কার ময়মনসিংহের টান।

ঢাকায় আসবার পর সিরাজুল জেনেছিল যে ওর বোনকেও আস্ত রাখেনি জল্লাদেরা তবুও এতটুকু দুর্বল না হয়ে লড়াইয়ে নাম লিখিয়েছে। যার যা আছে তাই নিয়ে নেমে পড়ার যে আহ্বান উঠেছে তার থেকেই ওর মন প্রাণ জেগেছে।

সুমিত্রা বললে, আপনাদের এ লড়াই কি সফল হবে সিরাজুল ভাই ?

কেন হবে না ? এত রক্ত দিয়েছি যে পদ্মার পানি লাল। তাতেও হবে না ? হতেই হবে।

সুমিত্রা বললে শুধু রক্ত দিলেই বোধ হয় সবটা হয়ে যায়, তাই না ?

সিরাজুল বললে রক্ত নিতে ও দিতে যদি আপশোষ ও ঘৃণা থাকে তাহলে তাতে মুক্তি আসে না। কিন্তু দেবার জন্য যদি আপশোষ না থাকে—যদি মনে করেন এটা অঞ্জলি তাহলে দেখবেন কাজ অনেক সহজ।

সুমিত্রা মনে মনে ভাবল নিজেদের কথা—সৌম্য থেকে রতন—রতন থেকে বিমলের ভবানী, স্বয়ম্ভুর কথা। কেউ তো কোন কম দেয়নি তাহলে কি ওদের দেওয়া নেওয়ার মধ্যে ভক্তি ছিল না ? অরবিন্দকে এ প্রশ্ন আর একবার করবে সুমিত্রা।

সিরাজুল কিন্তু ছাড়েনি। একে একে সব জেনেছে সুমিত্রার কাছে। পরে শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছে। আপনার জীবনে এত দুঃখ আর আপনি এই কাজ করে চলেছেন ? বি-এস-এফ-এর তাঁবুতে বসেই সিরাজুল বললে।

সুমিত্রা তখন সাপ্লাই-এর টীমে কাজ করছিল। খাবারগুলো নামাতে নামাতে বললে, আপনার যে কাহিনী শুনলাম তাতে আপনার প্রতি তো আমার আসল শ্রদ্ধা—সব খুইয়েও যে দেশের জন্য পাগল।

সিরাজুল বললে, দেশটা আগে স্বাধীন হোক, বঙ্গবন্ধু ফিরে আসুক। আপনাকে তারপরে বাঙলাদেশ দেখাবো। শুনেন দেখার মজা কিন্তু বেশী নাই। কিন্তু পদ্মা মেঘনা দেখলে পরেই কেন যেন আপনার মনে হবে এখান থেকে আর যাব না। তার পর কক্সবাজার দেখাব।

সুমিত্রা বললে, আপনাদের বাড়িতে যাব আগে আপনার মাকে বোনকে দেখতে—যাদের বাড়িতে আপনার মত ছেলে তৈরী হয়।

আরে সে তো নিশ্চয়ই—তবে ভাঙ্গা ঘর—শহরের মত বাড়ি নেই আমার, তাই কষ্ট হবে আপনার।

ঠিক আছে, সে সব আমি দেখে নেব, আপনাকে ভাবতে হবে না।

সিরাজুল বললে, আপনার দেশ কোথায় ছিল ?

সুমিত্রা বললে, আমার জন্ম কোলকাতায় কিন্তু বাবা ছিলেন ঢাকার লোক।

তাই বলুন। তাই না হলে এমন সাহস যে মেয়ে হয়ে এই কাজে নেমে এসেছেন!

আমার কিন্তু ওই ধরণের কোন সেন্টিমেণ্ট নেই। সুমিত্রা হেসে বললে।

না থাকতে পারে কিন্তু এটা দেশের মাটির গুণ যা রক্তে মিশে যায়। আচ্ছা ঋত্বিকবাবু কেমন আছেন ? সিরাজুল বললে।

সে কে ? সুমিত্রার প্রশ্ন।

বারে ঋত্বিকবাবুকে চিনলেন না আর আপনি হ'লেন বাঙ্গালী। ঋত্বিক ঘটক।

সুমিত্রা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ—তা আপনার বুঝি পরিচিত ?

না চোখে দেখি নাই—তবে ছবি দেখেছি ওনার অনেক। অবিভক্ত বাঙলার প্রতীক। বাঙ্গালীর তেজ আর মনীষার চিহ্ন। আমার তো বঙ্গবন্ধুর পর ঋত্বিকবাবুর প্রতি আনুগত্য।

সুমিত্রা বেশ অবাক হয়ে গেল। শুধু চলচ্চিত্রের লোক বলে যে লোকটাকে কোলকাতার বুদ্ধিজীবি তারিফ করে তাকে বাঙলাদেশের একজন সাধারণ ছেলে নিজেদেরই ঋত্বিক করে নিয়েছে মনে মনে।

সুমিত্রা বললে, আমার সঙ্গে আলাপ নেই তবে ইদানিং অসুস্থ শুনেছি। কোনদিন দেখা হলে আপনার কথা বলব। এর পর সিরাজুলের সঙ্গে আর কথা হয়নি।

আগরতলা হসপিটালে মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল দেশের মুক্তিপণ দিতে গিয়ে বেলা পাঁচটা বত্রিশ মিনিটে নিজের প্রাণটাই দিয়ে গেল।

সুমিত্রা তখন এয়ারপোর্টে—একদিনের জন্য কোলকাতা আসতে হবে। প্লেন ছেড়ে যখন আকাশে উড়ল তখন সিরাজুলের আত্মাও নিশ্চিন্তে সীমানা অতিক্রম করে মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করছে। কোলকাতায় ফিরেই সুমিত্রা আগরতলার খবর পেল ফোনে।

সেদিনই পূর্ণ সিনেমায় ঋত্বিক ঘটকের ছবির উৎসব চলছিল। ট্যাক্সি করে

বাড়ি আসতে আসতে একবার সেদিকটায় তাকিয়ে সুমিত্রা ভাবল কি বলবে ঋত্বিকবাবুকে যদি কোনদিন দেখা হয়? সিরাজুলের কথা। সিরাজুল হলো সব দিক দিয়ে মিলিয়ে নেওয়া হাইজাকের বর্ণনার মত সুমিত্রার চোখে প্রথম শহীদ। ভক্তিভরে সে রক্ত দিয়েছে—কোন গ্লানি নেই—আপশোষ নেই। পদ্মা এখন আরও লাল হয়ে গেল।

জেলখানায় আর একবার অরবিন্দকে দেখতে গিয়ে চিনতে পারল না ওকে সুমিত্রা।

ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। অরবিন্দ বললে, আর কদিন বাদেই হসপিটালে নেবে। কি যে হয়েছে বুঝতে পারি না—মাঝে মাঝে জ্বর হয়।

সুমিত্রা বললে, একটা দারুণ মুক্তিযুদ্ধ দেখে এলাম। তা আপনার সঙ্গে প্রবাস, প্রলয়রা কোথায় গেল? ওদের যে দেখছি না।

অরবিন্দর চোখে জল এল এই প্রথম। প্রবাস জেলেই ওয়ার্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে। প্রলয়ের বাবা মুচলেকা দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জজসাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সোজা কোলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সে কি—অনুশোচনা করছেন কেন? আপনাদের ত' আগুনের মত জলতে হবে। সুমিত্রা বললে।

বিদ্রূপ করছেন? তা করুন। সবটাই যখন সত্য তখন তাকে গোপন করি কেমন করে। তবে এর পরেও আমরা যারা থাকব তারা নূতন করে আবার শুরু করব—কারণ সবাই শেষ হয়ে যায় না।

আপনারা মুক্তির দশক করতে চাইলেন ওদিকে বাঙলাদেশ মুক্ত হতে চলল। আপনারা রক্ত দিতে আর নিতে চাইলেন ওদিকে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে এল। সবটাই কেমন উল্টো হয়ে যাচ্ছে না।

হয়ত তাই—তাহলেও এ নিয়ম পাল্টাবে।

আজ আর আপনাকে বিব্রত করব না। শুধু বলতে এসেছিলাম বাইরে এসে গ্রামের সহজ সরল নিষ্পাপ নিরক্ষর মানুষগুলোকে চলুন আগে ভাষা দিই, লিপি দিই, তার পর লড়াই শেখাই।

কথাটা ভাল লেগেছে—কিন্তু সে তো একদিনের কাজ নয়। আজ কে দারুন সময়—এখন শুধুই এগিয়ে যেতে হবে।

বাঙলাদেশের যুদ্ধকে সমর্থন না করে আপনারা বোধ হয় ভুল করছেন।

অরবিন্দ বললে, ভুল হ'লে ভুলের মাশুল দেব।

দেখতে দেখতে বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন। নিয়াজি

আত্মসমর্পণ করল। সহস্র সিরাজুদ্দৌলার প্রাণ দেওয়া মুক্তি পথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

সুমিত্রার সামরিক কাজও শেষ হয়ে এল। এখন শরণার্থীদের ঘরে ফেরার পালা। বিমল তবুও চেয়েছিল সুমিত্রা শেষ পর্যন্ত ওদের দল করুক। কোন একটা চাকরী পাইয়ে দেওয়া এখন বড় ব্যাপার নয়। সুমিত্রাকে সেই কথাই বললে বিমল।

বিমল নিজে জানে যে তারা ক্ষমতার লড়াই লড়েছে। কিন্তু সুমিত্রা আদর্শের প্রতিটি হীরেকে যাচাই করতে চেয়েছে। ও কোথাও ঠকেছে, কোথাও প্রতারিত হয়েছে। কিন্তু নিজেকে নির্ভীক রেখেছে।

যাদবপুরের উপাচার্য পালাসনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে একদিন একদল ছেলের বিচার চলছিল কোর্টে।

সুমিত্রা বললে বিমলকে, এরা সবাই অরবিন্দ রতনের সমর্থক নয় বিমলদা। এরা যাদবপুরের ছোট খোকার দলবল। এদের সঙ্গে অরবিন্দদের জড়িয়ে যে কুৎসা রটছে তাতে ওদের আন্দোলন মার খাচ্ছে বটে তবে আসল সত্য বের হচ্ছে না।

বিমল বললে, তোমার কি এখনও দুর্বলতা আছে ওদের প্রতি?

ওদের কারো প্রতিই আমার দুর্বলতা নেই বিমলদা। শুধু কয়েকজনের প্রতি আছে শ্রদ্ধা আর সৌম্যর প্রতি ছিল করুণা।

সেই কয়েকজনের মধ্যে কি অরবিন্দ একজন? বিমল বললে।

সুমিত্রা বললে, হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। আপনাদের পথ ও মত আমার পছন্দ কিন্তু আপনারা বোধ হয় একে শোকেসে সাজিয়ে রাখতে চান না। এই নিয়ে কিছু সওদা করতে চান না।

দারুন ধাক্কা খেল বিমল। বললে, কেমন করে বুঝলে সে কথা। আমরা তো চেষ্টা করে চলেছি। তাছাড়া আস্তে আস্তে এগোতে হবে না বল?

ছাব্বিশ বছরের পরেও কি আমরা ধীরে চলব বিমলদা? মানুষের মিছিলের গতি বাড়ছে—ক্ষুধার জ্বালায় ঘরের চাল পুড়ছে আর আমরা কত ধীরে হাঁটব? একটা আগ্নেয়গিরি না হয় হঠাৎ থেমে গেল—তাই বলে তাকে মৃত বলে ধরা ঠিক হবে না।

বিমল বললে, আমাদের বোধ হয় ভুল হচ্ছে সুমিত্রা একটা জিনিস বুঝতে। সেটা হলো আমরা যা চাই তা এই পথে আসবে কিনা। তা যদি সত্য হয় তাহলে পথ বদলাবার কথা ভাবতে পার কিন্তু মত বদলে লাভ কি?

এটাও খুব সুন্দর কথা বিমলদা। তবে ভাবতে গেলেই তো বাধা। সেটা সবচেয়ে বেশী তোমাদের দলে।

সুমিত্রার কোন কাজ নেই। বিমল-সুব্রতরাও এখন সরকারী ক্ষমতার কাছাকাছি, তাই ওদের সেই ক্লান্তি আর সন্ত্রাসের দিনগুলোর স্মৃতি দিনের পর দিন বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যেতে বসেছে।

সুব্রতই বললে একদিন বিমলকে, সুমিত্রাদির মধ্যে কিন্তু হৃদয় ছিল, যোগ্যতা ছিল, আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না।

বিমল বললে, সুমিত্রা ঠিক মন বসাতে পারে নি এখনও আমাদের লাইনে। ওর মনে অনেক অস্পষ্ট ও স্পষ্ট প্রশ্ন রয়ে গেছে সুব্রত, যেগুলোর সব উত্তর আমার কাছে নেই।

দিল্লীতে আমরা তো সবাই যাচ্ছি এ-আই-সি-সি করতে, সুমিত্রাদিকে নিয়ে চল না—কোন অসুবিধা হবে না। ওরও মনটা হালকা হবে। তাছাড়া নূতন বলে বলীয়ান সমাজবাদের প্রত্যয়ে বিশ্বাসী নূতন মানুষগুলোকে কংগ্রেসের মঞ্চে দেখে ভাল লাগবে ওর। মোহন কুমারমঙ্গলম, গোখলে, ভি-পি দার এদের সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দেব।

বিমল বললে, ওর মনের যে সব প্রশ্ন সেগুলোর উত্তর স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীর জানা আছে কি না জানি না। তবে বলছিস যখন বলে দেখব।

সুমিত্রা কিন্তু বিমলের কথায় রাজী হয়ে গেল। হয়ত বা ভাবল বেশ ত একটু পরখ করে দেখতেই বা আপত্তি কি ?

দিল্লীর এ-আই-সি-সির প্রেস এনক্লোজারে চশমা চোখে সেই রমাদি। বহুদিন বাদে দেখা হয়ে গেল। রমাদি এখন ভীষণ বড় সাংবাদিক।

বিমল-সুব্রতকে ডেকে বললে, সময় করে পারলে একদিন এসো না আমার ফ্ল্যাটে। বেশ গল্প করা যাবে।

রমাদির ওখানে সুমিত্রাও গিয়েছে। রমাদি বদলে গেছেন। নিজের ফ্ল্যাটেই সুন্দর ছোট্ট একটা বার। নানান পানায়ের ব্যবস্থা। রমাদির এত পরিবর্তন এই ক'বছরে ভাবা যায় না।

রমাদি নিজেই বললে, তোমাদের একটু অবাক লাগছে না ? তা যেখানে যেমনটা মানিয়ে নিলে শান্তি সেখানে তাই করছি ভাই। আমার জীবনটা তো অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে, বাকীটাও এমন করেই কাটাব।

রমাদির কাছে নানা গল্প শুনলো সুমিত্রা। ভি-আই-পি ডিনার আর করেন গেস্ট ডীল করতেই অর্ধেক রাত চলে যায় প্রতি মাসে রমাদির। সামনেই রাশিয়া ট্যুরে

প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে যাবে। ওরা সবাই ভাল ফ্রুজিং আর কাটলেট খেল। রমাদি যত্ন করেছে ওদের খুব। মাঝে মাঝেই ফোন আস্তে লাগল। বোঝা গেল রমাদির ডেস্কে পাবলিসিটি পেতে অনেক নেতারই এখানে ফোন আসে। এত টেপটে আর এত অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেল কি করে রমাদি সুব্রত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাই ভাবছিল। এই হল রাজধানী। এখানে সব কিছুই বাইরে থেকে এসে কেমন যেন পালটে যায়। রং রূপ সব পাল্টায়, কারো কারো মনটাও পাল্টায়। রমাদির কিন্তু মনটা পাল্টায় নি। যার জন্য ল্যান্সডাউনের সেই বাড়িটায় রমাদি সব ছেড়ে দিয়েছিল তার ছবিটা টাঙানো দেওয়ালে। গলায় মাইসোর চন্দন কাঠের মালা। দেখেও শান্তি হল বিমলের। যাক দাদাকে মন থেকে মুছে ফেলেনি রমাদি।

কথায় কথায় রমাদি বললেন, রাশিয়া থেকে ফিরে হাজারীবাগ জামসেদপুর আর কোলকাতার জেলগুলোর উপর নকশালদের নিয়ে কি নাকি লিখবেন।

সুব্রত তাকাল রমাদির দিকে। বিমল সুমিত্রাকে দেখিয়ে বললে, আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে ও। সুমিত্রা মাথা নিচু করে রইল।

রমাদি বললেন, ভীষণ ভাল হবে, তাহলে ত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করব। তোমার হেল্প আমার ভীষণ কাজে লাগবে।

সুমিত্রার দাদার কাহিনী বললে বিমল।

সুমিত্রা তার সঙ্গে সৌম্য আর রতনেরটা জুড়ে ছিল। এবার বিমল মাথা নিচু করে রইল।

এ-আই-সি-সি-র নূতন উত্তেজনা থাকলেও সুমিত্রা বা সুব্রত কারোই ভাল লাগেনি। বেশী ভিতে কেমন যেন অহংকারের ভাব ফুটে উঠেছে কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে। আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ ভীষণ করে স্থান পেল।

সুমিত্রা ভিজিটরদের মধ্যে বসে ছিল। সুব্রত খাবার সময়ে ডেকে নিয়ে বললে, তার চেয়ে চল দিল্লীতে বেড়িয়ে নি।

সুমিত্রা কিন্তু সবচেয়ে আগে রাজঘাটে যেতে চাইল। গান্ধীর সমাধি দেখতে। সেখানে এসে অনেকক্ষণ বসে রইল আপন মনে। এত হিংসার বিরুদ্ধে যার সংগ্রাম তিনি যে কেন সহস্র হিংসার বীজকে রেখে চলে গেলেন অসময়ে এ কথাই ভাবছিল সুমিত্রা। গান্ধীর সেই হাঁটু অবধি কাপড় পরা ছবিটা যদি ভারতীয় দারিদ্র্যের প্রতীক তাহলে তা আজও আছে আর সেই জন্যই তো হিংসা উৎপাত অত্যাচার। এর শেষ কথা যদি বলে যেতে পারতেন তা হলে বোধ হয় এত রক্ত বইত না বাঙলায়।

সুমিত্রার তখনও ধারণা পশ্চিমবাঙলার আসল দুঃখটা না বোঝে দিল্লীর সরকার, না বোঝে এ-আই-সি-সির নেতা। শুধু মাত্র ল' এ্যাণ্ড অরডার বলে থাকে বিচার করতে চায় তার ভেতরের অসুখটা কোনদিন ওরা ধরবে না। ফেরবার ট্রেনে সবাই একসঙ্গে ফিরছিল। আলিপুরদুয়ারের বিশু বললে, আসলে দিল্লী বুঝেও বোঝে না। বাঙলাকে শেষ না করে ওদের শান্তি নেই। কিছু সি-এম-ডি-এ'র টাকা দিয়ে এত বড় ক্রাইসিসটাকে ধামা চাপা দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গটা কি শুধু কোলকাতা না কি?

পরাজিত গ্রাণ্ড এ্যালায়েন্সের সংগঠন কংগ্রেসের নেতারা এখন ভীষণ হতমান। তাদের কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। তবে এরই মধ্যে মাদরাজের কে. কামরাজ নাদার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে উদ্‌গ্রীব।

সংসদের সেণ্ট্রাল হলে বসে একে ওকে জিগ্যেস করে খোঁজ খবর নিতেন নিজের ভাষায়। উদ্‌গ্রীব ছিলেন এককালের ক্ষমতাশালী আজকের ক্ষমতাহীন গুলজারী লাল নন্দা। সবচেয়ে বেশী পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে হোম-মিনিস্ট্রিতে যে ভদ্রলোকটি ভাবতেন তাঁর নাম কে. সি. পন্থ। তখন তিনি কোলকাতায় এসে সাড়াশব্দ না দিয়ে, পাবলিসিটি না করে চিফ-সেক্রেটারী বা হোম-সেক্রেটারীর এ্যামবাসাডরে আর পাঁচজন মানুষের মত শহরে ঢুকে কাজকর্ম তদারক করে চলে যেতেন। দিল্লীর হাওয়ায় বাঙলাদেশের স্বাধীনতার খুশীর মেজাজ। এ-আই-সি-সির বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন আওয়ামী লীগের দূত কোরবান আলি, জিল্লুর রহমান। তাদের লাল গোলাপ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতি নিয়ে কোন বিশেষ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত এ-আই-সি-সি নেয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এমনই একটা রূপ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিতে ও আইনশৃঙ্খলায় গ্রহণ করেছিল। অনেকের আশা ছিল বিশেষ কিছু হবে। এমনকি বাঙলার থেকে যারা প্রতিনিধিত্ব করলেন তারাও তেমন হৈ চৈ করে কিছু বলেননি। সরকারী ক্ষমতা দেখার আনন্দে যারা মশগুল তাদের বাদ দিলে আর সবাই বেশ মন খারাপ করে ফিরে এলেন।

পশ্চিমবাঙলায় সি-পি-আই এমও খুব একটা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছে না। ওদেরও অভিযোগ ওদের লোকদের ওপরেও জুলুম শুরু হয়েছে। তাছাড়া হঠাৎ দিল্লীর সরকার কায়েম হওয়া আর সেই সঙ্গে ইন্দিরা-মুজিব-কোসিগিন হাওয়ায় যে অক্সিজেন তা কংগ্রেস আর সি-পি-আই গ্রহণ করল—ওরা দূরে বসে রইল।

লুকোনো অস্ত্র, জমে থাকা বারুদ আর শত্রু নিধনের তালিকা যেমন এখনও

শেষ হয়ে যায়নি তেমনি সি-আর-পি আর ইউ পি-র সমস্ত পুলিশ তাঁদের তাবু ফেরায়নি। আস্তে আস্তে যেন যুদ্ধ বিরতির মত কিছু চলছে।

কংগ্রেসের মহাভারতের মত সাতাশি বছরের ইতিহাসটায় কত রক্তমাখা দশক আছে ঠিক নেই—কিন্তু এই সত্তরের দশকে রক্ত দেওয়া রক্ত নেওয়ার যে খেলাটা গঙ্গার তীরে হ'ল সেখানে কোনটা কার—কোনটায় ত্যাগ বেশী এ কথা লেখার বিশেষ কোন জায়গা কংগ্রেসে নেই। বরং প্রশাসনের দায়িত্ব দিল্লীতে থাকায় সি-আর-পি থেকে বি-এস-এফ'এর দৌরাত্ম্যের পুরো কলঙ্কটাই কংগ্রেসকে বহন করতে হবে। রাতের ভ্যান, লাশকাটা ঘরের সাক্ষীরা যেন কংগ্রেসের ইতিহাসটাকেই কেটে চলেছে ছুরি দিয়ে বাদ দিতে। না তুমি এ নও—এমন নও, তোমার এই দেহে রাখি কোথায়?

প্রাক্তন মন্ত্রীরা মাঝে মাঝেই ঘরোয়া বৈঠক করে দেশ ও কাল নিয়ে, আলোচনা করেন। যারা নূতন হাওয়ায় সুযোগ পেলেন ধ্বজা ওড়াবার তাদের প্রতি ঈর্ষা নিয়ে কেউ বলেন, এরা কি পারবে? একদম অনভিজ্ঞ। ভাবটা এমন যেন অভিজ্ঞতার চোটে এরা সবাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি হয়েছেন। তাই যদি হবে তাহলে এত রক্ত বইল কেন, এ কৈফিয়ত দিতে পার না কেন বাপু?

কংগ্রেসের ঘরে আজ নূতন পুরনোর মাঝখানে একটা প্রাচীর তৈরী হচ্ছে। নূতনরা চাইছে সবটা ঢেলে সাজাতে, পুরোনোদের সেখানে আপত্তি। আর যখন আপত্তি টিঁকলো না তখন নূতনদের ঐক্যকে কেমন করে ভেঙে দেওয়া যায় তার জন্য শুরু হলো প্রচেষ্টা। বিমল তাই কিছুদিন হলো বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে।

ইলেকশনে দারুণ জিত হয়ে গেল কংগ্রেসের। প্রতিপক্ষের অভিযোগ এল জুলুম, রিগিং-এর। কেউ কোন অভিযোগ নিয়ে আদালতে গেল না। তবে কয়েক জায়গায় উত্তেজনা যে তীব্র ছিল না তা নয় কিন্তু অসমর্থনের জোয়ার যখন আসে তখন ভুল, অন্যায় কেউ তারা বড় চোখে দেখে-না এমন ঘটনাও ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে এখন দারুণ জোয়ার—লোকের ভীড়ে ঘর সামলান দায়। সুমিত্রা কিন্তু দূরত্ব নিয়ে নিয়েছে আগে থেকে। বুঝতে পেরেছে এখানে এখন দেওয়া-নেওয়া আর হিসেব করে লাভ-লোকসানের অঙ্কের ঝড় বাড়বে। পুরোন প্রতিশ্রুতি আর রক্তঝরা সকালের হাহুতাশ, প্রতিশ্রুত কোন মূল্য পাবে না।

শুধু সুমিত্রা কেন, আস্তে আস্তে অনেকেই সরে যেতে চাইল, যারা কোন অভিলাষ নিয়ে আসেনি—এসেছিল দূর থেকে দেবতাকে দর্শন করতে অথবা সামান্য সেবা করতে, প্রসাদের জন্য নয়।

বিমল আজকাল বেশী ব্যস্ত। মানুষের মত দশটা কাজ করার ব্যাকুলতায় বেশী চঞ্চল। সেও আগের মত কর্মীর পাশে গিয়ে দলের ভেতরের সুত্য অসত্য নিয়ে প্রতিবাদের সময় পায় না, সময় পেলেও উপস্থিত থাকে না। কারো প্রতি কারো নিয়ন্ত্রণ থাকছে না।

সবটাই যেন হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া পয়সার মত, কতক্ষণে খরচ হবে তারই দিকে এর প্রবণতা।

চারিদিকে শান্তি ফিরে এলেও কোথায় যেন কৃত্রিমতা রয়ে গেল। কেউ কিন্তু আপোষ করেনি, কেউ তার ভালমন্দ মেনে নেয়নি, কেউ আত্মসমর্পণ করেনি। হয় বারুদে টান পড়েছে তাই আওয়াজ বন্ধ, না হয় গুলি কেনার পয়সা নেই, তাই শব্দ বন্ধ, না হয় সবাই আহত তাই ময়দান ফাঁকা। তাই সি-আর-পিরা ফেরত যেতে হাওড়া স্টেশনে গোঁফ পাকাতে পাকাতে এমন ভাব করল যেন তারা সব দিক ঠিক করে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মূর্খ ওরা তাই অহংকারে মত্ত।

কেউ কিছু ঠিক করে দেয়নি হঠাৎ করেই আগুন নিবেছে। কিন্তু শুকনো খড়ের গাদায় বোঝাই বাংলায় যতক্ষণ চৈত্রের তাপ ও খরাক্লিষ্ট প্রান্তর থাকবে ততক্ষণ আগুন জ্বলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রাইটার্স থেকে কম্যাণ্ডাণ্ট ভাটিয়া হোমসেক্রেটারীর সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল।

দুদিন বাদেই সেই ঘরে নূতন মন্ত্রীরা এসে আসন নিল।

ইতিমধ্যেই কিছু কিছু বন্দী মুক্তি পেল—যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর নয়। বিমলরা এবার মেতেছে বিধাননগর নিয়ে, সেখানকার অধিবেশন নিয়ে। সুমিত্রাকে ভীষণ দরকার। ওকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কোথায় সুমিত্রা?

সে গিয়ে হাজির আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের গেটে। অরবিন্দের মুক্তি হবে সেদিন। অরবিন্দ তার মত বদলেছে। সে চেয়েছিল এক সংগ্রাম, হয়ে গেল আর এক সংগ্রাম। জেলের থেকেই চিঠি পাঠিয়েছে সুমিত্রাকে ওর মনের খবর দিয়ে। গ্রামের ছোট এলাকা বেছে নিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে হাত দেবে অরবিন্দ। তাতে ওকে যে যাই বলুক না কেন? বিপ্লব আর পরিবর্তনের নেশা ওর এখনও আছে, মতও বদলায়নি, শুধু পথ বদল করতে হবে। তৈরী হয়ে ওদেরকে তৈরী করে তার পরে হবে আহ্বান। তার ডাক ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই শুরু হবে নূতন বিপ্লব। আপাততঃ অরবিন্দের এই উপলব্ধি।

সুমিত্রা ওকে নিতে এল জেল গেটে।

অরবিন্দ বললে—কোথায় যাব ? থাকার যে কোন জায়গা রাখিনি।

সুমিত্রা বললে আমার কাছে আছে। অরবিন্দ নামের লোকেরাই তো সবাই জেলখানায় এসে দিব্যজ্ঞান পায়। হাসতে হাসতে বললে।

অত কিছু জানি না তবে আপনার কথাগুলো আমার মনকে নাড়া দিয়েছে।

বিধাননগরের উৎসব মুখরিত মণ্ডপে আলোর মালায় কোলকাতার কংগ্রেসে নূতন ক্ষমতার অভিষেকে যখন সবাই ব্যস্ত তখন রক্ত দেওয়া ও রক্ত নেওয়ার দুই পরিবারের দু'জন সুমিত্রা আর অরবিন্দ রওনা হয়েছে মেদিনীপুরের দিকে। "সৌম্য কেন্দ্র" নাম দিয়ে সৌম্যদের সামান্য জমিতে ওরা গড়ে তুলবে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু কল্যাণ আশ্রম, প্রায়শ্চিত্তের পালা শেষ করে তার পরেই ওরা মিছিলে হাঁটবে—তার আগে নয়।

অরবিন্দ মুচলেকা দেয়নি, লণ্ডন যায়নি, সহকর্মীকে হত্যা করেনি, মত পালটায়নি, শুধু পথ পালটাতে হারানো পথে সুমিত্রাকে পেয়েছে কপালকুণ্ডলার মত। সে পথেই হাঁটবে এখন নীরবে নিভৃতে, শহরের সংবাদপত্র থেকে অনেক দূরে থেকে।

এর অনেক পরে খুশীর মেজাজে কংগ্রেসের সবাই যখন ব্যস্ত। তখন সুমিত্রার ঠিকানা ওরা প্রায় হারাতে বসেছে। বিমল-সুব্রতরা দুর্যোগের রাত পেরিয়ে রক্তনদী সাঁতরে যখন লালকেল্লায় ছবি তুলল, ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্যারেড্ দেখল, তখন অনেক নাম জেলবন্দী, অনেক ঠিকানা হারিয়ে গেছে। বাঙলার আঙিনায় শরতের শিউলি এলো বটে তবে বোধন হল রক্ত দিয়ে, বিসর্জনের ঢাক বাজল সন্তান হারাবার ক্রন্দনে। অনেক নামের স্মৃতিভারে গম্ভীর, প্রশান্ত, অশান্ত, শ্যামল, নির্মল, ভয়ংকর, প্রলয়ংকর, স্থির ও অস্থির এই বাঙলার আগ্নেয়গিরি এখন ঘুমিয়ে।

পদ্মার জোয়ার শেষ, এবারে গঙ্গার বানের পালা। কখন ডাকবে কেউ জানে কি ? এখন শুধু "ভাঙ্গনের জয়গান গাইবার" মুহূর্তের অপেক্ষায় সবাই।
